# BwZnvm

## wØZxq eI

## †Kvm †KvW : SSC 2603

†m‡KÛvwi ¯‹zj mvwU©wd‡KU †cÖvMÖvg
(Gm Gm wm †cÖvMÖvg)


**mwweK ZË¡vea¯v‡b**

ডীন

ওপেন স্কুল

**cybtmgc` bv (2010)**

আবু মো: দেলোয়ার হোসেন

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়


ওপেন স্কুল

**evsjv‡`k Dš§³ wekwe`¨vjq**

# BwZnvm

## wØZxq el

### †Kvm †KvW : SSC 2603

†m‡KÛvwi ¯‹j mvwUwd‡KU †cvMvg
(Gm Gm wm †cvMvg)

**†jLK**

†gvnv¤§` wQwÏKi ingvb Lvb
†gvt Avej †nv‡mb

**cwigvRbKvix**

c‡dmi W. †K. Gg. †gvnmxb
†gvnv¤§` wQwÏKi ingvb Lvb
Gm. Gg. †iRvDj Kwig

**m¤cv`K**

Aa¨vcK Ave †gvt †`‡jvqvi †nv‡mb

**†Kvm mgšqKvix**

Gm. Gg. Zv‡iK ingvb

ওপেন স্কুল

**evsjv‡`k Dš§³ wekwe`¨vjq**

# BwZnvm

**দ্বিতীয় বর্ষ**

†Kvm †KvW : SSC 2603

এস এস সি প্রোগ্রাম

**cKvk Kvj :** জুন ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮
নতুন সংস্করণ : ২০০৯
পুনর্মুদ্রণ : ২০১০, ২০১১

**প্রচ্ছদ**
কাজী সাইফুদ্দিন আব্বাস

**কম্পিউটার কম্পোজ**
মোঃ টিপু সুলতান
কাজী মোদ্দাছেরুল হক

**Mwd·**
আব্দুল মালেক

© evsjv‡`k Dš§³ wekwe`¨vjq

ISBN 984-34-3062-x

**cKvkbvq**
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

**g`Y**
স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

ইউনিট ১

# ইতিহাসের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু , উপাদান ও প্রয়োজনীয়তা

## ভূমিকা

কোন দেশ বা জাতির ইতিহাস সে দেশের বিভিন্ন যুগের সামাজিক, সাংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। ইতিহাস হলো মানুষের সামাজিক সংগঠন ও উন্নয়নের কালপঞ্জির সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষের জীবনধারা, মানুষের সমাজ ও পরিবেশ তথা মানুষের সভ্যতার কালক্রমিক বর্ণনা। লিখিত ও অলিখিত নানা উপাদানের উপর নির্ভর করে ইতিহাস লিখিত হয়। সমকালীন সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, পর্যটকদের বিবরণী, সরকারি দলিল-পত্র, রাজা-বাদশা, শাসকদের জীবনী ইত্যাদি লিখিত উপাদানের উপাত্ত। অলিখিত উপাদানের মধ্যে পড়ে- ধর্মীয় ও সাধারণ স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মুদ্রা, তাম্রলিপি, শিলালিপি, মানুষের ব্যবহার্য বাসন-কোসন, চিত্রকলা ইত্যাদি। ইতিহাস মানুষের অতীতকে জানতে সাহায্য করে, বর্তমান চলার পথের দিক নির্দেশনা দেয়। দেশ, জাতি গঠন ও উন্নয়নের পথ দেখায়। সর্বোপরি ইতিহাস পাঠে মানুষ কর্মকুশলী ও দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ–


➔ পাঠ ১ : ইতিহাসের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

➔ পাঠ ২ : ইতিহাসের উপাদান ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা

## পাঠ-১ : ইতিহাসের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ ইতিহাসের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
☞ ইতিহাস শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ বলতে পারবেন।
☞ ইতিহাসের বিষয়বস্তুর বিবরণ দিতে পারবেন।

### ১.১ ইতিহাসের সংজ্ঞা

ইতিহাস শব্দটা ইংরেজি History শব্দের বাংলা অনুবাদ। History শব্দটি গ্রিক Historia থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। Historia বা History শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুসন্ধান বা গবেষণা।

আবার ইতিহাস শব্দটি 'ইতিহ' শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে। 'ইতিহ' অর্থ ঐতিহ্য। অতএব, মানব সভ্যতার ঐতিহ্যের ধারাবাহিক বিবরণকে ইতিহাস বলে।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদগণ ইতিহাসের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা তুলে ধরা হল :

❁ ডক্টর জনসন বলেন, "যা কিছু ঘটে তা-ই ইতিহাস।" তিনি আরো বলেন, "অতীতের কাহিনী মাত্রই ইতিহাস।"

❁ ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে, "ইতিহাস হলো মানব সমাজের অতীত কার্যাবলির বিবরণী।"

❁ টয়েনবি বলেন, "সমাজের জীবনই ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজের অনন্ত ঘটনা প্রবাহই ইতিহাস।"

❁ ঐতিহাসিক র‍্যাপসন বলেন, "ঘটনার ক্রমিক এবং বৈজ্ঞানিক বিবরণই ইতিহাস।"

❁ ইতিহাস শাস্ত্রবিদ ই.এইচ.কার মনে করেন যে, "ইতিহাস হলো বর্তমান ও অতীতের মধ্যে অন্তর্হীন সংলাপ।" তিনি আরো মনে করেন যে, "ইতিহাস হলো ঐতিহাসিক ও তথ্যের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক অব্যাহত প্রক্রিয়া।"

মূলত ইতিহাস হচ্ছে অতীতকালীন সময়কার মানব সমাজের ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিক বিবরণী, যার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সংঘাত, সম্প্রীতি তথা মানব সভ্যতার ভাঙাগড়ার পর্যালোচনামূলক ইতিকথা।

### ১.২ ইতিহাসের বিষয়বস্তু

**তাৎপর্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য ঘটনা**

মানব জীবনের গতিধারা সৃষ্টির সূচনা থেকে যা কিছু ঘটেছে, সবকিছুই ইতিহাস। কিন্তু ঘটে যাওয়া সকল কর্মকাণ্ড ইতিহাসে স্থান পায় না, বরং যে সব ঘটনা বা বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, তা-ই সাধারণত ইতিহাসে স্থান পায়। এসব ঘটনাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

**মানুষের সমাজ, সভ্যতা ও জীবনধারা**

ইতিহাসের অন্যতম বিষয়বস্তু হলো মানুষ ও তার পরিবেশ, সমাজ, সভ্যতা এবং জীবনধারা। ইতিহাস শুধুমাত্র ঘটনার সমষ্টি নয়, ঘটনার অন্তরালে বিদ্যমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণও ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত।

**মানব জীবনের বিকাশ ধারা**

ইতিহাসের অন্যতম বিষয়বস্তু হলো মানব জীবনের বিকাশের ধারাবিবরণী। মানুষ জন্মলগ্ন থেকে প্রতিনিয়ত পরিবেশের সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। শুরুতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। এই নির্ভরশীলতা যতই কমেছে, মানুষ ততই স্বাধীন ও স্বনির্ভর হয়েছে। ইতিহাস এসব বিষয় নিয়েও আলোচনা করে।

**আদিম সভ্যতা**

মানুষের আদিম সভ্যতা ও তার ক্রমবিকাশ ইতিহাসের অন্যতম বিষয়বস্তু। এক সময় মানুষ ছিল গুহাবাসী। সভ্যতার সর্বনিম্ন স্তরে তার অবস্থান ছিল। শিকার, মাছধরা এবং ফলমূল সংগ্রহ ছিল আদিম মানুষের জীবিকা। এরপর ধীরে ধীরে মানুষ জীবিকার ও অর্থনীতির উন্নতি সাধন করে উদ্বৃত্ত উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। এ সব বিবরণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

**সভ্যতার বিকাশধারা**

মানুষের সমাজ-সভ্যতা বিকাশের ধারাবিবরণীও ইতিহাসের অন্যতম বিষয়বস্তু। সভ্যতা বিকাশের এক পর্যায়ে মানুষ এক সময় গড়ে তোলে গ্রাম, গ্রাম থেকে নগর, নগর থেকে রাজ্য, রাজ্য থেকে সাম্রাজ্য। মানুষের এ জয়যাত্রার পথ সুগম ছিল

না। সমস্যা সঙ্কুল এপথে মানুষের সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তাই বলা যায়- মানব সভ্যতার অগ্রগতি, জয়যাত্রা, সাফল্য-ব্যর্থতা সবকিছুই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

**সার-সংক্ষেপ**

ইতিহাস হলো মানব জাতির আত্মপরিচয়ের এক বিশ্বকোষ। মানব সভ্যতার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে বর্তমানকাল পর্যন্ত উপনীত হবার ধারাবিবরণীই হলো ইতিহাস। এজন্য ইতিহাস অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটা শাস্ত্র বা বিষয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.১

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**এক কথায় উত্তর দিন :**

১. ইতিহাস শব্দটি কোন ইংরেজি শব্দের বাংলা অনুবাদ?
২. History বা Historia শব্দের আভিধানিক অর্থ কি?
৩. 'ইতিহ' শব্দের অর্থ লিখুন।
৪. মানব সভ্যতার ধারাবাহিক বিবরণকে কি বলা হয়?
৫. মানব সমাজে ঘটে যাওয়া কোন সব ঘটনা ইতিহাসের বিষয়বস্তু?

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. ইতিহাস শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করুন।
২. বিখ্যাত ইতিহাসবিদগণের কয়েকটি প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা উল্লেখ করুন।
৩. ইতিহাসের বিষয়বস্তু লিখুন।
৪. মানুষের সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের ধারাবিবরণী ও ইতিহাসের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করুন।

## পাঠ-২ : ইতিহাসের উপাদান ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি -**

☞ ইতিহাসের উপাদান সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ প্রাচীন ইতিহাসের উপাদানের বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ২.১ ইতিহাসের উপাদান

বর্ণমালা আবিষ্কারের পূর্ববর্তী সময়ের ইতিহাস জানার জন্য আমাদের সে যুগের মানুষের তৈরি ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উপর নির্ভর করতে হয়। বর্তমানে মানুষের অতীত ইতিহাস জানার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ইতিহাস রচনার জন্য উপাদান বা উৎস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের উপাদানের সাথে ইতিহাস রচনার পদ্ধতির রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সঠিক ইতিহাস রচনার জন্য এসকল উপাদানের উপর ঐতিহাসিকগণ একান্তভাবে নির্ভরশীল। ইতিহাসের উপাদান দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন- লিখিত ও অলিখিত উপাদান। লিখিত উপাদান হলো- মুদ্রা, শিলালিপি, নথিপত্র, সাহিত্য, জীবনী, রোজনামচা বা ডায়েরি প্রভৃতি। আর অলিখিত উপাদান হলো- সৌধ, মানুষের তৈরি হাতিয়ার, পোশাক, ইমারাত, ব্যবহৃত বাসন-কোসন, খাদ্যশস্যসমূহ ইত্যাদি। এসব উপাদান সঠিকভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটা যুগের বিশেষ সময়ের ইতিহাস জানা যায়।

### ২.২ প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান

প্রাচীন যুগের ইতিহাস জানার জন্যে ঐতিহাসিকগণ প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে সে যুগের মানুষের তৈরি যন্ত্রপাতি, মৃৎপাত্রের অংশ, মুদ্রা, অলংকার, মাটির পাত্র ইত্যাদি দ্রব্যাদি আবিষ্কার করেছেন। এসব যন্ত্রপাতির গঠনপ্রণালী হতে প্রাচীন যুগের অনেক তথ্য জানা যায়। গুহা ও মাটির পাত্রের গায়ে আঁকা ছবি হতেও শিল্প ও সভ্যতার পরিচয় মেলে। ঐতিহাসিকগণ পুরাতন পাথরের যুগ, নতুন পাথরের যুগ, তামা ও লোহা ব্যবহারের যুগ সম্পর্কে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। পাথরের যুগের পর আসে ধাতুর যুগ। ধাতুর যুগের মধ্যে প্রথমে তামার যুগ ও পরে লোহার যুগ। প্রাচীন ভারতের হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো, মেসোপটেমীয়, মিশর ও চীনে তামার যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই যুগে আগুনে পোড়ানো ইটের ঘর-বাড়ি ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদির নিদর্শন তাদের মোটামুটি উন্নত জীবনযাত্রার পরিচয় দেয়। পরের যুগটি ছিল লোহার যুগ। ব্যাবিলন, পারস্য, গ্রিস, রোম, চীন ও ভারতের বৈদিক যুগের সভ্যতা লোহার যুগ হিসেবে পরিচিত।

**লিপিমালা**

সম্ভবত ছবি আঁকার চেষ্টা ছিল লেখার প্রথম ধাপ। মিশরীয়রা প্রথমে ছবির মাধ্যমে লেখার চেষ্টা করে এবং কিছু সাংকেতিক বর্ণমালা আবিষ্কার করেছিল। সুমেরীয়দের বর্ণমালা ছিল 'কিউনিফর্ম' যা কাদামাটির ওপর খাঁজ কাটা, কীলক দিয়ে লেখা হতো। পাথরের উপর, গুহার গায়ে ও ধাতুর পাতের উপর মানুষ তার কথা লিখত। এই লেখাগুলোকে লিপি বলা হয়। মিশর, ভারত ও পারস্যে বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে যার মাধ্যমে সে যুগের বহু তথ্য জানা যায়।

**মুদ্রা**

লিপির ন্যায় মুদ্রাও অতীত ইতিহাস জানার জন্য খুব সহায়ক। প্রাচীন যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে মুদ্রার আবিষ্কার হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মুদ্রার উপর রাজার নাম, সময়কাল ও বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে মূর্তি খোদাই করা হতে থাকে। মুদ্রা হতে সমসাময়িক রাজার নাম, সন, তারিখ ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

### ২.৩ ইতিহাসের অন্যান্য উপাদান

বর্ণমালা আবিষ্কারের পর মানুষ নিজের কথা অন্যকে জানানোর চেষ্টা করে। কাগজের আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ মাটির ফলকে, নল-খাগড়ার তৈরি প্যাপিরাস-এ, পাথরের ফলকে, তালপাতা ও ভোজপাতায় লিখতে শুরু করে। প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে এ ধরনের বেশ কিছু লিখিত বিবরণী পাওয়া যায়, যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। প্রখ্যাত গ্রিক ঐতিহাসিক **হেরোডেটাস ও থুসিডিডিস** তাঁদের রচনায় গ্রিক, পারস্য ও মিশরীয় সভ্যতার বহু বিবরণ দিয়েছেন। রোমের ঐতিহাসিক **টেসিটাসের** রচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হোমারের ইলিয়ড ও অডিসি মহাকাব্যে প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক জাস্টিন ও প্লুটার্কের রচনা হতে গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ের কাহিনী জানা যায়। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সম্পর্কে বেদ, আরণ্যক ও রামায়াণে মূল্যবান ঐতিহাসিক লিখিত উপাদান রয়েছে। লিখিত উপাদানের

মধ্যে- সাহিত্য, রূপকথা, কাহিনী, কিংবদন্তী অতীত জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম। তবে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য লিখিত ও অলিখিত উভয় উপাদানের সমন্বয় খুবই প্রয়োজন।

### ২.৪ ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ইতিহাস মানুষকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষাদান করে। অতীতের নানামুখী ঘটনা মানুষ কি দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমানে বিচার করবে ইতিহাস সে বিষয়ে মানুষের কর্মপন্থা নির্ধারণে শিক্ষা দিয়ে থাকে।

**সমাজের ধারাবিবরণীর জ্ঞানলাভ**

ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে মানব সমাজের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা ও জীবনযাত্রার অগ্রগতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। কারণ ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো মানুষ ও সমাজের অগ্রগতির ধারাবর্ণনা।

**সভ্যতার বিকাশের সংগে পরিচয় লাভ**

মানব সভ্যতার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, বিকাশ ধারা এবং এজন্য ক্রিয়াশীল উদ্দীপনার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে। সভ্যতার প্রধান প্রধান স্তর, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে ইতিহাস তথ্য প্রদান করে। এসব তথ্য সম্পর্কে অবগত হলে মানব সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা যায়।

**মানুষের অতীত মনমানসিকতার পরিচয় লাভ**

মানুষের কীর্তির পেছনে ক্রিয়াশীল উদ্দেশ্য উদঘাটন করাও ইতিহাসের অন্যতম বিষয়। এভাবে মানুষের অতীত জীবনের মনমানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় ইতিহাস পাঠ ও চর্চার মাধ্যমে।

**অতীত থেকে জ্ঞানলাভ**

ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে অতীত সম্পর্কে জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করা যায়। ইতিহাসের আলোকে বর্তমানকে বিচার করে ও তা থেকে সঠিক শিক্ষা নিয়ে মানব সমাজের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখা যায়।

**জাতীয় চেতনার উন্মেষ লাভ**

ইতিহাস পাঠ জাতীয় চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাদান করে থাকে। একটা জাতির ঐতিহ্য ও অতীত গৌরব তাদেরকে বর্তমানে মর্যাদাপূর্ণ কর্মতৎপরতায় উজ্জীবিত করতে পারে। জাতীয় পরিচয়, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে, যা দেশ ও সমাজের উন্নতি তথা দেশপ্রেমের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

**গবেষণার ক্ষেত্রে**

গবেষণার ক্ষেত্রে ইতিহাস অধ্যয়ন করা খুবই জরুরি। ইতিহাস রচনা, পঠন-পাঠন সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজ আর কোন দ্বিমত নেই। রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সামরিক-বেসামরিক ও প্রশাসকসহ সচেতন সমাজের সকলের নিকট ইতিহাস খুবই মূল্যবান বিষয়।

**বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে**

ঐতিহাসিক ঘটনার সঠিক আলোচনা বর্তমানের কর্মপন্থা অবলম্বন ও ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে সহায়ক হয়। সঠিক ইতিহাস আমাদেরকে অতীত সময়ের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সাহায্য করে।

**কৌতূহল নিবৃত্তি**

মানুষ কৌতূহল প্রিয়। মানুষ তার অতীত ঘটনা জানতে চায়। ইতিহাস পাঠ করার মাধ্যমেই মানুষ তার কৌতূহল নিবৃত্তি করতে পারে।

**চেতনাবোধ জাগ্রত করে**

ইতিহাস একটি জাতির ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে। সমাজ ও জাতির অগ্রগতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ইতিহাসের জ্ঞান সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এভাবে ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। মানুষ অনুপ্রাণিত হয় উন্নতি ও প্রগতির পথে।

**সার-সংক্ষেপ**

ইতিহাস হলো অতীতকালের ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা। ইতিহাসের মূল উপজীব্য হলো মানুষ ও তার কর্মকাণ্ড। বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্রিক পণ্ডিত হেরোডোটাস সর্বপ্রথম মানুষের অতীতের ধারাবাহিক কাহিনী রচনায় প্রয়াসী হন বলে তাকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে যা কিছুর সূচনা হয়েছে এবং ঘটেছে সবই ইতিহাসের আলোচনার বিষয়বস্তু। তবে সকল ঘটনাকেই ইতিহাস গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয় না। কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইতিহাস প্রধানত দুই ধরনের উপাদানের ভিত্তিতে রচিত হয়। এক. লিখিত দুই. অলিখিত। লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে- সমকালীন সাহিত্য, ধর্মগ্রন্থ, পর্যটকদের বিবরণী, সরকারি নথিপত্র, বিভিন্ন আত্মজীবনী ইত্যাদি। অলিখিত উপাদানের প্রধান উৎস হলো- প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। অবশ্য মুদ্রা ও শিলালিপি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত। ইতিহাস পাঠ করে কেবল আমরা অতীতের অবস্থাকেই জানতে পারি না, সেই সাথে আমরা অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎকে গড়তে পারি। সর্বোপরি ইতিহাস পাঠ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধেরও জন্ম দেয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি বেছে নিন :**

১. ইতিহাসের উপাদান- দু'ভাগে বিভক্ত/তিন ভাগে বিভক্ত/পাঁচ ভাগে বিভক্ত।
২. ইতিহাসের লিখিত উপাদান হলো- সমকালীন সাহিত্য/ভাস্কর্য/পোশাক।
৩. প্রাচীন যুগের ইতিহাস জানার জন্য ঐতিহাসিকগণ- পুথি সাহিত্যের/মৃৎ শিল্পের/প্রত্নতাত্ত্বিক খননের আশ্রয় নিয়েছেন।
৪. মিশরীয়রা প্রথমে ছবির মাধ্যমে/বর্ণমালার মাধ্যমে লেখার চেষ্টা করেন।
৫. একটি জাতির ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে- ইতিহাস/অর্থনীতি/পৌরনীতি।

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. ইতিহাসের উপাদান বলতে কি বোঝেন?
২. প্রাচীন ইতিহাসের উপাদানের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৩. ইতিহাসের উপাদান হিসেবে 'লিপিমালা' ও 'মুদ্রা' এর মূল্যায়ন করুন।
৪. ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তার কয়েকটি দিক লিখুন।
৫. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে ইতিহাস কিভাবে সাহায্য করে?

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১

**বিশদ উত্তরমূলক প্রশ্ন**

১. ইতিহাসের সংজ্ঞা দিন। ইতিহাসের বিষয়বস্তুর বিবরণ দিন।
২. ইতিহাস কাকে বলে? ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

# ইউনিট ২

# প্রাচীন সভ্যতাসমূহ

## ভূমিকা

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ইতিহাস প্রাচীন। আজকের মানব সভ্যতা এক দিনে গড়ে ওঠেনি। ইতিহাসের দৃষ্টিতে মানব সভ্যতার দুটো যুগ। এক. প্রাগৈতিহাসিক যুগ- এটা হলো ইতিহাসের পূর্বের যুগ। অর্থাৎ যখনকার ইতিহাস জানা যায়, তারও পূর্বের যুগ। দুই- ঐতিহাসিক যুগ। যে যুগের ইতিহাস আমরা জানি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসানের মধ্য দিয়ে সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছে। বিশ্ব সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫,০০০ অব্দ থেকে। ইতিহাস থেকে প্রাচীন সভ্যতাসমূহের কথা জানা যায়। প্রাচীন সভ্যতাসমূহের মধ্যে- মিশরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমীয় সভ্যতা, সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যবিলনীয় সভ্যতা, এ্যাসিরীয় সভ্যতা, ক্যালডীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, ফিনিশীয় সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা, হিব্রু সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা ও রোমান সভ্যতা- মানব সভ্যতায় বিশেষ অবদান রেখেছে। এই ইউনিটে এসব সভ্যতাসমূহের পরিচয় এবং সভ্যতায় তাদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ–**

- ➔ পাঠ ১ : মিশরীয় সভ্যতা
- ➔ পাঠ ২ : মেসোপটেমীয় সভ্যতা
- ➔ পাঠ ৩ : সুমেরীয় সভ্যতা
- ➔ পাঠ ৪ : ব্যাবিলনীয় সভ্যতা
- ➔ পাঠ ৫ : এ্যাসিরীয় সভ্যতা
- ➔ পাঠ ৬ : ক্যালডীয় সভ্যতা
- ➔ পাঠ ৭ : সিন্ধু সভ্যতা
- ➔ পাঠ ৮ : ফিনিশীয় সভ্যতা
- ➔ পাঠ ৯ : পারস্য সভ্যতা
- ➔ পাঠ ১০ : হিব্রু সভ্যতা
- ➔ পাঠ ১১ : চীন সভ্যতা
- ➔ পাঠ ১২ : গ্রিক সভ্যতা
- ➔ পাঠ ১৩ : রোমান সভ্যতা

## পাঠ-১ : মিশরীয় সভ্যতা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ প্রাচীন মিশরীয়দের পরিচয় দিতে পারবেন।
☞ মানব সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ মিশরীয়দের বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

### ১.১ পরিচয়

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০-৫২৫ অব্দ। এ সময়কালে মিশরীয়গণ এক উন্নতমানের নগর সভ্যতা গড়ে তোলে। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পকলা, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রাচীন মিশরীয়দেরকে সভ্যতার ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান দিয়েছে।

মিশরীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল- রাজ পরিবারের সদস্যবর্গ, পুরোহিত, অভিজাত, লিপিকর, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষক ও ভূমিদাস। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরাট পার্থক্য ছিল। মিশরীয়দের মধ্যে এক-বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এমনকি আইনসঙ্গতভাবে ফারাওদের (রাজাদের) একাধিক বিয়ে করার অধিকার ছিল না। মিশরীয় সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক এবং মেয়েরা উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করত। সমাজের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল। উৎপাদিত ফসলের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল- তুলা, গম, যব, পীচ ও পিঁয়াজ। মিশরীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। মিশরীয় জনগণের মধ্যে একটা বিরাট অংশ পাথর শিল্প, নৌযান তৈরি, মাটির পাত্র, কাচ এবং বয়নশিল্পে নিয়োজিত ছিল। মিশরীয়গণ বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত। পুরাতন রাজবংশের সময় প্রধান দেবতা ছিলেন সূর্যদেবতা 'রে' অথবা 'রা'। নীলনদের দেবতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন ওসিরিস। মিশরীয়দের মতে এই দুই দেবতাই সমগ্র বিশ্ব পরিচালনা করতেন।

### ১.২ সভ্যতায় প্রাচীন মিশরীয়দের অবদান

বিশ্ব সভ্যতায় প্রাচীন মিশরীয়দের অবদান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিশরীয় সভ্যতার অবদান নিচে আলোচনা করা হল :

**চাষাবাদ**

নীলনদের তীরে প্রাচীন মিশরীয়গণ চাষাবাদের মাধ্যমে ফসল ফলাত। তাদের ফসল বন্যার কবল হতে রক্ষার জন্য তারা তৈরি করত বাঁধ। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচ দেয়ার জন্য খাল কেটে গড়ে তুলেছিল পানি সেচের ব্যবস্থা। মিশরীয়রাই প্রথম সরকারি ব্যবস্থাপনায় চাষাবাদ চালু করে।

**কারখানা নির্মাণ**

প্রাচীন মিশরীয়গণ খনি হতে আহরণ করত তামা আর টিন। এ দুই ধাতু হতে তারা তৈরি করত ব্রোঞ্জ। পাথরের চেয়ে ব্রোঞ্জের অস্ত্র ও দ্রব্যসামগ্রী বেশি কার্যকর। তাই এসব দ্রব্য তৈরির জন্য গড়ে ওঠে ছোট ছোট কারখানা। খনি, ধাতু, কাচ, বয়ন, মৃৎ, জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য মিশর প্রসিদ্ধ ছিল।

**রাষ্ট্রের উদ্ভব**

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে সবকিছু বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে। তাই প্রয়োজনের মুখে প্রাচীন মিশরের মানুষ একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। যোগ্য ব্যক্তি হতেন তাদের দলপতি। তার কথা সবাই মান্য করত। এভাবে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিলেন রাজা। প্রাচীন মিশরের রাজাদের বলা হতো 'ফারাও'। সূর্য দেবতার সন্তান হিসেবে তিনি ছিলেন আমানরে। ৩২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজা মেনেস প্রথম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একই সাথে রাজা ও প্রধান পুরোহিত ছিলেন।

**ধর্ম**

প্রাচীন মিশরের সভ্যতা বিকাশে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ধর্মীয় চেতনা মিশরীয়দের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। মিশরীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় ধর্মের প্রভাব স্পষ্ট। মিশরীয় সাহিত্য ও দর্শন ধর্মের আলোকে গড়ে উঠেছিল। ধর্মের বিধি-বিধান দিয়ে রাষ্ট্র শাসন করা হতো। ধর্মভিত্তিক গড়ে ওঠা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করত দেশের অর্থনীতি। শুরুতে বহু দেব-দেবতায় মিশরীয়রা বিশ্বাসী ছিল। তাদের প্রাচীন ধর্মীয় সভ্যতায় কুসংস্কার প্রবেশ করলে তা দূর করার জন্যে এগিয়ে আসেন ফারাও চতুর্থ আখেনহোটেপ। তিনি বহু দেবতার বদলে একমাত্র সূর্য দেবতার আরাধনার কথা প্রচার করেন। সূর্য দেবতার নাম দেন এটন। দেবতার নামের সাথে মিল রেখে নিজের নাম দেন 'ইখনাটন'। এভাবে ইখনাটন প্রাচীন মিশরীয়দের মাঝে এক ঈশ্বরের ধারণা দেয়। মিশরীয়রা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিল। তারাই প্রথম শেষ বিচার ও পৃথিবীতে কৃতকর্মের উপর স্বর্গ ও নরকে পাঠানোর বিষয় উল্লেখ করে। ধর্ম-কর্ম পরিচালনার জন্য মিশরে পুরোহিত শ্রেণী গড়ে ওঠে।

**স্থাপত্য ও ভাস্কর্য**

মিশরীয়দের বলা হয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা। ফারাও, অভিজাত আর ধনীদের জন্য তৈরি হলো বড় বড় দালানকোঠা। পাথর কেটে কেটে তারা প্রকাণ্ড সব সৌধ বানাতে ছিল খুব দক্ষ। তাদের এসব সৌধ হচ্ছে মিশরের বিখ্যাত পিরামিড। সবচেয়ে বড় পিরামিড ফারাও খুফুর পিরামিড যার উচ্চতা ৪৮১ ফুট। তারা মৃত্যুর পর আরেকটি জীবনে বিশ্বাসী ছিল। সে জীবনেও রাজা হবেন ফারাও। তাই তাদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল পিরামিড। আর মধ্যরাজ বংশের আমলে পিরামিডের বদলে ফারাওরা তৈরি করেন ধর্ম মন্দির। সবচেয়ে বড় মন্দির কারনাক মন্দির। ভাস্কর্যের অধিকাংশ নিদর্শন দেখা যায় সমাধি, সৌধ ও মন্দিরের প্রবেশ পথে। মন্দিরের ভেতরের দেয়াল সাজানো হতো মূর্তি খোদাই করে। মিশরীয় ভাস্কর্যের সবচেয়ে গৌরব 'স্ফীংস' তৈরিতে। বহুখণ্ড পাথরের গায়ে ফুটিয়ে তোলা হতো এ ভাস্কর্য। এর দেহ ছিল সিংহের আর মাথা ছিল ফারাওয়ের। এর দ্বারা বুঝানো হতো ফারাও সিংহের মতো বলবান।

**চিত্র ও কারুশিল্প**

মিশরের চিত্রশিল্পীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। সমাধি আর মন্দিরের দেয়াল সাজাতে গিয়েই চিত্রশিল্পের সূচনা হয়। চিত্রশিল্পীদের প্রিয় রঙ ছিল সাদা আর কালো। প্রাচীন মিশরীয়গণ কারুশিল্পেও ছিল পারদর্শী। তাদের তৈরি বাহারি রঙের মাটির পাত্রগুলো ছিল চমৎকার। তাদের বয়ন শিল্পীগণ তৈরি করত বিচিত্র কম্বল, পর্দা ও কুশন। বিভিন্ন ধরনের অলংকার তৈরিতেও মিশরীয়রা ছিল দক্ষ। কারুশিল্পেও বিশেষ অবদান রাখে।

**লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন**

মিশরীয়রা প্রথম লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে। তাদের লিখন পদ্ধতির নাম হায়ারোগ্লিফিস্ক। তারা এমনি ২৪টি ব্যঞ্জনধ্বনি বা চিহ্ন আবিষ্কার করে। তারা প্যাপিরাসের পাতায় লিখত, ক্রীট, ফিনিশিয়া, লিভিয়া সভ্যতা এ লিপির ব্যবহার করে।

**বিজ্ঞান**

ধর্মের কারণে মিশরীয়দের মাঝে জ্ঞানের চর্চা হতো। যেহেতু ফারাও মৃত্যুর পর পরকালের রাজা হবেন, সেহেতু তার মৃতদেহকে পচন থেকে রক্ষার জন্য মিশরীয় বিজ্ঞানীরা মমি তৈরি করতে শেখেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে ও জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে মিশরীয় বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মিশরীয়রা প্রথম ৩৬৫ দিনের সৌর বছর ও সৌর পঞ্জিকা অধিকার করে। অংক শাস্ত্রের পাটিগণিত ও জ্যামিতির উদ্ভাবন করে। চিকিৎসা শাস্ত্রে তারাই সর্বপ্রথম "মেটেরিয়া মেডিকা" বা ঔষধের তালিকা প্রণয়ন করে।

**সার-সংক্ষেপ**

প্রাচীন মিশরীয়দের নানা অবদানে বিশ্ব সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে যুগে যুগে। তাই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে তাদেরকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা যায়। চিত্রলিপির উদ্ভাবন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে অভূতপূর্ব অগ্রগতি, পাটিগণিত, জ্যামিতি ও মৃতদেহ সংরক্ষণের উপায় উদ্ভাবন, মেটেরিয়া মেডিকা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাচীন মিশরীয়গণ সভ্যতার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.১

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন :**

১. প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০-৫২৫ অব্দ।
২. মিশরীয় প্রাচীন সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।
৩. প্রাচীন মিশরীয়গণ খনি হতে আহরণ করত তামা ও টিন।
৪. প্রাচীন মিশরের রাজাদের বলা হতো 'ফারাও'।
৫. মিশরীয়দের বলা হয় ইতিহাসের প্রতিষ্ঠাতা।
৬. মিশরীয়দের ধর্ম স্থানকে বলা হয় পিরামিড।
৭. মৃত দেহকে পচন থেকে রক্ষার জন্য মিশরীয় বিজ্ঞানীরা মমি তৈরি করার কৌশল উদ্ভাবন করেন।
৮. মিশরের সবচেয়ে বড় মন্দিরের নাম কারণাক মন্দির।
৯. মিশরের লেখন পদ্ধতির নাম কিউনিফর্ম।
১০. মিশরীয়রা চন্দ্র পঞ্জিকা আবিষ্কার করে।

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার পরিচয় দিন।
২. সভ্যতায় প্রাচীন মিশরীয়দের পাঁচটি অবদানের কথা লিখুন।
৩. প্রাচীন মিশরের সভ্যতা বিকাশে ধর্মের ভূমিকা নিরূপণ করুন।
৪. স্থাপত্য চিত্রশিল্প ও লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবনে মিশরীয়দের অবদান লিখুন।
৫. 'পিরামিড' ও 'মমি' সম্বন্ধে টীকা লিখুন।

## পাঠ-২ : মেসোপটেমীয় সভ্যতা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ মেসোপটেমীয় সভ্যতার অবস্থান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
☞ মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত সভ্যতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
☞ মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

### ২.১ মেসোপটেমীয় সভ্যতার অবস্থান

আধুনিক ইরাক রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যেই প্রাচীনকালে মেসোপটেমীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই উর্বর ভূখণ্ডের উত্তরে আর্মেনিয়ার পার্বত্যাঞ্চল, পশ্চিম ও দক্ষিণে আরব মরুভূমি, দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য উপসাগর, পূর্বে এলাম পার্বত্যাঞ্চল এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত।

### ২.২ মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত সভ্যতাসমূহ

গ্রিক শব্দ মেসোপটেমিয়ার অর্থ হচ্ছে দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৫০০০ অব্দে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে মিশরীয় সভ্যতার সমকালীন একটি সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই সভ্যতাটি ইতিহাসে মেসোপটেমীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। মেসোপটেমীয় অঞ্চলে বেশ কয়েকটি সভ্যতার বিকাশ ঘটে। যেমন- সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, এ্যাসিরীয়, ক্যালডীয় ও আক্কাদীয় সভ্যতা। সভ্যতাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকলেও একই ভূখণ্ডে গড়ে উঠার কারণে এগুলোকে একত্রে মেসোপটেমীয় সভ্যতা বলা হয়।

### ২.৩ মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য

ভৌগোলিক কারণে মেসোপটেমিয়া ছিল বিভিন্ন প্রকার মানুষের আগমন ও বিদেশী আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত। ফলে উত্তর-পূর্ব মালভূমি হতে প্রাচীনকালে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ মেসোপটেমিয়ার উর্বর ভূমিতে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করে। দক্ষিণে অবস্থিত আরব মরুভূমি হতে মরু বেদুইনরা মেসোপটেমিয়া আক্রমণের চেষ্টা করে। মেসোপটেমিয়া মিশরের মতো কোন একক রাজার শাসনাধীনে ছিল না। মন্দিরের প্রাচুর্য ও অবস্থান দেখে ধারণা করা হয় এই অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন মন্দিরের নিয়ন্ত্রণে বাঁধা ছিল। আর সার্বিক জীবন পরিচালনায় পুরোহিতদের ভূমিকা ছিল প্রধান। তাছাড়া মেসোপটেমিয়ায় দেখা যায় কঠিন আইন ও কঠোর শাস্তির বিধান।

**সার-সংক্ষেপ**

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী উর্ব্বর সমতল ভূমিতে মেসোপটেমীয় সভ্যতার উদ্ভব হয়। শুধু একটি নয় বরং এ অঞ্চলে একই সাথে আরো পাঁচটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তবে বিদেশী আক্রমণ ও প্রাকৃতিকভাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য উন্মুক্ত এই জনপদ কোন একক রাজার শাসনাধীনে ছিল না। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে মেসোপটেমীয় সভ্যতার নানামুখী অবদান রয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন :**

১. প্রাচীন মেসোপটেমিয়া হচ্ছে বর্তমান কালের —

ক. ইরান খ. জেরুজালেম

গ. ইরাক ঘ. কুয়েত

২. মেসোপটেমীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিল —

ক. মিশরীয় সভ্যতা খ. চৈনিক সভ্যতা

গ. সুমেরীয় সভ্যতা ঘ. সিন্ধু সভ্যতা

৩. মেসোপটেমীয় শব্দ দ্বারা কি বুঝায়?

ক. নদী তীরবর্তী এলাকা খ. দুই নদীর মধ্যবর্তী সমতল ভূমি

গ. উঁচু মালভূমি ঘ. সমুদ্রে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ

৪. কোন দুটি নদীর তীরে মেসোপটেমীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে?

ক. টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদী খ. মিসিসিপী-মিসোরীয়

গ. গঙ্গা-যমুনা নদী তীরে ঘ. হোয়াং হো-ইয়াং সিকিয়াং

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. মেসোপটেমীয় সভ্যতার পরিচয় ও অবস্থানের বর্ণনা দিন।

২. মেসোপটেমীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত সভ্যতাসমূহের বিবরণ দিন।

৩. মেসোপটেমীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।

## পাঠ-৩ : সুমেরীয় সভ্যতা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ সুমেরীয় সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল বলতে পারবেন।
☞ সুমেরীয়দের সামাজিক অবস্থা উল্লেখ করতে পারবেন।
☞ মানব সভ্যতায় সুমেরীয় সভ্যতার অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
☞ সুমেরীয় ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারবেন।
☞ প্রশাসনে সুমেরীয়দের অবদান বলতে পারবেন।

### ৩.১ সুমেরীয় সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল

মেসোপটেমীয় অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলায় প্রথম নেতৃত্ব দেয় সুমেরীয়রা। সুমেরী একটি জাতির নাম। তাদের আদি বাসস্থান ছিল মেসোপটেমিয়ার (বর্তমান ইরাক) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এলামের পাহাড়ি অঞ্চলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে এদের একটি শাখা মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণে বসতি গড়ে তোলে। তাদের নামানুসারে এ অঞ্চলটির নাম সুমেরীয় অঞ্চল। আর তাদের সভ্যতাকে বলা হয় সুমেরীয় সভ্যতা। সুমেরীয়রা খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের পূর্বেই সুমেরু নগর গড়ে তোলে।

### ৩.২ সুমেরীয়দের সামাজিক অবস্থা

সুমেরীয় সমাজের মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যেমন–

**অভিজাত সম্প্রদায়** : উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল শাসক, পুরোহিত, অভিজাত, সামন্ত প্রভু, বণিক, শিল্পমালিক এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা।

**মধ্য শ্রেণী** : মধ্য শ্রেণীতে অবস্থান ছিল চিকিৎসক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বাধীন ভূমিমালিক (কৃষক) শ্রমিক।

**নিম্ন শ্রেণী** : নিম্ন শ্রেণীর অধিবাসী ছিল দাস, ভূমিদাস ও সাধারণ শ্রমিক তথা সর্বসাধারণ।

**ধর্ম :** সুমেরীয় ধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, সুমেরীয়রা বহু দেবতায় বিশ্বাসী ছিল। দ্বিতীয়ত, সুমেরীয় ধর্ম ছিল ইহজাগতিক ধর্ম। তৃতীয়ত, সুমেরীয় ধর্মে নৈতিকতা অনুপস্থিত ছিল। তারা বৃষ্টি, বাতাস, পানি, উর্বরতা, প্লেগ রোগ ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা মনে করত। তাদের কেন্দ্রীয় ধর্মমন্দিরকে বলত 'জিগুরাত' আর ধর্মগুরুকে বলত 'পাতেজি'।

### ৩.৩ সভ্যতায় সুমেরীয়দের অবদান

সুমেরীয়দের সভ্যতায় অবদান ছিল নিম্নরূপ :

**প্রশাসনে অবদান**

২৮০০ খ্রি. পূর্বাব্দের আগে সুমেরীয় সভ্যতা ৩০টি নগররাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। নগররাষ্ট্রের প্রধানের পদবি ছিল পাতেশি। তিনি একাধারে পুরোহিত, সেনাপ্রধান, কৃষি বিভাগের প্রধান ছিলেন। ২৮০০ খ্রি. পূর্বাব্দে ডুঙ্গি ৩০টি নগররাষ্ট্র নিয়ে প্রথম একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

**লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার**

সুমেরীয়রা একটি ভিন্ন ধরনের লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল। মিশরীয়দের মতো প্রথম দিকে তারা চিত্রলিপি ধরনের লেখা শুরু করে। দ্রুত ভাব প্রকাশের জন্য ধীরে ধীরে লিখন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। এভাবেই মেসোপটেমিয়ায় একটি নতুন ধরনের লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটে। কাদামাটির শ্লেটে নল-খাগড়ার কলম দিয়ে এক রকম কৌণিক রেখা ফুটিয়ে তোলা হতো। খাঁজ কাটা এ চিহ্নগুলো দেখতে অনেকটা ইংরেজি অক্ষর "V" এর মতো। আবার কখনো কখনো তীরের মতো ডিজাইন। প্রাচীন সুমেরীয়দের এ লিপির নাম দেয়া হয় কিউনিফর্ম যা মেসোপটেমীয় লিপি হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। সুমেরীয় ভাষায় ৫০০ এর বেশি কিলবাকার সংকেতিক চিহ্ন ছিল। এই লিপি বাম থেকে ডানে লেখা হতো।

**কৃষি**

সুমেরীয়দের আয়ের মূল উৎস ছিল কৃষি। তারা কৃষিকার্য পরিচালনার জন্যে উন্নত সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। গম, যব, বার্লি, খেজুর, শাক-সবজি চাষ করত।

**আইন**

সুশৃঙ্খল জীবন পরিচালনার জন্য সুমেরীয়গণ একটা আইনের কাঠামো গড়ে তোলে। প্রাচীন সুমেরীয় সম্রাট 'ডুঙ্গি' এ আইন তৈরি করেন। তাদের আইন ছিল খুব কঠোর। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত ও অঙ্গের পরিবর্তে অঙ্গ কর্তন ছিল আইনের বিধান।

**ডুঙ্গির আইন**

পৃথিবীর প্রথম আইন সংকলন। এই আইন ছিল প্রতিশোধমূলক। পরবর্তী অনেক সভ্যতা এই আইন অনুসরণ করে।

**ব্যবসা-বাণিজ্য**

সুমেরীয়গণ চারপাশের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। ফিলিস্তিন, ফিনিশিয়া, ক্রীট, ইজিয়ান দ্বীপমালা, এশিয়া মাইনর এবং মিশরের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ভারতের সাথেও তাদের ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল বলে ধারণা করা হয়।

**বিজ্ঞানে তাদের অবদান**

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুমেরীয়দের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তারা জলঘড়ি, চন্দ্র পঞ্জিকা আবিষ্কার করেন। তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চাও করতেন। গণিতশাস্ত্রেও তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল বলে জানা যায়। ৩৬০ ডিগ্রিতে বৃত্ত বিভাগ, ৬০ ভিত্তিক গণনা পদ্ধতি চালু করে।

**ভাস্কর্য ও স্থাপত্য**

সুমেরীয়গণ ভাস্কর্য নির্মাণেও ভূমিকা রেখেছেন। সিলমোহর নির্মাণ করে ও ধাতব দ্রব্য খোদাই করে তারা মূর্তি তৈরি করত। চিত্রশিল্পের বিকাশে তাদের দক্ষতা কম নয়। জিগুরাট নির্মাণে উন্নত স্থাপত্য রীতি ব্যবহার করে।

**সার-সংক্ষেপ**

সুমেরীয়রাই মূলত মেসোপটেমীয় সভ্যতার ভিত্তি গড়ে তোলে। সুমেরীয়দের আদি অবস্থান ছিল মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এলামের পাহাড়ি অঞ্চলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে এদের একটি শাখা মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণে বসতি গড়ে তোলে। তাদের নাম অনুসারে অঞ্চলটির নাম সুমেরীয় অঞ্চল। মেসোপটেমীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সভ্যতাসমূহের মধ্যে সুমেরীয় সভ্যতা অন্যতম। এটি মূলত একটি কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। সমাজ ব্যবস্থা ছিল শ্রেণীভিত্তিক। সুমেরীয় মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন শাসক। সভ্যতায় তাদের বড় অবদান হলো কিউনিফর্ম লিপি ও গণনা পদ্ধতির আবিষ্কার। সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য তারা আইনের কাঠামো তৈরি করে। ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প ও সাহিত্যের বিকাশে তাদের অবদান স্মরণযোগ্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৩

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**খালি স্থানে সঠিক শব্দটি লিখুন :**

১. সুমেরী একটি —— নাম।
২. সুমেরীয়দের আদি বাসস্থান ছিল মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত —— পাহাড়ি অঞ্চল।
৩. জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে ৪০০০ অব্দে এদের একটি শাখা —— দক্ষিণে বসতি গড়ে তোলে।
৪. সুমেরীয়দের নামানুসারে এ অঞ্চলটির নাম —— অঞ্চল।
৫. সুমেরীয়রা খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের পূর্বেই —— নগর গড়ে তোলে।
৬. সুমেরীয় প্রথম রাজার নাম ——।
৭. সুমেরীয়দের কেন্দ্রীয় মন্দিরের নাম ——।
৮. সুমেরীয় নগর রাজ্যের প্রধানকে —— বলা হতো।

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. সুমেরীয় সভ্যতার অবস্থানস্থল ও সময়কাল উল্লেখ করুন।
২. সুমেরীয়দের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করুন।
৩. সভ্যতায় সুমেরীয়দের অবদান বিশ্লেষণ করুন।
৪. সুমেরীয়দের ধর্ম ও লেখন পদ্ধতির বর্ণনা দিন।

## পাঠ-৪ : ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ ব্যাবিলনীয় সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল নিরূপণ করতে পারবেন।
☞ ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সামাজিক অবস্থা বলতে পারবেন।
☞ মানব সভ্যতায় ব্যাবিলনীয় সভ্যতার অবদান উল্লেখ করতে পারবেন।

### ৪.১ ব্যাবিলনীয় সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল

সিরিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে আমোরাইট নামক এক জাতি বসবাস করত। এরা এক সময় মেসোপটেমিয়ায় এসে নগর সভ্যতা গড়ে তোলে। এদের এই সভ্যতাকে বলে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। এ সভ্যতার পত্তন হয় খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে। আমোরাইট নেতা হাম্মুরাবী ছিলেন ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।

### ৪.২ সামাজিক অবস্থা

ব্যাবিলনীয় সমাজের মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল :

**উচ্চ শ্রেণী :** উচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করত রাজা, পণ্ডিত, পুরোহিত ও সৈন্য। এদের নিজস্ব জমি ছিল।

**মধ্য শ্রেণী :** শিল্পী ও স্বাধীন ব্যবসায়ীদের মনে করা হতো মধ্যশ্রেণীর লোক।

**নিম্ন শ্রেণী :** নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষক, সাধারণ শ্রমিক ও দাস। সাধারণত যুদ্ধবন্দিদের দাস করা হতো।

গ্রিস, রোম, এশিয়া মাইনর, পারস্য, সিন্ধুদেশসহ প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোর সাথে ব্যাবিলনীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষেরা ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে শিল্পজাত দ্রব্য কিনত। ব্যাবিলনীয়রা আমদানি করত স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, কাঠ ও খনিজ লবণ। তারা ভারতবর্ষ থেকে হাতির দাঁত ও মরুভূমি অঞ্চল থেকে উট সংগ্রহ করত। ব্যাবিলনীয়রা ঘোড়ার ব্যবহার জানত।

### ৪.৩ সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের অবদান

**আইনের শাসন**

ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় আইনের শাসন লক্ষ্য করা যায়। তাদের আইন ছিল প্রতিশোধমূলক। যেমন- দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ, হাতের বদলে হাত, জীবনের বদলে জীবন ইত্যাদি। ২৮২টি আইনে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবার, সম্পত্তি, কৃষি, দাসসহ সবধরনের আইনের উল্লেখ ছিল। আইন সংকলক হিসেবে হাম্মুরাবি অমর হয়ে আছেন। তিনি ছিলেন সুমেরীয় আইনের প্রভাবে প্রভাবিত। তাই ব্যাবিলনীয় আইনে সুমেরীয় আইনের প্রভাব দেখা যায়। হিব্রু, ফিনিশিয়, রোমান সভ্যতায় এই আইনের প্রভাব রয়েছে।

**বিজ্ঞানে**

ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় বিজ্ঞান চর্চার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন আবিষ্কারে তাদের অবদান রয়েছে। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার যুগে গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় উন্নয়ন ঘটে। চাঁদ পর্যবেক্ষণ করে ব্যাবিলনে পঞ্জিকা তৈরি হয়েছিল।

**ঘরবাড়ি নির্মাণ**

ব্যাবিলনে পাথুরে পাহাড় নেই। তাই রোদে শুকানো ইট দিয়ে তারা ঘরবাড়ি বানাত। ব্যাবিলনীয় কারিগররা বিভিন্ন ধাতব দ্রব্য, মাটির পাত্র ও ঝুড়ি নির্মাণ করত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

**ধর্মীয় প্রভাব**

ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। প্রথমত, তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক ছিল। তাদের প্রধান দেবতার নাম 'মারদুক' আর প্রধান দেবী 'ইশতার'। তাদের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দেবতার নাম- 'তাম্মুজ'। আর অপদেবতার নাম ছিল হর্ডস। দ্বিতীয়ত, পরকাল বা মৃত্যুর পর পুনর্জন্মের কোন ধারণা ব্যাবিলনীয়দের ছিল না। তাদের ধর্মচিন্তায় কুসংস্কারের প্রাধান্য ছিল। তৃতীয়ত, মন্দির ব্যাবিলনীয় ধর্মে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিল।

**শিল্পকলা**

ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় তৈলচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের আঁকা বিভিন্ন ছবি পাওয়া গেছে। জিগুরাট মন্দির পক্কে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি, একটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে যা ৭ তলা বিশিষ্ট।

**ভাষা ও সাহিত্য**

ব্যাবিলনীয়গণ সাহিত্য চর্চা করতেন। কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা হয় তাদের বিখ্যাত মহাকাব্য গিলগামেশ। তাদের ভাষা ছিল ৩০০ ধ্বনি চিহ্ন বিশিষ্ট।

**সার-সংক্ষেপ**

ব্যাবিলনীয় সভ্যতার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে আমরা বুঝতে পারি, বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার পিছনে তাদের অনেক অবদান বিদ্যমান। প্রাচীন ব্যাবিলন নগরকে কেন্দ্র করে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে। তাদের বড় অবদান হলো- পৃথিবীতে তারাই প্রথম লিখিত আইন প্রণয়ন করে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে তারা অনেক উন্নতি করতে পেরেছিল। বিশেষ করে আইনের ক্ষেত্রে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৪

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ব্যাবলনীয় সভ্যতার পত্তন হয়—

ক. খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে খ. খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে

গ. খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে ঘ. ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে

২. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা কোথায় গড়ে ওঠে?

ক. মিশরে খ. মেসোপটেমীয় অঞ্চলে

গ. রোমে ঘ. ভারতে

৩. ব্যাবিলনীয় সভ্যতার যুগে সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন ঘটে—

ক. গণিতশাস্ত্রে খ. জ্যোতির্বিদ্যায়

গ. পঞ্জিকায় ঘ. আইনশাস্ত্রে

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. ব্যাবিলনীয় সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল নিরূপণ করুন।

২. ব্যাবিলনীয়দের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল।

৩. সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের অবদান বিশ্লেষণ করুন।

## পাঠ-৫ : এ্যাসিরীয় সভ্যতা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ এ্যাসিরীয় সভ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন।

☞ সভ্যতায় এ্যাসিরীয়দের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

### ৫.১ এ্যাসিরীয় সভ্যতা

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০০-৯০০ অব্দের মধ্যে এ্যাসিরীয় সভ্যতার পত্তন ঘটে। প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে এ্যাসিরীয় সভ্যতা অন্যতম। ব্যাবিলন থেকে প্রায় দু'শ মাইল উত্তরে টাইগ্রিস নদীর তীরে একটি শহর গড়ে ওঠে। সমৃদ্ধ এ শহরের নাম এ্যাসুর। এ শহরের অধিবাসীরা এ্যাসিরীয় নামে পরিচিত ছিল। প্রথমদিকে কৃষিকাজ আর পশুপালন করে এরা জীবন চালাত। কিন্তু জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে বেঁচে থাকার জন্য তাদের হাত বাড়াতে হয় প্রতিবেশী দেশগুলোর দিকে। ফলে এ্যাসিরীয়রা ক্রমে যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয়। সামরিক ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তারা গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করে এবং যুদ্ধরথের ব্যবহার করে। সে যুগের বিবেচনায় তাদের সেনাবাহিনী ছিল বেশ আধুনিক। ক্রমে এ্যাসিরীয় রাষ্ট্র একটি সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

এ্যাসিরীয় সম্রাট বিশ্বাস করতেন তিনি দেবতা অসুরের প্রতিনিধি। সব কিছুর ওপর তাঁর কর্তৃত্ব। প্রতিবেশী রাষ্ট্র দখলের ফলে ক্রমে এ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের সীমারেখা অনেক বেড়ে যায়। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যকে কতগুলো প্রদেশে ভাগ করা হয়। এ্যাসিরীয় সমাজ কাঠামো ব্যবিলনীয় সমাজের মতোই ছিল। এ্যাসিরীয়দের অর্থনীতির মূল উৎস ছিল বিভিন্ন দেশ থেকে লুণ্ঠন করে আনা ধনসম্পদ। অল্প বিস্তর বাণিজ্যও তারা করত।

**ধর্ম**

ধর্মীয় ক্ষেত্রে এ্যাসিরীয়রা ব্যাবিলনীয়দের অনুসরণ করে। তারা বহু দেব-দেবতায় বিশ্বাস ও তাদের পূজা করত। তবে তাদের প্রধান দেবতা ছিল আসুর। এরপর ছিল ইশতারের স্থান। রাজা দেবতা আসুরের নামে রাজ্য শাসন করতেন। তারা কুসংস্কার ও তন্ত্র-মন্ত্রে বেশি বিশ্বাসী ছিল।

### ৫.২ সভ্যতায় এ্যাসিরীয়দের অবদান

সভ্যতার ইতিহাসে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এ্যাসিরীয়দের অবদান লক্ষ্য করা যায়—

**সামরিক ক্ষেত্রে**

সামরিক ক্ষেত্রে এ্যাসিরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভূমিকা ছিল। তারা সর্বপ্রথম লোহার অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী গঠন করে ও যুদ্ধ রথের ব্যবহার করে। সে যুগের বিচারে তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল বেশ আধুনিক। বহু নতুন নতুন অস্ত্র, যুদ্ধ কৌশল আবিষ্কারের কারণে প্রতিবেশীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। সামরিক প্রয়োজনে শক্তিশালি গুপ্তচর ও যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

**ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প**

ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পে এ্যাসিরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। বিভিন্ন রাজার সময় রাজধানী পরিবর্তনের ফলে এ্যাসিরীয় স্থাপত্যগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। তাদের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কর্ম হচ্ছে- মন্দির, সুরম্য প্রাসাদ ও দুর্গ। উল্লেখ্য যে সামরিক প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েই তারা তাদের স্থাপত্য কর্ম সম্পাদন করত। আর ভাস্কর্যে এ্যাসিরীয়দের অগ্রগতি ছিল স্থাপত্যের চেয়ে অধিক। ভাস্কর্যের বিষয় ছিল বৈচিত্র্যময়। যেমন- শত্রু নগরী ধ্বংস, যুদ্ধ বিজয়, যুদ্ধ যাত্রা, সম্রাটের সিংহ শিকার প্রভৃতি। ভাস্কর্যগুলো চুনাপাথর দিয়ে তৈরি ছিল এবং চিত্রিত ছিল বিভিন্ন রঙের যেমন- সাদা, নীল, লাল ও সবুজ। এছাড়াও তাদের ব্রোঞ্জের তৈরি অনেক ভাস্কর্য পাওয়া যায়। সর্বোপরি এ্যাসিরীয়রা পাথর দিয়ে ঘর-বাড়ি নির্মাণ ও তৈজসপত্র তৈরিতে দক্ষ ছিল।

**জ্ঞান-বিজ্ঞানে**

জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। সম্রাট আশুরবনিপালের গড়া একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার পাওয়া গেছে রাজধানী নিম্পরে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ্যাসিরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তারাই প্রথম বৃত্তকে ৩৬০° তে ভাগ করে। পৃথিবীকে

সর্বপ্রথম তারা অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করেছিল। চিকিৎসাবিদ্যায় এ্যাসিরীয়দের ভূমিকা ছিল অসামান্য। তারা পাঁচশ'রও বেশি উদ্ভিদ ও খনিজ ওষুধের তালিকা প্রণয়ন করে সেগুলোর গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে।

**৫.৩ এ্যাসিরীয়দের পতন**

মানব সভ্যতার ইতিহাসে কোন সভ্যতাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি। বিকাশের এক পর্যায়ে এসে তার পতন ঘটেছে। এ্যাসিরীয়দের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। উত্তরসূরি শাসকদের বিভিন্ন দুর্বলতা এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর আক্রমণের মুখে তিন'শ বছরের এই প্রাচীন সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব ৬১২ অব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৫

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. এ্যাসিরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- ব্যাবিলনে/টাইগ্রিস নদীর তীরে/সিন্ধু নদীর তীরে।
২. প্রথম দিকে এ্যাসিরীয়দের পেশা ছিল- কৃষিকাজ ও পশু পালন/যুদ্ধ-বিগ্রহ/ লুটতরাজ।
৩. পরবর্তী সময়ে এ্যাসিরীয়দের পরিচয় ঘটে- সামরিক রাষ্ট্র হিসেবে/যোদ্ধা জাতি হিসেবে/লুটেরা জাতি হিসেবে।
৪. এ্যাসিরীদের দেবতার নাম- দেবতা শশাঙ্ক/দেবতা আসুর/দেবতা হিমাঙ্ক।
৫. এ্যাসিরীয়দের অর্থনীতির মূল উৎস ছিল- লুট করে আনা ধন-সম্পদ/পশুপালন ও কৃষিকাজ/ব্যবসা-বাণিজ্য।
৬. সর্বপ্রথম লোহার অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী গঠন করে- ব্যাবিলনীয়রা/গ্রিকরা/এ্যাসিরীয়রা।
৭. চিকিৎসাবিদ্যায় এ্যাসিরীয়দের অবদানের মধ্যে ছিল- পাঁচশরও বেশি উদ্ভিদ ও খনিজ ওষুধের তালিকা তৈরি/হাজারের ও বেশি ওষুধের আবিষ্কার।

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. এ্যাসিরীয় সভ্যতার পরিচয় দিন।
২. সভ্যতায় এ্যাসিরীয়দের অবদান উল্লেখ করুন।

## পাঠ-৬ : ক্যালডীয় সভ্যতা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি -**

☞ ক্যালডীয় সভ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন।

☞ সভ্যতায় ক্যালডীয়দের অবদান উল্লেখ করতে পারবেন।

### ৬.১ ক্যালডীয়দের পরিচয়

৬১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এ্যাসিরীয়দের পতন এবং ক্যালডীয়দের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মেসোপটেমীয় সভ্যতা চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত হয়। মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় বসবাসকারী সেমিটিক জাতিভুক্ত ক্যালডীয়রা এ সভ্যতা গড়ে তোলে বলে ইতিহাসে এটি ক্যালডীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। এ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নেবোপালেসার এ্যাসিরীয়দের সমৃদ্ধ রাজধানী নিনেভা ধ্বংস করে পুনরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে রাজধানী ও তাদের সভ্যতা গড়ে তোলে বলে এ সভ্যতা নতুন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা নামেও পরিচিত। এ সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন সম্রাট নেবুচাঁদ নেজার। তাঁর রাজত্বকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৬০৪ থেকে ৫৬১ অব্দ পর্যন্ত। হাম্মুরাবির পর থেকে প্রায় এক হাজার বছরব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ আর হানাহানিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল মেসোপটেমিয়া। নেবুচাঁদ নেজারের হাতে ব্যাবিলন আবার শক্তি ফিরে পায়। সিরিয়া অধিকার করে রাখা মিশরীয়দের তিনি তাড়িয়ে দেন। নেবুচাঁদ নেজার খুব কঠোর শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় তিনি জেরুজালেম নগরী খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে ধ্বংস করে দেন এবং ইহুদি অধিবাসীদের বন্দি করে খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ অব্দ পর্যন্ত ব্যাবিলনে আটকে রাখেন। ইতিহাসে এর নাম 'ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা'। খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ অব্দে ক্যালডীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে পারস্য সম্রাট কাইরাস ক্যালডীয়দের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

### ৬.২ সভ্যতায় ক্যালডীয়দের অবদান

সভ্যতার ইতিহাসে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ক্যালডীয়দের অবদান লক্ষ্য করা যায়। তাদের সভ্যতার বিভিন্ন দিক নিম্নরূপ :

**ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান নির্মাণ**

ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি হাম্মুরাবির সংস্কৃতি অনেকটাই গ্রহণ করেছিল ক্যালডীয়রা। সেই সাথে নিজেদের বুদ্ধিমত্তার সংযোগ তাদেরকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ক্যালডীয় সম্রাট নেবুচাঁদ নেজারের সময় ব্যাবিলন শহর খুব জাঁকজমকপূর্ণ হয়। পুরো শহর ঘিরে ৫৬ মাইল লম্বা দেয়াল তৈরি হয়। চার ঘোড়ার রথ চলতে পারে এমন চওড়া ছিল রাস্তা। শহরের মাঝখানে ছিল প্রকাণ্ড তোরণ। দেবী ইস্টারের স্মরণে তৈরি এই তোরণের নাম রাখা হয় 'ইস্টার তোরণ' বা 'ইস্টার গেট'। তোরণের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া লম্বা রাস্তাটির নাম ছিল 'মিছিল সড়ক'। সম্রাট নেবুচাঁদ নেজারের রানি বাগান করতে খুব পছন্দ করতেন। তাঁরই উৎসাহে সম্রাট নগর দেয়ালের উপরে তৈরি করলেন আশ্চার্য সুন্দর এক বাগান। ইতিহাসে যা 'শূন্য উদ্যান' নামে পরিচিত। ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি।

**ধর্মীয় বিশ্বাস**

ক্যালডীয়রা আকাশের বিভিন্ন গ্রহকে দেবতা ভাবত। বৃহস্পতি বা জুপিটার গ্রহ ছিল প্রধান দেবতা। তাকে তারা মারডক নাম দেয়। তারা ভাগ্যে বিশ্বাসী ছিল। ব্যাবিলন শহরে বেশ কিছু ধর্মমন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ধর্মে নৈতিকতার কোন স্থান ছিল না।

**জ্যোতির্বিদ্যায় তাদের অবদান**

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষত জ্যোতির্বিদ্যায় তাদের যথেষ্ট অবদান লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় কারণে তারা গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে অনেক গবেষণা করেছে। তাই জ্যোতির্বিদ্যায় তারা হয়ে উঠেছিল দক্ষ। ক্যালডীয়রাই প্রথম সপ্তাহকে সাত দিনে বিভক্ত করে। আবার প্রতিদিনকে ১২ জোড়া ঘণ্টায় ভাগ করার পদ্ধতি বের করে। বছরের দৈর্ঘ্যও তারা বের করে। এ যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ ১২টি নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পান। তা থেকে ১২টি রাশিচক্রের সৃষ্টি হয়।

অতএব, ক্যালডীয় সভ্যতার ইতিহাস হতে আমরা বুঝতে পারি, আধুনিক সভ্যতায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৬

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**শূন্যস্থান পূরণ করুন :**

ক্যালডীয় সভ্যতা —— সভ্যতার মধ্যে অন্যতম। এরা —— শহরকে কেন্দ্র করে মেসোপটেমিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তার ঘটায়। ব্যাবিলন শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠায় ক্যালডীয় সভ্যতা ইতিহাসে —— —— সভ্যতা হিসেবেও পরিচিত। সম্রাট —— গড়ে তুলেছিলেন এ সভ্যতা। সম্রাট নেবুচাঁদ নেজারের রাজত্বকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৬০৪ থেকে ৫৬১ অব্দ পর্যন্ত। হাম্মুরাবির পর থেকে প্রায় —— বছরব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ আর হানাহানিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল মেসোপটেমিয়া। নেবুচাঁদ নেজারের হাতে ব্যাবিলন আবার শক্তি ফিরে পায়। সিরিয়া অধিকার করে রাখা —— তিনি তাড়িয়ে দেন। নেবুচাঁদ নেজার খুব কঠোর শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় তিনি —— নগরী খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে ধ্বংস করে দেন এবং —— —— —— করে খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ অব্দ পর্যন্ত ব্যাবিলনে আটকে রাখেন। ইতিহাসে এর নাম 'ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা'।

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. ক্যালডীয় সভ্যতার পরিচয় দিন।

২. সভ্যতায় ক্যালডীয়দের অবদান উল্লেখ করুন।

## পাঠ-৭ : সিন্ধু সভ্যতা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ সিন্ধু সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল বলতে পারবেন।

☞ সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গনে তাদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

### ৭.১ অবস্থান ও সময়কাল

বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছে বিশাল সিন্ধু নদ। সিন্ধ নদ দক্ষিণে আরব সাগরে পতিত হয়েছে। সিন্ধু নদের উত্তর-পূর্বে পাঞ্জাবে ছিল হরপ্পা নগরীর অবস্থান। আর দক্ষিণে লারকানা জেলায় ছিল মহেঞ্জোদারো নগরী। সিন্ধু নদের পানিতে তৈরি এ বিশাল উর্বর ভূমিতে গড়ে উঠেছিল যে সভ্যতা, তাকে বলা হয় সিন্ধু সভ্যতা। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার জন মার্শালের মতে- প্রাচীন এ সভ্যতাটি খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫০ থেকে ২৭৫০ অব্দের মধ্যে পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবে সিন্ধু নদের উপনদী রাভীর তীর ঘেঁষে প্রাচীন হরপ্পা নগরী এবং লারকানা জেলায় মূল সিন্ধুর তীরে এক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে মহেঞ্জোদারো নগরীটির অবস্থান ছিল। আর হরপ্পা নগরের সমতল ভূমির পরিমাণ ছিল আড়াই মাইল।

তবে সিন্ধু সভ্যতার সঠিক সময়কাল এবং কারা এ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত সিলমোহর ও অন্যান্য নিদর্শন থেকে ধারণা করা হয় যে, এ সভ্যতার আদিবাসীরা লিখতে ও পড়তে জানত। কিন্তু এ লেখাগুলো থেকে এখন পর্যন্ত কোন তথ্য ও পাঠোদ্ধার করা যায় নি। এদের সিল ও মাটির পাত্রের সাথে মেসোপটেমীয় দ্রব্যের মিল দেখে এ সভ্যতার আনুমানিক সময়কাল নির্ণয় করা হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, দ্রাবিড় জাতি-এ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

### ৭.২ সিন্ধু সভ্যতার অবদান

**নগর পরিকল্পনা**

সভ্যতার ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতা একটি পরিকল্পিত নগরীর ধারণা দিয়েছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরী দুটো প্রায় একই পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে উঠেছিল। এখানে নগরবাসীদের সকল সুবিধা দেয়া হয়েছিল। যেমন- রাস্তাঘাট, সরবরাহকৃত পানি, ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, স্নানাগারের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, ময়লা ফেলার জন্য ডাস্টবিন, শহরে বাতি দ্বারা আলোকিত করা প্রভৃতি। নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য মোতায়েন করা প্রভৃতি। সিন্ধু সভ্যতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতা আধুনিক সভ্যতার মতো উন্নত ছিল।

**পরিমাপ পদ্ধতি**

ওজন করার জন্য পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবন করা ছিল সিন্ধু সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তারা ওজন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বাটখারা ব্যবহার করত। আর কোন কিছুর দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য ব্যবহার করত স্কেল।

**স্থাপত্য ও ভাস্কর্য**

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মতো সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। চমৎকার সব স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে সিন্ধু সভ্যতায়। তাদের ঘরবাড়িগুলো দেখলে সহজে বুঝা যায়- নগরবাসীরা বিলাসী ছিল। মহেঞ্জোদারোর স্থাপত্যের চমৎকার উদাহরণ হলো 'বৃহৎ হল।' ৮০ ফুট জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছিল এ ঘরটি। ঘরে ছিল সারি বাঁধা বেঞ্চ আর সামনে মঞ্চ। এটি একটি সভাগৃহ ছিল বলে ধারণা করা হয়। হরপ্পাতে ১৬৯×১৩৫ ফুটের একটা প্রকাণ্ড গুদামঘর পাওয়া গেছে।

পাথর ও ব্রোঞ্জের প্রচুর ভাস্কর্য পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতায়। সেখানে বিভিন্ন মানুষের ও পশুর নিখুঁত এমন মূর্তি পাওয়া গেছে যাতে তাদের দক্ষতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে প্রায় ২৫০০ সিল। পাথরের তৈরি এ সিলগুলোর অধিকাংশই ছিল চারকোণা। সিলগুলোতে বিভিন্ন চিহ্ন- ষাঁড়, মহিষ প্রভৃতি পশুর প্রতিকৃতি ছিল। এগুলো এক ধরনের চিত্রলিপি বলে মনে করা হয়। বাণিজ্য ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এ সমস্ত সিল ব্যবহার করা হতো।

**শিল্পজাত দ্রব্য**

সিন্ধু সভ্যতায় বেশ কিছু শিল্পজাত দ্রব্য পাওয়া গেছে। এখানে বিভিন্ন প্রকার খেলনা তৈরি হতো। গোলাকার বিভিন্ন মাটির পাত্রে ফুটিয়ে তোলা হতো বিভিন্ন নকশা। মাটি ছাড়া সিন্ধু সভ্যতার কারিগররা রুপা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতির দ্বারা তৈজসপত্র তৈরি করত। স্বর্ণ শিল্পীরা বিভিন্ন আকৃতির অলংকার তৈরি করতে ছিল দক্ষ। তারা সোনা, রুপা, তামা, ইলেকট্রোন ও ব্রোঞ্জ দ্বারা আংটি, বালা, নাকফুল, গলার হার, কানের দুল, বাজুবন্দ প্রভৃতি অলংকার তৈরি করত।

**সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস**

সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয় ২৭০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে, এ সময় প্রলয়ঙ্করী বন্যা হয়। বন্যায় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরী তলিয়ে যায়। প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে ধারণা করা হয় যে, ক্রমাগত বন্যায় নগর দুটি ধীরে ধীরে মাটির নিচে হারিয়ে যায়।

**সার-সংক্ষেপ**

সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে প্রধানত দুটো অঞ্চলে-পাঞ্জাবের হরপ্পায় এবং সিন্ধুর মহেঞ্জোদারোতে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এ এলাকায় জনগোষ্ঠী গ্রামীণ জীবন ত্যাগ করে সুপরিকল্পিত নগরের পত্তন ঘটিয়েছিল। আধুনিক সভ্যতায় সিন্ধু সভ্যতার অনেক অবদান রয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৭

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**এক কথায় উত্তর দিন :**

১. সিন্ধু নদের উত্তর-পূর্বে পাঞ্জাবে কোন প্রাচীন নগরীর অবস্থান ছিল?
২. মহেঞ্জোদারো নগরী কোন জেলায় গড়ে উঠেছিল?
৩. স্যার জন মার্শালের মতে, সিন্ধু সভ্যতাটি কখন পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছিল?
৪. হরপ্পা নগরটি সিন্ধুর কোন উপনদীর তীরে গড়ে উঠেছিল?
৫. দ্রাবিড় জাতি কোন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল?
৬. প্রাচীন কোন সভ্যতাকে আধুনিক সভ্যতার মতো উন্নত বলে মনে করা হয়?
৭. সিন্ধু সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান লিখুন।
৮. হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে কতটি সিল পাওয়া গেছে?
৯. কিভাবে, কখন সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়?

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. সিন্ধু সভ্যতার অবস্থান ও সময়কালের বিবরণ দিন।
২. সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা কেমন ছিল?
৩. সিন্ধু সভ্যতার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বর্ণনা দিন।
৪. সিন্ধু সভ্যতার অবদান উল্লেখ করুন।
৫. সিন্ধু সভ্যতায় কি কি শিল্পজাত দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে?

## পাঠ-৮ ঃ ফিনিশীয় সভ্যতা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি -**

☞ ফিনিশীয়দের অবস্থান ও পরিচয় বলতে পারবেন।

☞ সভ্যতায় ফিনিশীয়দের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

### ৮.১ অবস্থান ও পরিচয়

ভূমধ্যসাগর এবং লেবানন পর্বতের মাঝে একশত পঁচিশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং পনের কিলোমিটার প্রস্থ সম্বলিত একখণ্ড সরু উপকূল অঞ্চলে ফিনিশীয় নামের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি গড়ে উঠেছিল। ফিনিশীয় একটি সম্প্রদায়ের নাম। তাদের সামনে ছিল সাগর আর পিছনে ছিল পাহাড়। তাই বাইরের আক্রমণের তেমন ভয় ছিল না। কৃষিকাজ করার মতো কোন উর্বর ভূমি না থাকায় তাদের আয়ের একমাত্র উৎস ছিল বাণিজ্য। ফিনিশীয়রা ছিল শান্তিপ্রিয়। যুদ্ধ পছন্দ করত না বলে তারা সাম্রাজ্য গড়তে পারেনি। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে তাদের উত্থান হয়েছিল। নানা ঘটনা প্রবাহের পর ৩৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার টায়ার নগরী দখল করে একে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন। আর তখনই ফিনিশীয় সভ্যতার পতন ঘটে।

### ৮.২ সভ্যতায় ফিনিশীয়দের অবদান

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের পরিচয় শ্রেষ্ঠতম নাবিক ও জাহাজ নির্মাতা হিসেবে। তাদের মূল অবদানসমূহ জড়িয়ে আছে নৌ-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে। তাদের ছিল অনেকগুলো সমুদ্র বন্দর। তাদের বিখ্যাত দুটি বন্দর হলো - টায়ার ও সিডন। সভ্যতায় ফিনিশীয়দের অবদান নিম্নরূপ :

**নৌকা নির্মাণ**

লেবাননে ছিল সিডার গাছের বন। তাই গাছ কেটে নৌকা বানানো ছিল তাদের জন্য সহজ। ফিনিশীয় বণিকগণ জাহাজ নিয়ে ব্যবসার জন্য ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগড় পাড়ি দিত। তারা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে পোতাশ্রয়, বড় বড় জাহাজ ও বন্দর নির্মাণ করে। সমুদ্রপথে তারা ক্রীট, মাইসেনীয় ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ তৈরি করে ও সেখানে তাদের বাণিজ্যিক উপনিবেশ গড়ে ওঠে। ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সিডন, ঢায়ার আরাদুস ও বাই ব্রোসকে কেন্দ্র করে ফিনিশীয়রা মিশর, এশিয়া মাইনর, বলকান উপদ্বীপ, ইতালি ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম নাবিক ও জাহাজ নির্মাতা হিসেবে ফিনিশীয়দের খ্যাতি ছিল প্রচুর। মূলত ফিনিশীয়রাই প্রথম পৃথিবীর ইতিহাসে সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক সভ্যতা গড়ে তোলে।

**বাণিজ্য**

ফিনিশীয়দের উন্নতির মূলে ছিল নৌ-বাণিজ্য। ফিনিশীয়গণ বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। তারা স্পেন থেকে সোনা, রুপা ও টিন এনে তা বিভিন্ন দেশে বিক্রি করত। এ সমস্ত দেশ হতে সংগ্রহ করত হরেক রকম জিনিস। যেমন- কাচ, মাটির পাত্র, হাতির দাঁতের বাহারি চিরুনি, মণি-মুক্তা খচিত আসবাবপত্র, ব্রোঞ্জের বরকোশ, মূল্যবান পোশাক ইত্যাদি। এ সব আবার বিক্রি করা হতো পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোর ধনীদের নিকট।

**কারিগরি দক্ষতা**

ফিনিশীয়রা বাণিজ্যের পাশাপাশি কারিগরি ক্ষেত্রেও দক্ষতা অর্জন করেছিল। তারা মাটির পাত্র তৈরি করতে পারত। তারা দক্ষতার সাথে কাপড় তৈরি ও রং করতে পারত। নকশাকাটা ধাতবদ্রব্যও তৈরি করত ফিনিশীয়রা। গ্রিক কবি হোমারের লেখায় ফিনিশীয়দের তৈরি পোশাক ও সোনার অলংকারের কথা রয়েছে। হিব্রুদের গ্রন্থে রয়েছে ফিনিশীয়দের সোনা, রুপা, লোহা ও কাঠের দ্রব্যের কথা। এ্যাসিরীয়দের রাজপ্রাসাদের আসবাবপত্র তৈরি করে দিয়েছিল ফিনিশীয় কারিগররা। তারা জেরুজালেমে তৈরি করেছিল মন্দির।

**সাংস্কৃতিক জগতে অবদান**

ফিনিশীয় নাবিকরা রাতে তারা দেখে জাহাজ চালাত। ধ্রুবতারা দেখে তারা দিক নির্ণয় করত। এ কারণে ধ্রুবতারাকে অনেকে ফিনিশীয় তারা বলে থাকে। সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের বড় অবদান হলো- বর্ণমালার উদ্ভাবন। তারা ২২টি ব্যঞ্জনবর্ণের উদ্ভাবন করে। আধুনিক বর্ণমালার সূচনা এখান থেকে। ফিনিশীয়দের উদ্ভাবিত বর্ণমালার সাথে পরবর্তীতে গ্রিকরা স্বরবর্ণ যোগ করে বর্ণমালাকে পূর্ণতা দান করে। এছাড়া গ্রিকরা ফিনিশীয়দের কাছ থেকে কলম, কালি ও কাগজের ব্যবহার শেখে।

**সার-সংক্ষেপ**

আধুনিক সভ্যতা ফিনিশীয় সভ্যতার কাছে বহুদিক দিয়ে ঋণী। কেননা বর্ণমালা সৃষ্টির মাধ্যমে তারা শিক্ষার পথকে সুগম করেছিল যা পরবর্তী সভ্যতাকে কয়েক ধাপ অগ্রসর করে দিয়েছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নৌ-বাণিজ্য শক্তি হিসেবে ফিনিশীয় সভ্যতার উত্থান। বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে এবং সমুদ্র বন্দরকে কেন্দ্র করে এরা গোটা ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে তোলে। কারিগরি দক্ষতা ও আধুনিক বর্ণমালা প্রতিষ্ঠার জন্য এ সভ্যতা স্মরণীয় হয়ে আছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৮

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন :**

১. ভূমধ্যসাগর এবং —— পর্বতের মাঝে একশত পঁচিশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং পনের কিলোমিটার প্রস্থ সম্বলিত একখণ্ড সরু উপকূল অঞ্চলে —— নামের রাষ্ট্রটি গড়ে উঠেছিল।

২. ফিনিশীয় একটি —— নাম।

৩. প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের পরিচয় শ্রেষ্ঠতম —— ও —— নির্মাতা হিসেবে।

৪. ফিনিশীয়দের দুটি বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর হলো টায়ার ও ——।

৫. ফিনিশীয়দের উন্নতির মূলে ছিল ——।

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. ফিনিশীয়দের পরিচয় ও অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা দিন।

২. সভ্যতায় ফিনিশীয়দের অবদান নিরূপণ করুন।

৩. নৌ-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক জগতে ফিনিশীয়দের অবদান মূল্যায়ন করুন।

## পাঠ-৯ : পারস্য সভ্যতা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ পারস্য সভ্যতার পরিচয় ও সময়কাল বলতে পারবেন।
☞ পারস্য সভ্যতার অবদান নির্ণয় করতে পারবেন।

### ৯.১ পারস্য সভ্যতার পরিচয় ও সময়কাল

আজকের ইরান দেশটি প্রাচীনকালে পারস্য নামে পরিচিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৯ অব্দ থেকে ৩০০ অব্দের মধ্যে এখানে গড়ে উঠেছিল এক উন্নত সভ্যতা। এ সভ্যতার অধিবাসীরা সামরিক শক্তিতে খ্যাতিমান ছিল। আর তাই একটি রাজ্য ক্রমে সাম্রাজ্যে পরিণত হয়ে পড়ে। সভ্যতার ইতিহাসে দুটি ক্ষেত্রে পারসীয়দের অবদান ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি সুষ্ঠু ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দ্বিতীয় ধর্মীয় ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারণা নিয়ে আসা।

### ৯.২ সভ্যতায় পারসীয়দের অবদান

বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারসীয়রা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পরবর্তী কয়েকটি সভ্যতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। সভ্যতায় পারসীয়দের অবদান নিম্নে তুলে ধরা হলো :

**পারস্য প্রশাসন**

সুন্দরভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করার জন্য সম্রাট দারিয়ুস একটি দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। শক্তভাবে সাম্রাজ্য শাসনের জন্য সম্রাটের হাতে রাখা হয় অনেক ক্ষমতা। তিনি একাধারে সামরিক, বেসামরিক ও বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন। সম্রাট দারিয়ুস সুন্দরভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য পুরো সাম্রাজ্যকে চার ভাগে বিভক্ত করে চারটা রাজধানী গড়ে তোলেন। এগুলো হলো- সুসা, একবাটানা, ব্যাবিলন ও পার্সেপলিস। এছাড়া পারস্য সাম্রাজ্যকে ২১টি প্রদেশে ভাগ করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগের জন্য তৈরি করা হয় রাস্তাঘাট। দারিয়ুসের সময় একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীও গঠিত হয়।

**বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান**

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারসীয়দের বিরাট অবদান রয়েছে। সম্রাট দারিয়ুস চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। মিশরীয় চিকিৎসা বিদ্যালয়কে তিনি সংস্কার করেন। জ্যোতির্বিদ্যার উন্নয়নেরও সম্রাটের দৃষ্টি ছিল। বিখ্যাত ক্যালডীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী 'নেবুরিমানু'কে তিনি সব ধরনের সহযোগিতা দেন। এছাড়া ক্যালডীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী 'কিদিনু'ও পারস্য সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সম্রাট দারিয়ুস ১২ মাসে বছর ও ৩০ দিনে মাস গণনার রীতি চালু করে পারসীয় দিনপঞ্জি তৈরি করেন।

**লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার**

পারসীয়গণ দুটি ভাষায় লিখতে জানত। একটি হলো এ্যাসিরীয় আর অন্যটি প্রাচীন পারসীয়। প্রথম দিকে পারসীয়রা এ্যাসিরীয় কিউনিফর্ম লিপিতেই লিখত। এরা ৩৯টি কিউনিফর্ম চিহ্ন ব্যবহার করত। ধীরে ধীরে পারসীয়দের একটি নিজস্ব লিখন রীতি তৈরি হয়।

**শিল্পকলা**

পারসীয়রা শিল্পকলার ক্ষেত্রে খুব বেশি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় নি। তবে 'পাসারগাদিয়া' ও 'পার্সেপালিসে' সম্রাট কাইরাস ও দারিয়ুস এর প্রাসাদ স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার প্রমাণ বহন করছে। প্রাসাদের ছাদ ছিল কাঠের তৈরি। উজ্জ্বল রঙের ইট দিয়ে দেয়াল সাজানো হয়েছিল। রাজা ও ভৃত্যের ছবি আঁকা হতো দেয়ালে। পারস্য স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হলো পিরামিডের আকৃতিতে তৈরি সম্রাট কাইরাসের সমাধি।

**ধর্মের ক্ষেত্রে ভূমিকা**

পারসীয়রা ধর্মের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রাচীনকালে পারসীয়রা সূর্য, বৃষ্টি, বাতাস, আকাশ, মাটি ও আগুনের পূজা করত। ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ধর্মের কর্তৃত্ব পুরোহিতদের হাতে চলে গেলে তারা প্রাকৃতিক বিষয়ের বদলে বিভিন্ন পশু-পাখিকে দেবতার মর্যাদার আসনে বসায়। ধীরে ধীরে ধর্মে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। জরথুষ্ট্র নামক একজন ধার্মিক ও দার্শনিক পারসীয়দের নতুন ধর্মের সন্ধান দেন। কথিত আছে, নির্জন পাহাড়ে ধ্যানমগ্ন জরথুষ্ট্রের নিকট স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ আসে। তিনি মানুষের মাঝে ফিরে গিয়ে তা প্রচার করতে থাকেন। তার প্রচারিত এ ধর্মকে বলা হয় জরথুষ্ট্রবাদ।

জরথুষ্ট্রবাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে 'জেন্দআবেস্তা'। জরথুষ্ট্রবাদের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মধ্যে প্রচলিত বহু দেবতা ও যাদুবিদ্যার অবসান এবং ধর্মে নৈতিকতা ও দার্শনিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। এ ধর্ম মতে আহুরমাজদা হলো মঙ্গলের দেবতা। আর আহরিমান হলো অমঙ্গলের দেবতা। উভয়ের মধ্যে বিরামহীন সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত আহুরমাজদার জয় হবে। এ ধর্ম মতে পরকালের ধারণা ছিল। সর্বোপরি এটিকে ঐশী ধর্ম মনে করা হতো। তার জীবনধারা, মতবাদ ও ধর্মদর্শন পরবর্তীতে ফিলিস্তিন, আরব ও এশিয়া মাইনরের জনগণকে প্রভাবিত করে।

**সার-সংক্ষেপ**

পারসীয়দের সভ্যতা আধুনিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠায় বিরাট অবদান রেখেছে। তাদের অবদান বিশ্ব সভ্যতাকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করেছে। বর্তমান ইরান বা পারস্যকে কেন্দ্র করে এবং আরব মরুভূমির উত্তরাংশ থেকে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের উত্তর ভূমি পর্যন্ত ছিল এই বিশাল পারস্য সভ্যতা। পারস্য সভ্যতার রাজারা সকলেই সামরিক প্রতিভা ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তারা সু-শৃঙ্খল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা ও লিখন পদ্ধতিতে পারস্য সভ্যতার অবদান অবিস্মরণীয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৯

### ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

**মিল করুন**

| | |
|---|---|
| ১. আজকের ইরান দেশটির প্রাচীন নাম —— | ১. দক্ষ প্রশাসন ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নতুন ধারণা। |
| ২. পারস্যবাসীরা —— | ২. সম্রাট দারিয়ুস। |
| ৩. পারসীদের দু'টো ক্ষেত্রে অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ তা হলো —— | ৩. জরথুষ্ট্র। |
| ৪. পারসীয় দিনপঞ্জি তৈরি করেন —— | ৪. সামরিক শক্তিতে খ্যাতিমান ছিল। |
| ৫. পারসীয়দের নতুন ধর্মের সন্ধান দেন —— | ৫. পারস্য। |

### খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পারস্য সভ্যতার পরিচয় দিন।
২. সভ্যতায় পারসীয়দের অবদান নিরূপণ করুন।
৩. সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনায় পারসীয়দের অবদান কি ছিল?
৪. লিখন পদ্ধতি ও বিজ্ঞানে পারসীয়দের কি অবদান আছে?
৫. 'জরথুষ্ট্রবাদ' কোথায়, কিভাবে বিকাশ লাভ করে?

## পাঠ-১০ : হিব্রু সভ্যতা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ হিব্রু সভ্যতার পরিচয় বলতে পারবেন।

☞ ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিব্রুদের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

### ১০.১ হিব্রুদের পরিচয়

বর্তমান প্যালেস্টাইন অঞ্চল ঘিরে প্রাচীনকালে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেটি হিব্রু সভ্যতা নামে পরিচিত। হিব্রু সভ্যতার মূল অবদান হলো ধর্মীয় ক্ষেত্রে। খ্রিস্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম সমগ্র বিশ্বজুড়ে এক ঈশ্বরের আরাধনার যে কথা প্রচার করেছে তার প্রথম সূচনা ঘটিয়েছে হিব্রুরা।

প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম নগরীকে কেন্দ্র করে হিব্রু সভ্যতার বিকাশ ঘটে। প্যালেস্টাইনের পূর্বদিকে রয়েছে জর্ডান, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, উত্তরে লেবানন ও দক্ষিণে সৌদি আরব। হিব্রুদের উৎপত্তির ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। তারা নৃতাত্ত্বিকভাবে একটি নতুন জাতি নয়। হিব্রুদের নামের উৎপত্তি সম্পর্কেও সন্দেহ রয়েছে। জানা যায় যে হিব্রুদের শত্রু তাদের 'খাবিরু' অথবা 'হাবিরু' বলে অভিহিত করত। সম্ভবত এই নামটি অপভ্রংশ হয়ে হিব্রু হয়েছে। মনে করা হয় যে হিব্রুগণ ছিল অভিবাসী বা যাযাবর জনসাধারণ, যাদের আদি বাসভূমি ছিল আরবের মরুভূমি এবং বর্তমান ইসরাইলের অধিবাসীগণ হলো হিব্রুদের বংশধর। খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) নেতৃত্বে হিব্রুগণ উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ায় বসতি গড়ে তোলে। এর পর ইবরাহীমের ছেলে ইয়াকুব হিব্রুদের নিয়ে প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করেন। এখানে হিব্রুদের জীবনে নেমে আসে গাঢ় অন্ধকার। প্যালেস্টাইনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অনেক হিব্রু চলে যায় মিশরে। কিন্তু মিশরের ফারাও হিব্রুদের বন্দি করে এবং দাসদের মতো জীবন যাপনে বাধ্য করে। হিব্রুগণ এভাবে অনেক দিন ক্রীতদাসের মতো জীবন ধারণে বাধ্য হয়। এই দুঃখ ও যন্ত্রণার দিনে হিব্রুদের নতুন নেতা হযরত মুসা (আ) এর আবির্ভাব হয়। যিনি হিব্রুদের দাসত্ব হতে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিব্রুদের মিশর ত্যাগ করানো। অনেক প্রচেষ্টার পর মুসা (আ) ফারাও-এর অনুমতি পান এবং ১৩০০-১২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হিব্রুদের নিয়ে আসেন সিনাই অঞ্চলে। কিন্তু এখানেও হিব্রুগণ স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারেনি। এখানে ক্যানানবাসীদের আক্রমণের শিকার হয় হিব্রুরা। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা ক্যানান ভূমিতে কিছুটা অধিকার বিস্তার করতে সমর্থ হয়। কিন্তু এতে শেষ রক্ষা হলো না। দুর্ধর্ষ ফিলিস্তিনীগণের আক্রমণে হিব্রুরা তাদের অধিকৃত ভূমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। হিব্রুদের দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন ডেভিড বা হযরত দাউদ-এর নেতৃত্বে তারা পুনরায় সংগঠিত হয়। হযরত দাউদ জেরুজালেম নগরী গড়ে তোলেন এবং দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ফিলিস্তিনীগণ সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হলে প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া অঞ্চলে হিব্রুদের একটি নিজস্ব ও শক্তিশালী ভূখণ্ড গড়ে ওঠে। হযরত সুলায়মান (সলোমন) (আ) ছিলেন হিব্রুদের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক।

### ১০.২ ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিব্রুদের অবদান

হিব্রুরা তাদের অবদানের প্রায় পুরোটাই রেখেছিল ধর্মীয় ক্ষেত্রে। হিব্রু জাতি সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদের প্রচার করে। তাদের নবী হযরত মুসা (আ), হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সুলায়মান (আ) মানুষের ধর্মীয় চেতনায় নতুন আলোড়ন তোলে। তাদের ধর্মীয় চেতনা কতকগুলো পর্যায়ে পেরিয়ে চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছিল। নিম্নে পর্যায়গুলো আলোচনা করা হলো :

**মুসা (আ) এর আগমনের পূর্বস্তর**

হযরত মূসা (আ) এর আগমনের পূর্বে হিব্রুরা বিভিন্ন জড়বস্তু এবং প্রাকৃতিক বিষয়গুলোর পূজা করত। এ সময় যাদুবিদ্যা ও কুসংস্কারে চারদিক ছেয়ে গিয়েছিল। জড়বস্তুর পূজা করতে গিয়ে এক সময় দেহধারী দেবতার আবির্ভাব হয়। তারা দেবতার বিভিন্ন নামকরণ করে। দেবতাদের প্রধান ছিল 'ঈল'।

**নির্দিষ্ট দেবতার স্তর**

হিব্রুরা দ্বাদশ থেকে নবম খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত 'ইয়াহওয়েহ' নামক নির্দিষ্ট দেবতার পূজা করত। অবশ্য 'ইয়াহওয়েহ' জেহোবা নামেই বেশি পরিচিত ছিল। জেহোবা ছিলেন আইন প্রণেতা ও বিশ্বে নৈতিক আদর্শের স্রষ্টা। কিন্তু ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট দেবতার এই স্তরে বিকৃতি প্রবেশ করতে থাকে। এ কারণে দিনে দিনে হিব্রুদের এ ধর্মীয় ধারণায় কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে। ফলে হিব্রু নেতারা সতর্ক হয়ে পড়েন। তাঁরা ধর্মীয় চিন্তায় সংস্কারের পদক্ষেপ নেন।

**নবীদের আগমনের স্তর**

ধর্ম সংস্কারের যুগে আমস, হোসিয়া, ঈসা (আ) এবং মিকাহ প্রমুখ নবীদের আবির্ভাব ঘটে হিব্রুদের মাঝে। অষ্টম ও সপ্তম খ্রিস্টপূর্বাব্দে নবীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল হিব্রুদের উপর। তারা সর্বশক্তিমান একমাত্র আল্লাহর আরাধনা করার কথা প্রচার করেছিল।

**বিদেশী প্রভাবিত স্তর**

নবীদের যুগে হিব্রুধর্মের একটা নিজস্ব কাঠামো তৈরি হলেও তা বিদেশী প্রভাবে ধরে রাখা সম্ভব হয় নি। তখন নানা কারণে পুরোহিত বা যাজকদের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় হিব্রুদের জুগবাদ যাজকীয় ধর্মে রূপান্তরিত হয়।

**পারস্য প্রভাবের ফল**

পারসীয় সাম্রাজ্যের সংস্পর্শে এসে হিব্রুরা পর জীবনের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। শয়তান হয় অশুভ শক্তির প্রতীক। মৃত্যুর পর আবার জীবন ফিরে পাওয়া ও শেষ বিচারের দিন সম্পর্কিত ধারণা হিব্রু ধর্মে যোগ হতে থাকে।

বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে হিব্রু ধর্ম যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা পর্যালোচনা করে আমরা বলতে পারি, আধুনিক ধর্মীয় ধারণা সৃষ্টিতে হিব্রু ধর্মের বড় রকমের ভূমিকা রয়েছে।

**সার-সংক্ষেপ**

হিব্রু সভ্যতা আধুনিক প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বিশ্ব সভ্যতায় হিব্রুদের সবচাইতে বড় অবদান ছিল ধর্ম ক্ষেত্রে। প্রথমে হিব্রুরা প্রকৃতি পূজারি হলেও পরবর্তীতে এদের এখানে এক ঈশ্বর ধর্মের উদ্ভব হয়। হযরত মুসা (আ.) হিব্রুদের এক ঈশ্বরবাদের বাণী শোনান। পরবর্তীকালে নানা বিবর্তন এবং বিদেশী প্রভাব, প্রকৃতি পূজা, মূর্তি পূজা এবং নৈরাজ্যবাদ ধর্মে প্রবেশ করলেও বিভিন্ন নবীদের সংস্কার এবং হিব্রু ধর্ম পালনের নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে হিব্রু ধর্ম আবার ধর্মের মূল তত্ত্বে ফিরে আসে এবং ক্রমে তাদের ধর্ম আধুনিক একেশ্বরবাদে রূপান্তরিত হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.১০

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন :**

১. বর্তমান প্যালেস্টাইন অঞ্চল ঘিরে প্রাচীনকালে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেটি হলো হিব্রু সভ্যতা।
২. হিব্রু সভ্যতার মূল অবদান ছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।
৩. খ্রিস্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম সমগ্র বিশ্বজুড়ে এক ঈশ্বরের আরাধনার যে কথা প্রচার করছে, তার প্রথম সূচনা ঘটিয়েছে হিব্রুরা।
৪. খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে হযরত ইবরাহীমের (আ) নেতৃত্বে হিব্রুগণ উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ায় বসতি গড়ে তোলে।
৫. মিশরের ফারাও হিব্রুদের স্বাধীন জীবন যাপনের সুযোগ দেন।
৬. হিব্রুদের দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন ডেভিড বা হযরত দাউদ (আ) এর নেতৃত্বে তারা পুনরায় সংগঠিত হয়।
৭. হযরত ইবরাহীম (আ) জেরুজালেম নগরী গড়ে তোলেন।
৮. হযরত সুলায়মান (সলোমন) (আ) ছিলেন হিব্রুদের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক।

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. হিব্রুদের পরিচয় দিন।
২. ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিব্রুদের অবদান বিশ্লেষণ করুন।

# পাঠ-১১ : চীন সভ্যতা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ চীন সভ্যতার অবস্থান ও পরিচয় বলতে পারবেন।
☞ চীনের আদি মানুষ সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ শাং রাজাদের যুগের বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ চৌ রাজাদের যুগ সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।

## ১১.১ চীনা সভ্যতার অবস্থান ও পরিচয়

পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র চীন। মিশর, মেসোপটেমীয় এবং সিন্ধু সভ্যতার পরে চীনেও গড়ে উঠেছিল উন্নত সভ্যতা। চীনের তিনটি অঞ্চলে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা গড়ে ওঠে। প্রথমটি হোয়াং হো নদীর তীরে, দ্বিতীয়টি ইয়াং জে কিয়াং নদীর তীরে আর তৃতীয়টি দক্ষিণ চীনের ভূখণ্ডে। চীনের এই প্রাচীন সভ্যতা সৃষ্টি হয় শাং রাজাদের ও চৌ রাজাদের যুগে।

চীনের উত্তর দিকে গোবি মরুভূমি, পশ্চিমে তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চল এবং পূর্ব ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের অবস্থান ছিল। প্রাচীন চীনের নদীসমূহের প্রভাবে একদিকে এখানে যেমন কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল অন্যদিকে তেমনি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও যোগাযোগের পথ সহজ ও সুগম হয়েছিল, পাশাপাশি বহির্বাণিজ্যের পথও উন্মুক্ত হয়েছিল। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে এখানে সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল।

## ১১.২ চীনের আদি মানুষ

চীনা উপকথা অনুযায়ী প্রথম মানুষ হলো পান্‌কু। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। চীনে আদি মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৯২৯ সালে চীনের রাজধানী পিকিং এর নিকট (আধুনিক বেইজিং) আদিম মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে; যারা 'পিকিং মানুষ' নামে পরিচিত। এই তথ্য হতে মনে করা যায় যে, নবোপলীয় তথা নতুন পাথরের যুগে চীনে মানুষের বসবাস ছিল। অনুমান করা হয় যে, চীনবাসীরা হোয়াং-হো ও ইয়াংসি নদীর দুটি পাড়েই বসবাস করত। পরে তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এদের একটা অংশ চাষাবাদ করত এবং অন্য অংশটি যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াত। যারা চাষাবাদ করত, তারাই নদীর ধারে ঘরবাড়ি তৈরি করে সভ্য মানুষে পরিণত হয়। একই সাথে তারা পশুপালন করত। তারা মাটির তৈরি জিনিসপত্র, রেশমের কাপড়, চাকাযুক্ত গাড়ি, তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করতে জানত। চাষাবাদে তারা ব্যবহার করত লাঙ্গল, খাল কেটে নদী হতে পানি জমিতে সরবরাহ করত। চীনের আদি মানুষ নগর নির্মাণ করেছিল এবং নগরকে যাযাবরদের আক্রমণ হতে বাঁচানোর জন্য উঁচু দেয়াল তৈরি করেছিল। প্রাচীন চীনের লোকেরা এক প্রকার দিনপঞ্জি বা ক্যালেন্ডার তৈরি করেছিল।

## ১১.৩ শাং রাজাদের যুগ (১৭৬৬-১০২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

হোয়াংহো নদীর তীরে শাং রাজারা সভ্যতা গড়ে তোলেন। বেশ কয়েকটি রাজবংশ চীনে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরানো ছিল শাং বংশ। শাং যুগে ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র বেশি ব্যবহৃত হতো বলে এ সময়ের সংস্কৃতি ব্রোঞ্জ সংস্কৃতি নামে পরিচিত।

### সভ্যতায় শাং যুগের অবদান

সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাং যুগের মানুষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। নিম্নে তাদের অবদানের ক্ষেত্রগুলো আলোচনা করা হলো :

### অর্থনৈতিক কাঠামো ও বাসস্থান

শাং যুগে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। বেশি উৎপাদন হতো গম আর যব। কিছু কিছু জমিতে ধান চাষ হতো। শাং যুগের মানুষ ব্যাপকভাবে পশু পালনও করত। এ যুগের গ্রামের মানুষেরা মাটির ঘরে বাস করত। শহরের ঘরবাড়ি ছিল চমৎকার। ঘরগুলো হতো আয়তকার, ছাদগুলো ছিল ত্রিকোণ আকৃতির।

### ক্ষুদ্রশিল্প

বিভিন্ন সুন্দর জিনিস তৈরিতে শাং যুগের কারিগররা ছিল অত্যন্ত পারদর্শী। ব্রোঞ্জের তৈরি পাত্র, ছুরি ও কুঠার শাং যুগের বিশেষ আকর্ষণ। হাড়, ঝিনুক, শিং প্রভৃতি দিয়েও শাং কারিগরেরা অনেক দ্রব্য বানাতে পারত। এ যুগে হাতির দাঁতের দ্বারা বিলাসী দ্রব্যও তৈরি হতো। শাং যুগের রকমারি মাটির পাত্র ও বিখ্যাত চীনা মাটির পাত্রও পাওয়া গেছে। তীর, ধনুক, চাকাওয়ালা ঘোড়ার গাড়ি, যোদ্ধাদের জন্য তৈরি চামড়ার বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র ও বাদ্যযন্ত্রের মুখোশ প্রভৃতি তৈরিতে শাং কারিগররা ছিল দক্ষ।

**লিখন পদ্ধতি**

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল হতে চীন দেশ প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। তাই এখানে একেবারে ভিন্ন রীতিতে লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটে যার নাম আইডিও গ্রাফ। লেখার জন্য তৈরি হয় কালি আর তুলি। শাং লিপিকাররা রেশমি-কাপড়ের উপর লিখতেন। তাদের লিপিগুলো ছিল মোটামুটি চিত্রলিপিভিত্তিক।

**ধর্মীয় ক্ষেত্রে**

রাজকার্য পরিচালনা ছাড়াও ধর্মক্ষেত্রে শাং রাজারই প্রধান ছিলেন। তাদের নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। শাং যুগের মানুষরা মাটি, বাতাস, নদী, বিভিন্ন দিক (যেমন- পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর) ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা মনে করত। বৃষ্টি, শস্য ও শাংতি নামের যুদ্ধের দেবতাই প্রধান দেবতার ভূমিকায় ছিলেন। শাং তি নামের এই দেবতা চীনের ধর্মীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। মৃত রাজাকেও কখনও কখনও পূজা করা হতো। তাই রাজার সমাধি সৌধ বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা হতো।

**১১.৪ চৌ রাজাদের যুগ (১০২৭-২৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)**

শাং রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে চৌ-রাজ্য গড়ে উঠেছিল। শাংদের দুর্বলতার সুযোগে চৌ-রা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে এরা চীন সভ্যতার উপর আধিপত্য বিস্তার করে।

**সভ্যতায় চৌ যুগের অবদান**

শাং রাজাদের সাম্রাজ্যকে জয় করে চৌ রাজাগণ সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবদান রাখেন। তাদের অবদানগুলো নিম্নরূপ :

**অর্থনৈতিক**

চৌ জাতিরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার করেন। তাদের অর্থনীতির মূল উৎস কৃষি। এ যুগে কৃষিকাজে পশু ব্যবহার করা হতো। খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে এ সময় চীনে প্রচুর ধান উৎপন্ন হতো।

**বাণিজ্যিক**

চৌ জাতিরা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে অনেক বড় বড় শহর গড়ে তোলে। এ সময় চীনা বণিকরা বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারা গাধা ও উটের সাহায্যে মালামাল পরিবহন করত। শস্য, লবণ, রেশম ইত্যাদি দ্রব্য দেশের বাইরে রপ্তানি করা হতো।

**সামাজিক কাঠামো**

তখন সমাজ ছিল আভিজাতদের নিয়ন্ত্রণে। ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল ব্যবধান। সাধারণ কৃষক ও ভূমিদাসদের অবস্থান ছিল সমাজের সবচেয়ে নিচে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার থাকায় মেয়েদের তেমন কোন অধিকার ছিল না।

**ধর্মীয় ক্ষেত্রে**

চৌ যুগের লোকেরা বিভিন্ন দেবতার পূজা করত। তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল তিয়েন। মাটিকে মনে করত কৃষির দেবতা। চৌ যুগেও শাং যুগের মতো পূর্বপুরুষের পূজার প্রচলন ছিল। চৌ যুগে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে।

**সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবদান**

চৌ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। এ যুগের লেখা অনেক গ্রন্থ পাওয়া গেছে।

**চীনের প্রাচীর**

চৌ বংশের রাজা শি-হুয়াং তি-এর রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল 'চীনের মহাপ্রাচীর'। হূনদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এই প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল। দেড় হাজর মাইল দীর্ঘ এই প্রাচীরের উচ্চতা ছিল গড়ে ২৪ ফুট। এই প্রাচীরের উপর দিয়ে ৬ জন অশ্বারোহী পাশাপাশি চলতে পারত। চীনের প্রাচীর বিশ্বের আশ্চর্য বস্তুর একটি।

**দর্শনের ক্ষেত্রে অবদান**

চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন কনফুসিয়াস। তিনি চীনাদের মধ্যে আদর্শ জীবনের বাণী প্রচার করেন। খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দে তাঁর নৈতিক দর্শন ধর্মে রূপান্তরিত হয়। এছাড়া চীনের উল্লেখযোগ্য দার্শনিক লাওৎসে, জেনসিয়াস, মোতি।

**সার-সংক্ষেপ**

প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতার মধ্যে চীনা সভ্যতা ছিল অতুলনীয়। চীনা সভ্যতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। শাং এবং চৌদের আমলে চীনের সমাজ-অর্থনীতি-সভ্যতা ক্রমশ বিকাশ লাভ করতে থাকে। ধর্মক্ষেত্রে প্রথম দিকে প্রকৃতি পূজার প্রচলন থাকলেও পরবর্তীকালে কনফুসিয়াসের শিক্ষায় চীনের সামাজিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। কনফুসিয়াসের মতবাদের মূল দর্শন ছিল মানব কল্যাণ, যা শুধু চীনদেশ নয় বরং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে দ্রুত প্রচারিত হতে থাকে। এই অঞ্চলের মানুষ ক্রমশ ভদ্র আচরণ, সত্যকথন ও মানব কল্যাণকে জীবনের এবং সমাজের অপরিহার্য কর্ম হিসেবে গ্রহণ করে।

বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে চৈনিক সভ্যতার অবদান ছিল অপরিসীম। আর এ অপরিসীম অবদান বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে অগ্রগতির দিকে আন্দোলিত করেছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.১১

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তর কোনটি লিখুন :**

১. চীনের তিনটি অঞ্চলে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা গড়ে ওঠে, অঞ্চল তিনটি হলো–
   ক. হোয়াংহো নদীর তীরে  খ. ইয়াংজে কিয়াং নদীর তীরে
   গ. দক্ষিণ চীনে  ঘ. সবকয়টি ঠিক

২. চীনা উপকথা অনুযায়ী প্রথম মানুষ হলো–
   ক. আদিম মানুষ  খ. পান্‌কু
   গ. পিকিং মানুষ  ঘ. আধুনিক মানুষ

৩. শাং রাজারা কোন নদীর তীরে সভ্যতা গড়ে তোলে?
   ক. সিন্ধু  খ. ইয়াংসি
   গ. হোয়াংহো  ঘ. ভূমধ্যসাগর

৪. 'চীনের মহাপ্রাচীর' কোন রাজার আমলে নির্মিত হয়েছিল?
   ক. শাং রাজাদের  খ. পিকিং রাজাদের
   গ. হূন রাজাদের  ঘ. চৌবংশের রাজা শি-হুয়াং-তি এর

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. চীনা সভ্যতার পরিচয় দিন।
২. চীনের আদি মানুষ সম্বন্ধে বর্ণনা দিন।
৩. শাং রাজাদের যুগের বর্ণনা দিন।
৪. চৌ-রাজাদের যুগ সম্বন্ধে বিবরণ দিন।

## পাঠ-১২ : গ্রিক সভ্যতা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ গ্রিক সভ্যতার পরিচয় বলতে পারবেন।

☞ সভ্যতায় গ্রিসের অবদান উল্লেখ করতে পারবেন।

### ১২.১ পরিচয়

ইউরোপের দক্ষিণ দিকে অবস্থিতি বলকান উপদ্বীপ। এর দক্ষিণাংশে একটি ছোট পাহাড়ি দেশ গ্রিস। মূলত গ্রিস একটি পার্বত্যময় দ্বীপ রাষ্ট্র। এর তিনদিক এড্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর ও ঈজিয়ান সাগর দ্বারা বেষ্টিত। এ সভ্যতার মূল কেন্দ্র ছিল গ্রিক উপদ্বীপ এবং প্রধান শহর ছিল এথেন্স। ইউরোপ মহাদেশের এ অঞ্চলটিতেই প্রথম সভ্যতার উন্মেষ ঘটে।

আনুমানিক ১৩০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে গ্রিক সভ্যতার সূচনা হয় এবং খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও ৫ম অব্দে (শতকে) গ্রিক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তারা ৩৩৮ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। গ্রিসের পূর্ব নাম ছিল হেলাস। পরবর্তীকালে রোমানরা এ দেশের নামকরণ করেন গ্রিস। ইউরোপের আধুনিক সভ্যতা অনেকভাবে গ্রিক সভ্যতার নিকট ঋণী। তাই গ্রিক সভ্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে ইউরোপীয় সভ্যতা বোঝা যায় না।

গ্রিসের মহাকবি হোমার হাজার হাজার বছরের পুরানো কাহিনী নিয়ে রচনা করেছেন মহাকাব্য 'ইলিয়ড' আর 'ওডিসি'। এখানে রয়েছে প্রাচীন গ্রিসের উন্নত সংস্কৃতির অনেক চমকপ্রদ কথা। মানুষ এসব সম্বন্ধে অবগত হওয়ার পর অনুসন্ধান চালিয়ে আবিষ্কার করেছে গ্রিক সভ্যতার বিভিন্ন দিক।

গ্রিস সভ্যতা গড়ে উঠার আগেই ইজিয়ান অঞ্চলে গড়ে ওঠে এক উন্নত নগর সভ্যতা। ইজিয়ান সাগরের প্রশস্ত দ্বীপ ক্রীটকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে তার নাম দেওয়া হয় মিনীয় সংস্কৃতি। ক্রমে মিনীয় সংস্কৃতি প্রবেশ করে গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে।

### ১২.২ সভ্যতায় গ্রিসের অবদান

গ্রিক সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রেখেছে এথেন্স। আর এ সংস্কৃতি গ্রিক সংস্কৃতি নাম না নিয়ে বেশি পরিচিত হয়েছে হেলেনীয় নামে। নিম্নে প্রাচীন সভ্যতায় গ্রিকদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

**ধর্মীয় ক্ষেত্রে**

গ্রিকবাসীরা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করত। তারা বড় বড় যোদ্ধাদের পূজা করত। তাদের প্রধান দেবতা ছিলেন জিউস। দেবতা এপোলা ও দেবী এথেনাও ছিলেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের নির্দেশমতো পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। ধর্মমন্দিরে রাখা হতো দেবমূর্তি। উৎসবের সময় মূর্তির গায়ে পরান হতো পরিচ্ছন্ন কাপড়। নগর রাষ্ট্রের মানুষ ডেলোস দ্বীপে অবস্থিত ডিলফীর মন্দিরে রাখা এপোলো দেবতার পূজা করত।

**দর্শনে অবদান**

সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিশ্ব সভ্যতায় গ্রিকদের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল দর্শন চর্চায়। এ পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে আবার প্রতিদিন কিভাবে এর পরিবর্তন ঘটেছে তা ভাবতে গিয়েই গ্রিসে দর্শন চর্চা শুরু হয়। প্রথম দিকে বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন 'থালেস'। তিনি সূর্যগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী দার্শনিক ছিলেন সক্রেটিস। তিনি ছিলেন দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা ছিল তাঁর শিক্ষার মূল লক্ষ্য। অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষা দেন তিনি। ফলে শাসকগোষ্ঠী হেমলক লতার তৈরি বিষ খাইয়ে তাকে হত্যা করে। পরবর্তীতে সক্রেটিসের ছাত্র প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। 'রিপাবলিক' নামক গ্রন্থে তাঁর চিন্তাগুলো প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সক্রেটিসের শিক্ষার বক্তব্যগুলো নিয়ে 'ডায়ালগস্ অব সক্রেটিস' নামে আর একটি বই লেখেন।

**সাহিত্যে অবদান**

গ্রিকরা কল্পনাপ্রবণ জাতি ছিল। নিজেদের ঐতিহ্য ও বীরদের দুঃসাহসিক অভিযানগুলো বর্ণনা করতে তারা বেশি পছন্দ করত। হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' এমন ধারারই কাজ। এছাড়া বহু কবি ও নাট্যকার গ্রিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল।

**ইতিহাস চর্চায়**

ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে গ্রিকদের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। গ্রিক ইতিহাসবেত্তা "হেরোডেটাস"কে ইতিহাসের জনক বলা হয়। অন্য খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ ছিলেন 'থুকিডাইডিস'। তাঁকে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক বলা হয়।

**অলিম্পিক খেলায়**

বড় কোন প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন নগর রাষ্ট্রগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরি। এই চিন্তা হতে তারা একটা উৎসব অনুষ্ঠানের চিন্তা করলেন। যার ফসল হিসেবে শুরু হলো অলিম্পিক খেলা ৭৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এ খেলায় বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ নিত। এ খেলার সূত্র ধরে পারস্পরিক শত্রুতার বদলে গ্রিকদের মাঝে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে।

**বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে**

গ্রিকরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশ অগ্রসর হয়েছিল। তারা প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন। তারা প্রমাণ করেছিল, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয়। গণিত ও চিকিৎসা শাস্ত্রে তারা যথেষ্ট অবদান রেখেছিল।

**স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে**

প্রাচীন গ্রিকরা স্থাপত্যকলায় অপূর্ব দক্ষতা দেখাতে পেরেছিল। অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত বড় বড় স্তম্ভের উপর তারা প্রাসাদ তৈরি করত। গ্রিক স্থাপত্যের উদাহরণ হিসেবে মন্দির পার্থেনন এবং এথেন্সে দেবী এথেনার মন্দির ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গ্রিক ভাস্করগণ মনে করত দেবতারা মানুষের মতো দেহধারী। তাই দেবতার মূর্তি তৈরি করতে গিয়ে তারা মানুষের মূর্তি তৈরি করায় খুব ভক্ত হয়ে পড়ে। ভাস্করদের মধ্যে ফিদিয়াসকে গ্রিসের সবচেয়ে খ্যাতিমান ভাস্কর বলে বিবেচনা করা হতো। তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি ৭০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট দেবী এথেনার মূর্তি ভাস্কর্যের ইতিহাসে দুর্লভ সংযোজন।

**সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে**

সংগীত চর্চায় গ্রিকরা যথেষ্ট উৎসাহী ছিল। সংগীত চর্চা করতে গিয়ে তারা অনেক বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন করে। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে ভালো গাওয়ার প্রয়োজন থেকেই সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল।

**ব্যবসা-বাণিজ্য**

গ্রিসের উপকূলে বেশ কিছু সমুদ্রবন্দর গড়ে উঠেছিল। এ কারণে গ্রিকরা ব্যবসায়ী ও নাবিক হিসেবে দক্ষতা অর্জন করে। তাদের বাণিজ্য জাহাজ ইজিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগর পাড়ি দিত। অপর্যাপ্ত কৃষি জমি থাকায় গ্রিকরা ৭৫০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের তীরে বেশকিছু উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল।

**সার-সংক্ষেপ**

গ্রিক সভ্যতা শুধু ইউরোপকে নয় গোটা বিশ্বকে আলোর পথে অগ্রসর করে দেয়। দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, সংগীত ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রিক সভ্যতার অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.১২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ লিখুন :**

১. ইউরোপ মহাদেশের যে অঞ্চলটিতে সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে, তার নাম —।
২. গ্রিসের পূর্ব নাম ছিল —।
৩. ইউরোপের আধুনিক সভ্যতা অনেকভাবে — সভ্যতার নিকট ঋণী।
৪. গ্রিসের মহাকবি — হাজার হাজার বছরের পুরানো কাহিনী নিয়ে রচনা করেছেন মহাকাব্য '—' ও 'ওডিসি'।
৫. গ্রিকদের প্রধান দেবতা ছিলেন —।
৬. সক্রেটিসের ছাত্র — গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।
৭. — নামক গ্রন্থে প্লেটো তাঁর চিন্তাগুলো প্রকাশ করেন।
৮. প্লেটো সক্রেটিসের শিক্ষার বক্তব্যগুলো নিয়ে — — নামে আরেকটি বই লেখেন।
৯. — খেলা শুরু হয় ৭৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
১০. গ্রিক স্থাপত্যের উদাহরণ হিসেবে মন্দির — , এথেন্সে দেবী — মন্দির ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. গ্রিক সভ্যতার পরিচয় দিন।
২. সভ্যতায় গ্রিসের অবদান উল্লেখ করুন।
৩. ধর্ম ও দর্শনে গ্রিকদের অবদান বিশ্লেষণ করুন।

৪. অলিম্পিক খেলা ও স্থাপত্য ভাস্কর্যে গ্রিকদের অবদান বর্ণনা করুন।

## পাঠ-১৩ : রোমান সভ্যতা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ রোমান সভ্যতার অবস্থান ও পরিচয় বলতে পারবেন।
☞ রোম নগরীর উত্থান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ সভ্যতায় রোমানদের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

### ১৩.১ পরিচয় ও অবস্থান

ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ ভাগে ইতালী অবস্থিত। ইতালীর দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর থেকে উত্তরে আল্পস পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইতালীর তিন দিকে সাগর। ইতালীর একটি নদীর নাম হলো টাইবার। এই টাইবার নদীর দক্ষিণ তীরে প্রাচীন যুগে বিখ্যাত রোম নগরীর পত্তন ঘটে। সাতটি পর্বতের মধ্যবর্তী সমতলভূমি নিয়ে রোম নগরী গঠিত হয়। সে সময়ে ইতালীর ভৌগোলিক অবস্থা বসবাসের জন্য তেমন অনুকূল ছিল না। খনিজ সম্পদ বলতে ছিল মর্মর পাথর, সামান্য কিছু তামা, সোনা এবং লোহা। তবে উর্বর জমি থাকায় কৃষির বিকাশের সুযোগ ছিল যথেষ্ট। প্রাচীন রোম ছিল অরক্ষিত ও চারদিকে উন্মুক্ত। ফলে বাইরের শক্তি সহজেই প্রবেশ করার সুযোগ পেত। যে কারণে রোমের আদি অধিবাসীদের সাথে অনুপ্রবেশকারীদের প্রায়ই সংঘর্ষ হতো।

### ১৩.২ রোম নগরীর উত্থান

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর একদল মানুষ খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে উত্তর ইতালীতে বসবাস করত। এরা ল্যাটিন নামে পরিচিত ছিল। ক্রমে এদের ভাষা ল্যাটিন ভাষা নামে পরিচিতি লাভ করে। কিংবদন্তি আছে যে, ল্যাটিন রাজা রোমিউলাস একটি নগর পত্তন করে। তাঁর নামানুসারে নগরটির নামকরণ করেন রোম। রোমিউলাস এর পর ছয়জন রাজা রোমে পর পর রাজত্ব করনে। রোম নগরীর পত্তনের পর হতেই রোমে ক্রমশ লোকজনের বসতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। ক্রমে রোমের শাসকরা সামরিক শক্তির সাহায্যে তাঁদের কর্তৃত্ব ইতালীর অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। ফলে ইটালীর সর্বত্র এবং ভূমধ্যসাগরের কোন কোন দ্বীপে রোমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে রোম নগরী একদিনে গড়ে ওঠেনি। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই নগরী শক্তিশালী হয়। সম্ভবত ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে রোমের পত্তন ঘটে। গ্রিসে সভ্যতা যখন তার গৌরবের চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছেছিল তখন ইউরোপের আরেকটি অঞ্চল প্রস্তুতি নিচ্ছে নতুন করে সভ্যতা গড়ার। গ্রিসের উত্তর-পশ্চিমে প্রাচীন রোম নগরী ঘিরে উত্থান ঘটে এ সভ্যতার। ৮ম খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি থেকে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোমান সভ্যতা সগৌরবে টিকে ছিল।

### ১৩.৩ সভ্যতায় রোমের অবদান

যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়েই রোমান সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল। তাই প্রথম পর্বে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রোমবাসী তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেনি। সামান্য কিছু উন্নয়ন ঘটেছিল প্রজাতন্ত্রের যুগে। ব্যাপক উন্নতি ঘটে সাম্রাজ্যের যুগে। নিম্নে রোমান সভ্যতার অবদানগুলো বর্ণনা করা হলো :

**লিখন পদ্ধতি**

ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বের শুরুতে রোমে একটি লিখন পদ্ধতি তৈরি হয়েছিল। এ লেখা ব্যবহার করা হতো আইন ও চুক্তিপত্র তৈরিতে। সমাধি ফলকের গায়ে রোমান লিপি পাওয়া যায়।

**দর্শন শাস্ত্রে অবদান**

দর্শন চর্চা সবচেয়ে বেশি হয়েছে রোমে। রোমের সবচেয়ে জনপ্রিয় দার্শনিক মতবাদের নাম স্টোয়িকবাদ। এ মতবাদের সাফল্যের পেছনে 'সেনেকা', 'এপিকটেটাস', 'মার্কাস অর্লিয়াস' এই তিন ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁরা মনে করতেন সুখ লাভ করার জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সত্যবাদী হওয়া।

**সাহিত্যে অবদান**

সম্রাট অগাসটাস সীজারের যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নতি হয়। এ যুগের কবি হোরাস, ভার্জিল যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভার্জিলের মহাকাব্য 'ইনিড' বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ওভিদ ও লিভি ছিলেন এ যুগের দুইজন খ্যাতিমান কবি।

**ইতিহাসে অবদান**

ইতিহাস চর্চায় রোমানদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ টেসিটাস এ যুগে রোমে জন্মগ্রহণ করেন। রোমান কবি লিভি ঐতিহাসিক হিসেবেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

**স্থাপত্যে অবদান**

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল রোমের। এখানে ইট আর কংক্রিট দিয়ে দালানকোঠা তৈরি করা হতো। দালানের চার কোণায় ব্যবহার করা হতো পাথর। অনেক নকশা আঁকা হতো দেয়ালের গায়ে। সম্রাট হাড্রিয়ানের তৈরি ধর্মমন্দির প্যানথিয়ন রোমের একটি বড় স্থাপত্য নিদর্শন। রোমে 'কলোসিয়াম' নামে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নাট্যশালা তৈরি হয়েছিল। এখানে একসাথে ৫,৬০০ জন দর্শক বসতে পারত। ভাস্কর্যের নিদর্শন হিসেবে রোমে পাওয়া গেছে অনেক মূর্তি। এগুলো ছিল সম্রাট, কর্মকর্তা ও দেবতাদের মূর্তি।

**বিজ্ঞানে অবদান**

বিজ্ঞানে রোমদের অবদান বেশি নয়। রোমের বিজ্ঞানীদের মধ্যে 'বড় প্লিনি' হলেন বিখ্যাত। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েক খণ্ড বিশ্বকোষ রচনা করেছিলেন। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন বিজ্ঞানী সেলসাস। ইটালিতে বসবাসকারী অপর দুজন বিজ্ঞানী গ্যালেন ও রুফাস বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, যদিও তারা রোমান ছিলেন না।

**ধর্মের ক্ষেত্রে অবদান**

রোমবাসীরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত। জুপিটার তাদের প্রধান দেবতা। এছাড়াও মিনার্ভা, ভেনাস ও নেপচুন রোমের গুরুত্বপূর্ণ দেব-দেবী হিসেবে চিহ্নিত। অগাস্টাস সীজারের সময় থেকে সম্রাটকে পূজার রীতি চালু হয়। রোমে নিজস্ব ধর্মের পাশাপাশি খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব ছিল। খ্রিস্টান ধর্মে মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথা বেশি ছিল। তাই মানুষ এ ধর্মে আকৃষ্ট হতে থাকে। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মে সম্রাটকে পূজা করা যায় না। ফলে যারা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী হয় তাদের প্রতি সম্রাটদের তরফ হতে শুরু হয় অত্যাচার। এতে সমাজে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। সবশেষে সম্রাট কনস্টানটাইনের সময় খ্রিস্ট ধর্ম রোমের রাষ্ট্র ধর্মের মর্যাদা লাভ করে।

**আইনের ক্ষেত্রে অবদান**

আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে রোমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। প্রথমদিকে আইন লিখিত ছিল না; পরে লিপিবদ্ধ করা হয়। জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে সর্বপ্রথম রোমান আইন সংকলিত হয়। রোমান আইনে সকল মানুষ সমান ছিল। রোমান আইন তিনটি শাখায় বিকাশ লাভ করে।

**(১) বেসামরিক আইন :** এ আইন পালনে নাগরিকরা বাধ্য ছিল। এ আইনও লিখিত ও অলিখিত দুভাবেই পাওয়া যায়।

**(২) জনগণের আইন :** মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার জন্য এ আইন তৈরি হয়েছিল। এ আইন জাতীয় চেতনার প্রতি অমনযোগীদের উপর প্রয়োগ করা হতো।

**(৩) প্রাকৃতিক আইন :** এই আইনের বক্তব্য হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবেই সকল মানুষ সমান এবং জন্মগতভাবে লাভ করা তাদের মৌলিক অধিকার লংঘন করার ক্ষমতা সরকারের নেই। সিসেরো ছিলেন এই আইনের জনক।

রোমান আইন ছিল নিরপেক্ষ, উদার ও মানবিক। এতে বিধবা ও এতিম দাস-দাসীর অধিকার সংরক্ষণের কথা ছিল। রোমান আইন দাসদের প্রতিও সহানুভূতি প্রবণ ছিল।

**সার-সংক্ষেপ**

রোমান নগরীকে কেন্দ্র করে প্রাচীন রোমান সভ্যতা গড়ে ওঠে। এটি গ্রিক সভ্যতারই একটি বর্ধিত রূপ হিসেবে বেড়ে ওঠে। তবে প্রাচীন রোমের ইতিহাস ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহে পূর্ণ। তবে পরে দর্শন, সাহিত্য, আইন রচনার ক্ষেত্রে রোমানরা অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছে। আধুনিক আইনের ভিত্তিই হলো রোমান আইন। এছাড়াও এক ঈশ্বরবাদী খ্রিস্টধর্ম রোমান সভ্যতা থেকে প্রচার লাভ করে এবং দ্রুত এটি একটি বিশ্বধর্মে পরিণত হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.১৩

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**এক কথায় উত্তর দিন :**

১. রোম নগরী কোথায় গড়ে উঠেছিল?
২. কার নামানুসারে রোম নগরীর নামকরণ করা হয়?
৩. রোমান সভ্যতা গৌরবের সাথে কত বছর টিকেছিল?
৪. রোমের সবচেয়ে জনপ্রিয় দার্শনিক মতবাদের নাম কি?
৫. রোমান সাহিত্যের সবচেয়ে উন্নতি হয় কোন সম্রাটের আমলে?
৬. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রোমান নাট্যশালাটির নাম কি?
৭. রোমবাসীদের প্রধান দেবতার নাম কি?
৮. মিনার্ভা, ভেনাস ও নেপচুন কোন জাতির গুরুত্বপূর্ণ দেব-দেবী?
৯. কোন সম্রাটের সময় খ্রিস্টধর্ম রোমের রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা লাভ করে?
১০. কত সালে সর্বপ্রথম রোমান আইন সংকলিত হয়?
১১. কোন আইনে সকল মানুষ সমান ছিল?

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. রোমান সভ্যতার পরিচয় দিন।
২. রোম নগরীর উত্থান সম্বন্ধে বর্ণনা দিন।
৩. সভ্যতায় রোমানদের কি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে?
৪. দর্শন ও বিজ্ঞানে রোমানদের অবদান বর্ণনা করুন।
৫. ধর্ম ও আইনের ক্ষেত্রে রোমানদের অবদান বিশ্লেষণ করুন।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ২

**বিশদ উত্তর প্রশ্ন**

১. মিশরীয় সভ্যতার পরিচয় দিন এবং বিশ্ব সভ্যতায় প্রাচীন মিশরীয়দের অবদান আলোচনা করুন।
২. মেসোপটেমীয় সভ্যতার অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. সুমেরীয় সভ্যতার বিবরণ দিন।
৪. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল? সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের অবদান নিরূপণ করুন।
৫. এ্যাসিরীয় ও ক্যালডীয় সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৬. সিন্ধু সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল উল্লেখপূর্বক সিন্ধু সভ্যতার অবদান আলোচনা করুন।
৭. ফিনিশীয় সভ্যতার পরিচয় দিন। বিশ্ব সভ্যতায় ফিনিশীয়দের অবদান বর্ণনা করুন।
৮. সভ্যতায় পারসীয়দের অবদান বিশ্লেষণ করুন।
৯. হিব্রুদের পরিচয় দিন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিব্রুদের অবদান নিরূপণ করুন।
১০. প্রাচীন চীনা সভ্যতার বিবরণ দিন।
১১. গ্রিক সভ্যতার পরিচয় দিন। প্রাচীন সভ্যতায় গ্রিসের অবদান বিশ্লেষণ করুন।
১২. রোমান সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল? সভ্যতায় রোমানদের অবদান মূল্যায়ন করুন।

ইউনিট ৩

# বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও এর প্রভাব

## ভূমিকা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি। তবে দেশটির অবস্থান প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। তাই দেশটির রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে। এর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি। দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার এবং বাকি পুরো দেশটির সীমারেখা ঘিরে আছে ভারত। বাংলাদেশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ছোট-বড় অসংখ্য নদ-নদী ও খাল-বিল। প্রায় পুরোটা জনপদই সমতল। কিছু কিছু পাহাড়ি বনাঞ্চলও রয়েছে। চির সবুজে ঘেরা শস্য-শ্যামলা নাতি-শীতোষ্ণ দেশটি মানুষ বসবাসের জন্য এক চমৎকার আবাসভূমি। তাই সামগ্রিক ভৌগোলিক প্রভাবের কারণে এদেশবাসী সাধারণত শান্ত-কোমল এবং স্বাধীনচেতা। এই ইউনিটে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও জনজীবনে এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ–


➔ পাঠ ১ : বাংলাদেশের অবস্থান ও পরিচিতি

➔ পাঠ ২ : বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও এর প্রভাব

## পাঠ-১ : বাংলাদেশের অবস্থান ও পরিচিতি

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ বাংলাদেশের অবস্থান বলতে পারবেন।

☞ বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় দিতে পারবেন।

☞ বাংলাদেশের নদ-নদীর বিবরণ দিতে পারবেন।

### ১.১ বাংলাদেশের অবস্থান

বিশ্ব মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অবস্থান। দক্ষিণ সীমায় বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি ছাড়াও ছোট্ট দেশটির বাকি সীমারেখা ঘিরে রেখেছে ভারত।

**উত্তর সীমা**

বাংলাদেশের উত্তর সীমায় রয়েছে ভারতের বিশাল হিমালয় পর্বত। উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অরুণাচল ও আসাম রাজ্য।

**পূর্ব সীমা**

এদেশের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে ছোট-বড় অনেক পাহাড়। বিশেষ করে এখানে আসাম, খাসিয়া, জয়ন্তিকা, ত্রিপুরা, মায়ানমার আর চট্টগ্রামের পাহাড় রয়েছে।

**দক্ষিণ সীমা**

বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে বিশাল বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি।

**পশ্চিম সীমা**

বাংলাদেশের পশ্চিম সীমানায় রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও রাজমহলের পাহাড়ি এলাকা। এছাড়াও পশ্চিমের সীমারেখায় সাঁওতাল পরগনা, ঝাড়খণ্ড ও ময়ূরভঙ্গের ঘন জঙ্গল রয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে অনেকবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। এর ফলে সীমারেখারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য ইংরেজ আমলেই কয়েকবার বিভিন্ন প্রদেশের সাথে বাংলার কোন কোন অংশ যুক্ত হয়েছিল।

ইংরেজরা ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবার পর বাংলাদেশ দু'ভাগে বিভক্ত হয়। এর পশ্চিমাঞ্চল ভারতের সাথে এবং পূর্বাংশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের মোট আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। অথচ জনসংখ্যা প্রায় পনের কোটি। বাংলাদেশের সীমারেখা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে এদেশ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভ করে। এর ফলে বাংলাদেশের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট সীমারেখা গড়ে ওঠে। ভৌগোলিক মানচিত্রে বাংলাদেশে অবস্থান সংকীর্ণ হলেও এর ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি।

## বাংলাদেশের মানচিত্র

### ১.২ বাংলাদেশের নদ-নদী

নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী ও খাল-বিল। বাংলাদেশের বড় বড় নদীর মূল উৎস দেশের বাইরে। নিচু অঞ্চল বলে বাংলাদেশের বুক চিরে নদীগুলো বয়ে চলে ক্রমে সাগর পানে গিয়ে মিশেছে।

**মূল নদীসমূহ**

বাংলাদেশের অসংখ্য নদ-নদীর কতিপয় মূল নদী রয়েছে। মূল নদীগুলো হলো- গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা ও করতোয়া। এই মূল নদীসমূহের শাখা নদী ও উপনদী বয়ে গেছে চারদিকে।

**ব্রহ্মপুত্র**

বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদ ব্রহ্মপুত্র। প্রাচীনকালে এর নাম ছিল লৌহিত্য। হিমালয়ের উত্তরে মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে এ নদ ময়মনসিংহের ভেতর দিয়ে ঢাকার সোনারগাঁ পর্যন্ত প্রবাহিত।

**যমুনা**

যমুনা বাংলাদেশের বড় নদীসমূহের একটি। ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা হিসেবে এ নদীটি যমুনা নাম ধারণ করে প্রবাহিত হয়ে পদ্মা নদীতে মিশেছে।

**মেঘনা**

মেঘনা বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদী। মেঘনা নদীর উৎপত্তি খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ে। এর একটি শাখা সুরমা নদী নামে প্রবাহিত হয়েছে। অপর শাখা মেঘনা নাম নিয়েই ভৈরব বাজারের নিকট ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশেছে। এরপর গতি হয়েছে দক্ষিণমুখী। অবশেষে মিশে গিয়েছে বঙ্গোপসাগরের বিশাল বুকে।

**করতোয়া**

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আরেকটি নদী হলো করতোয়া। এ নদীটি এখন শুকিয়ে ছোট্ট হয়ে গেছে। প্রাচীনকালে এটি বেশ বড় নদী ছিল। ভূটানের কাছে হিমালয় পাহাড়ে এর জন্ম।

প্রথমদিকে তিস্তা নাম নিয়ে নদীটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে। পরে এর তিনটি ধারা তিন দিকে চলে যায়। পূর্বদিক থেকে দক্ষিণে বয়ে যাওয়া স্রোতটির নাম করতোয়া। মধ্যের ধারা আত্রাই নদী নামে পরিচিত হয়। আর পশ্চিমের ধারার নাম পূনর্ভবা নদী।

### ১.৩ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদ-নদীর প্রভাব

নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিরাট সমভূমির মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলো বয়ে এনেছে পলিমাটি। ফলে এদেশের মাটি উর্বর হয়ে উঠেছে। উর্বর মাটিতে পর্যাপ্ত ফসল ফলে আমাদের দেশ হয়েছে শস্য-শ্যামলা। বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি বড় মাধ্যম হলো নদীপথ। সেজন্য এদেশের মানুষ নৌকা চালনায় বেশি দক্ষ। মানুষ ও মালামাল পরিবহনে এদেশে নৌপথের ভূমিকা সর্বাধিক। তাই এ দেশের অর্থনীতিতে নদ-নদীর প্রভাব অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

হাজার হাজার  নদীর নেটওয়ার্কে বাঁধা বাংলাদেশ। উপরিল্লিখিত বড় নদীসমূহ ব্যতীত এদেশে রয়েছে কপোতাক্ষ, রূপসা, ধানসিঁড়ি, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ, ধলেশ্বরী, শিবশা, কীর্তনখোলা, তেঁতুলিয়া, কর্ণফুলী, বুড়িগঙ্গা ইত্যাদির মতো অসংখ্য নদ-নদী। এত সংকীর্ণ পরিসরে এত অধিক সংখ্যক নদ-নদী পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

**বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য**

বাংলাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ব পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এর যেমন সুপ্রাচীন ভূ-ভাগ রয়েছে তেমনি নব-সৃষ্ট ভূ-ভাগও বিদ্যমান। এছাড়া বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপাঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এর দক্ষিণে উন্মুক্ত সমুদ্র দ্বার বিদ্যমান। এদেশ মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবাধীন বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। অসংখ্য নদ-নদীর অস্তিত্ব বাংলাদেশকে বিরল ভূবৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলি খুবই আকর্ষণীয় এবং এগুলো বাংলাদেশকে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে।

**সার-সংক্ষেপ**

বাংলাদেশ উপমহাদেশের পূর্বদিকে অবস্থিত। আবহমান কাল থেকে এদেশের ভৌগোলিক সীমানা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। পাহাড়, পর্বত, অরণ্যাঞ্চল, সমুদ্র ইত্যাদিতে দেশটি ঘেরা। এদেশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী। বাংলাদেশ তাই নদীর দেশ। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা, করতোয়া, মহানন্দা ইত্যাদি প্রধান প্রধান নদী। গঙ্গার দক্ষিণ মুখী প্রবাহ পথটি পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং এর অসংখ্য স্রোতধারা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে সৃষ্টি করেছে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার জলমগ্ন এলাকা। সবকিছু মিলিয়ে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলি বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রতা দান করেছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.১

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**এক কথায় উত্তর দিন :**

১. বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়?
২. বাংলাদেশের উত্তর সীমা লিখুন।
৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমানা কি?
৪. বাংলাদেশের পশ্চিমে কি?
৫. বাংলাদেশের পূর্ব সীমানা লিখুন।
৬. কোন সালে এদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়?
৭. বাংলাদেশের মোট আয়তন কত বর্গ কিলোমিটার?
৮. বাংলাদেশের মূল নদীগুলো কি কি?
৯. মেঘনা নদীর উৎস কোথায়?
১০. পদ্মা নদীর প্রাচীন নাম কি ছিল?

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা ও অবস্থান বর্ণনা করুন।
২. বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের পরিচয় দিন।
৩. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদ-নদীর প্রভাব উল্লেখ করুন।

## পাঠ-২ : বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও এর প্রভাব

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

☞ জনজীবনে ভৌগোলিক প্রভাব বলতে পারবেন।

☞ রাজনৈতিক জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

☞ সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ভৌগোলিক প্রভাবের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ২.১ বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী ও খাল-বিল। পলি মাটির স্তরে গড়ে উঠেছে এদেশের ভৌগোলিক অবকাঠামো। নদী ঘেরা পলল ভূমির ভৌগোলিক অবস্থা তাই এদেশের জনজীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে।

**ভূপ্রকৃতি**

এদেশের পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণাংশে ছোট-বড় কিছু সংখ্যক পাহাড় আছে, তাছাড়া বাকি প্রায় সমস্ত দেশটিই সমভূমি।

**উর্বর পলল ভূমি**

বাংলাদেশের সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়েছে। ফলে গোটা ভূমিতে উর্বর পলিমাটি জমা হয়। আর এ কারণে এদেশের মাটি খুবই উর্বর।

**নদ-নদী পরিবেষ্টিত ভূমি**

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী প্রাচীন বাংলাদেশকে 'আব-গিরিফতা বাঙ্গালা' বলে উল্লেখ করেছেন। আব-গিরিফতা অর্থ পানি পরিবেষ্টিত। মূলত বাংলাদেশের অসংখ্য নদ-নদী জালের মতো ছড়িয়ে আছে। এত অধিক নদ-নদীর পানি দ্বারা বেষ্টিত দেশ পৃথিবীতে বিরল।

**আবহাওয়া**

নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। এদেশের উত্তর দিকে বিষুবরেখা অবস্থিত। এদেশের উপর দিয়েই বয়ে গেছে কর্কটক্রান্তি রেখা। আর এজন্য এখানকার আবহাওয়া মৃদু ও নাতিশীতোষ্ণ।

### ২.২ জনজীবনের উপর প্রভাব

**কৃষি নির্ভরতা**

বাংলাদেশের ভূমি খুবই উর্বর। এজন্য এদেশের অধিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই কৃষিজীবী। সুপ্রাচীনকাল থেকে এদেশ কৃষি প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত। অল্প পরিশ্রমে অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। আর এ কারণে এদেশের কৃষিনির্ভর মানুষ কিছুটা অলস ও শ্রমবিমুখ।

**কোমল ও শান্ত স্বভাব**

উর্বর ভূপ্রকৃতি ও মৃদু আবহাওয়া বাংলাদেশের অধিবাসীদেরকে প্রকৃতিগতভাবে কোমল ও শান্ত স্বভাবের করে গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশীদের আবেগময় মন ও পারিবারিক সৌহার্দ্য তাদের কোমল স্বভাবের প্রমাণ বহন করে।

**প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী মন**

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের দরুণ এখানে কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস-প্লাবন সংঘটিত হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এদেশবাসীর মানসিকতা সহনশীল ও প্রাকৃতিক বিপযর্য়ের বিরুদ্ধে চির সংগ্রামী। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় তারা ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে।

**নৌ-কুশলী**

নদ-নদী ও পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার কারণে বাংলাদেশের অধিবাসীরা নৌকা নির্মাণ ও পরিচালনায় দক্ষ। নৌ-যুদ্ধেও বাংলাদেশীদের সুখ্যাতি ছিল। প্রাচীন মুসলিম শাসনামলে এদেশে সুশৃঙ্খল নৌ-বহর গড়ে উঠেছিল।

**জীবনধারণ প্রক্রিয়া**

প্রাচীনকাল থেকে এদেশের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। আর এদেশে মাছ খুবই সহজলভ্য। ফলে এদেশের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য হলো ভাত ও মাছ। এছাড়া সাধারণ পোশাকও এ দেশবাসীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাদের ঘর, বাড়ি, বাসস্থান প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরি করতে হয়।

**২.৩ রাজনৈতিক জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব**

তিন দিকে পাহাড়-পর্বত এবং গভীর অরণ্য আর একদিকে সমুদ্র বাংলাদেশকে প্রাকৃতিকভাবে বেষ্টিত করে রেখেছিল। ফলে বাংলাদেশকে খুব একটা বৈদেশিক আক্রমণের মোকাবেলা করতে হয়নি। বিদেশী শক্তির লোভী দৃষ্টি থেকে প্রকৃতিই বাংলাকে আড়াল করে রেখেছিল এবং এ কারণে প্রাচীনকালে বহুদিন পর্যন্ত বাংলার স্বকীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন ছিল। উত্তর ভারত থেকে এদেশে মাত্র দুটি প্রধান পথে প্রবেশ করা যেত। একটি ত্রিহুত বা উত্তর বিহারের মধ্যদিয়ে এবং অপরটি রাজমহলের নিকট তেলিয়াগড়ের সরু পাহাড়ি পথ ধরে। ভৌগোলিক কারণেই এ পথগুলো দিয়ে বাংলায় প্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না বলে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ প্রাচীনকালে ঐশ্বর্যশালী বাংলাকে অধিকার করার যে প্রচেষ্টগুলো নিয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগই ব্যর্থ হয়েছে। কখনো কখনো সাফল্য এলেও ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। মৌর্য ও গুপ্ত শাসকগণ অল্প কিছুদিনের জন্য বাংলায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এভাবে প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবন একটি নিজস্ব ধারায় গড়ে উঠতে থাকে।

**২.৪ সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে প্রভাব**

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব এদেশের জনগণের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উপরও পড়েছে। অধিবাসীদের খাদ্য তালিকা, পোশাক, ঘরবাড়ি, দৈনন্দিন জীবনাচার ইত্যাদি ভৌগোলিক অবস্থার ভিত্তিতেই অনেকাংশে গড়ে উঠেছে। এছাড়া বাংলার ভূপ্রকৃতি তার নদ-নদীর বিস্তার এবং পলিমাটির প্রাচুর্য এ দেশটিকে গড়ে তুলেছে মৃৎশিল্প চর্চার এক আদর্শ ও অনন্য ক্ষেত্র হিসেবে। প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটির শিল্প এখানকার ভৌগোলিক পরিবেশকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের অবস্থানগত কারণে এ অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় জীবনের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছে। উপমহাদেশের সর্বপূর্ব প্রান্তে অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে আর্য প্রভাব এসেছে বেশ পরে। ইত্যবসরে আর্য প্রভাব হয়ে পড়েছে ক্ষীণ আর বাংলার অনার্য সত্তা দৃঢ় হবার সুযোগ পেয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল এবং মধ্যযুগে এসেছে ইসলাম ধর্ম। বাংলাদেশের পরিবেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই উদারতা ও সহনশীলতা ধর্মীয় ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এবং সহ-অবস্থানের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে। এ সবই এ অঞ্চলের অবস্থানগত এবং ভৌগোলিক পরিবেশগত প্রভাবের ফল। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ এখানকার নগর বন্দরের উত্থান-পতনের প্রক্রিয়ার সাথেও জড়িত। নদীর গতি পরিবর্তন এবং অন্যান্য ভৌগোলিক কারণে বহু প্রাচীন নগর বন্দরের উত্থান ও বিলুপ্তি ঘটেছে। পুন্ড্রনগর, গৌড়, বিক্রমপুর, দেবপর্বত (ময়নামতি) ইত্যাদি শহর নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

**সার-সংক্ষেপ**

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলি বাংলাদেশের স্বকীয় রাজনৈতিক জীবন গড়ে তুলেছে। পাহাড়-পর্বত, গভীর অরণ্য, সমুদ্র বাংলাকে বিদেশী শক্তির লোভ থেকে আড়াল করে রেখেছে। আর্থ-সামাজিক জীবনের উপর এ অঞ্চলের নদ-নদীর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। নদীপথে প্রাচীন অধিবাসীরা ব্যবসা করেছে, নদীর পানি সিঞ্চিত মাটিতে ফসল ফলিয়েছে, নদী থেকে অফুরন্ত মাছ সংগ্রহ করেছে। ভাটিয়ালি আর সারি গানের উৎসও হচ্ছে নদ-নদী বেষ্টিত বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ। বাংলার পরিবেশে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সহঅবস্থানের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে যা বাংলার আঞ্চলিক অবস্থান ও ভৌগোলিক পরিবেশগত প্রভাবের ফল। ভৌগোলিক পরিবেশ এখনকার অনেকগুলো নগর-বন্দর উত্থান-পতনের প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। ভৌগোলিক গুরুত্ব, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও কৃষি প্রাচুর্যের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির নিকট আকর্ষণীয় ও লোভনীয় হিসেবে বাংলাদেশ বিবেচিত হয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসান :**

১. বাংলাদেশের ভূমি খুবই ——। এজন্য এদেশের অধিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই ——।

২. বাংলাদেশীদের আবেগময় মন ও পারিবারিক সৌহার্দ্য তাদের —— —— প্রমাণ বহন করে।

৩. প্রাচীনকাল থেকে এদেশের প্রধান খাদ্যশস্য ——।

৪. এদেশের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য —— ও ——।

৫. প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল এবং মধ্যযুগ এসেছে —— ধর্ম।

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

২. জনজীবনে ভৌগোলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।

৩. বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব আলোচনা করুন।

৪. সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৩

**বিশদ উত্তর প্রশ্ন**

১. বাংলাদেশের অবস্থান ও পরিচিতি বর্ণনা করুন এবং বাংলাদেশের নদ-নদীর বিবরণ দিয়ে জনজীবনে এর প্রভাব বর্ণনা করুন।

২. বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা দিয়ে জনজীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।

ইউনিট
৪

# প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

## ভূমিকা

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার অব্দে বাংলার প্রাচীনতম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ সভ্যতাটি গড়ে উঠেছিল অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে। অশোকের রাজত্বকালে পুণ্ড্র জনপদ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুপ্ত যুগে প্রায় সারা বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। গুপ্ত শাসনের অবসানের পর বাংলায় দুটো স্বাধীন রাজ্যের বিকাশ ঘটে। এদের একটি উত্তর-পশ্চিম বাংলার গৌড় রাজ্য। অপরটি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বঙ্গরাজ্য। এরপর প্রায় একশ বছরের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার পর পাল বংশ ক্ষমতায় আসে। পাল বংশের পতনের পর সেন বংশের রাজত্ব শুরু হয়। সেন বংশের রাজত্বের অবসানের পর বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ–


- ➔ পাঠ ১ : প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ
- ➔ পাঠ ২ : বাংলা নামের উৎপত্তি
- ➔ পাঠ ৩ : মৌর্য ও গুপ্ত শাসনামলে বাংলা
- ➔ পাঠ ৪ : পাল পূর্ব যুগে বাংলা
- ➔ পাঠ ৫ : পাল বংশের শাসনাধীনে বাংলা
- ➔ পাঠ ৬ : দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজবংশসমূহ
- ➔ পাঠ ৭ : সেন বংশের শাসনাধীনে বাংলা

## পাঠ-১ : প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহ

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলোর নাম বলতে পারবেন।
☞ প্রাচীন জনপদগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।

### ১.১ বাংলাদেশের প্রাচীন পরিচিতি

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বাংলাদেশে মানুষের বসবাস ছিল। প্রাচীনকালে 'বাংলা' বা 'বাংলাদেশ' নামে একক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। এর বিভিন্ন অংশ তখন বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ অনেকগুলো ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি অঞ্চলের শাসকেরা যার যার মতো শাসন করতেন। তাই অঞ্চলগুলো ছিল ছোট ছোট স্বাধীন দেশের মতো। বাংলার এ অঞ্চলগুলোর নাম দেওয়া হয় জনপদ।

বাংলাদেশে প্রাচীন জনপদের সীমা বা বিস্তার সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে প্রতিটি অঞ্চলের সীমা সব সময় একই রকম থাকেনি। কখনও কোন জনপদের সীমা বেড়েছে, আবার কখনও কমেছে। নিচে কয়েকটি জনপদের বর্ণনা দেওয়া হলো :

### ১.২ প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি জনপদ

**গৌড়**

প্রাচীনকালে ঠিক কোথায় গৌড় জনপদটি গড়ে উঠেছিল তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে গৌড় রাজ্য বলে একটি স্বাধীন রাজ্যের কথা জানা যায়, যার অবস্থান ষষ্ঠ শতকে পূর্ব বাংলার উত্তর অংশে ছিল। সপ্তম শতকে শশাঙ্ককে গৌড় রাজ বলা হতো। এ সময় গৌড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় এর অবস্থান। বাংলায় মুসলিম বিজয়ের কিছু আগে মালদহ জেলার লক্ষণাবতীকেও গৌড় বলা হতো। মুসলিম যুগেও এ অঞ্চল গৌড় নামে পরিচিত ছিল।

**বঙ্গ**

বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বঙ্গ জনপদ নামে একটি অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয়, এখানে বঙ্গ বলে একটি জাতি বাস করত। তাই জনপদটি পরিচিত হয় বঙ্গ নামে। প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গে দুটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। একটি বিক্রমপুর আর অন্যটি নাব্য। বর্তমানে নাব্য বলে কোন জায়গার অস্তিত্ব নেই। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বাখেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি এ নাব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন বঙ্গ জনপদ ছিল খুব শক্তিশালী অঞ্চল। বাংলায় মুসলিম শাসন বিস্তারের প্রাথমিক পর্যায়েও 'বঙ্গ' বলে বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলকে বোঝানো হতো।

**পুণ্ড্র**

পুণ্ড্র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। বলা হয় যে, পুণ্ড্র বলে এক জাতি এ জনপদটি গড়ে তুলেছিল। বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চল নিয়ে এ পুণ্ড্র জনপদটির সৃষ্টি হয়েছিল। পুণ্ড্র জনপদের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর। পরবর্তীকালে এর নাম হয় পুণ্ড্রবর্ধন। পাথরের চাকতিতে খোদাই করা লেখা এখানে পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশে এটি প্রাচীনতম শিলালিপি।

**বরেন্দ্রী**

বরেন্দ্রী, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রভূমি নামে আরেকটি জনপদের কথা জানা যায়। এটিও উত্তর বঙ্গেরই জনপদ। অনুমান করা হয়, পুণ্ড্ররই একটি অংশ জুড়ে বরেন্দ্রীর অবস্থান ছিল। বগুড়া ও রাজশাহী জেলার অনেকটা অঞ্চল ছিল বরেন্দ্রীর অন্তর্ভুক্ত।

**সমতট**

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের প্রতিবেশী জনপদ সমতটের অবস্থান। চীন দেশের পর্যটক হিউয়েন সাং সপ্তম শতকের মাঝামাঝিতে সমতট ভ্রমণ করে একটি বিবরণী লেখেন। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত প্রসারিত ভূ-ভাগ সমতটের অন্তর্গত ছিল বর্তমান কুমিল্লা ও নোয়াখালি অঞ্চল। বর্তমান কুমিল্লা জেলার লালমাই এলাকা ছিল এ অঞ্চলের মূল কেন্দ্র। অনেকে মনে করেন, কুমিল্লা জেলার বড় কামতা ছিল এ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

**হরিকেল**

হরিকেল জনপদের অবস্থান ছিল পূর্ব ভারতের পূর্বপ্রান্তে। মনে করা হয়, আধুনিক সিলেটই হলো হরিকেল জনপদ। অবশ্য কেউ কেউ ধারণা করেন, হরিকেল আলাদা কোন জনপদ নয়। এটি বঙ্গ জনপদের সাথেই যুক্ত ছিল।

**রাঢ়**

রাঢ় জনপদ ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। এটি গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় নামে দুভাগে বিভক্ত ছিল রাঢ়দেশ। এর রাজধানী ছিল কোটীবর্ষ। রাঢ়ের এক বড় অংশ সুহ্ম নামেও পরিচিত ছিল। রাঢ়ের দক্ষিণে বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় 'তাম্রলিপ্তি' ও 'দণ্ডভুক্তি' নামে দুটি ছোট বিভাগ ছিল। বৌদ্ধ পুঁথি ও বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তৎকালে তাম্রলিপ্তি একটি বিখ্যাত নৌ-বাণিজ্য বন্দর ছিল।

**অন্যান্য জনপদ**

এছাড়া প্রাচীন বাংলায় আরো কয়েকটি জনপদের অস্তিত্বের কথা বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। এগুলোর মধ্যে তাম্রলিপ্তি (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তমলুক), চন্দ্রদ্বীপ (বর্তমান বরিশাল জেলার অন্তর্গত), বঙ্গাল (বাখেরগঞ্জ ও খুলনা জেলার সমুদ্র লাগোয়া অঞ্চল) উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে তাম্রলিপ্তি প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত নৌ-বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল।

**সার-সংক্ষেপ**

প্রাচীনকালে পুরো বাংলা জুড়ে একক কোন রাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি। তাই 'বাংলা' বা 'বাংলাদেশ' নামে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তখন ছিল না। অনেকগুলো ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এদেশ। প্রতিটি অঞ্চলের শাসকরা যার যার মতো করে শাসন করত। তাই অঞ্চলগুলো ছিল ছোট ছোট স্বাধীন দেশের মতো। কিন্তু এগুলোকে ঠিক রাজ্য বা রাষ্ট্র বলা যাবে না। বাংলার এই অঞ্চলগুলোকে তখন বলা হতো 'জনপদ'। এর অনেককাল পরে 'বাংলা' বলে একটি বড় দেশের জন্ম হয়েছিল। আর তার যাত্রা শুরু হয় এই জনপদগুলোর মধ্যদিয়ে। গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট, রাঢ় প্রভৃতি জনপদের কথা জানা যায় প্রাচীন বইপত্রে। এসব জনপদের সীমা বা বিস্তার সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে প্রতিটি অঞ্চলের সীমা সব সময় একই রকম থাকেনি। কখনও কোন জনপদের সীমা বেড়েছে আবার কখনও কমেছে। ঐতিহাসিক তথ্য হতে প্রাচীন জনপদগুলোর মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.১

**ক. নৈর্ব্যক্তি প্রশ্ন**

**এক কথায়/এক বাক্যে উত্তর দিন :**

১. কখন থেকে বাংলাদেশের মানুষের বসবাস ছিল?
২. প্রাচীনকালে 'বাংলা' বা 'বাংলাদেশ' নামে একক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল কি?
৩. প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলগুলোর কি নাম দেওয়া হয়?
৪. গৌড় বলা হতো কোন অঞ্চলকে?
৫. বঙ্গ রাজ্যটির অবস্থান কোথায় ছিল?
৬. কোন অঞ্চল নিয়ে 'পুণ্ড্র জনপদ' পরিচিত ছিল?
৭. বরেন্দ্র অঞ্চল কোনটি?
৮. সপ্তম শতকের কোন চীনা পর্যটক এদেশে আসেন?
৯. সমতট জনপদ কোন অঞ্চলকে নিয়ে গঠিত ছিল?
১০. হরিকেল জনপদটি কোথায় ছিল?
১১. 'রাঢ়' বলা হতো কোন অঞ্চলকে?

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদের পরিচয় দিন?
২. নিম্নের জনপদগুলোর উপর টীকা লিখুন :
(ক) গৌড় (খ) বঙ্গ (গ) পুণ্ড্র (ঘ) সমতট (ঙ) রাঢ়।

## পাঠ-২ : বাংলা নামের উৎপত্তি

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আমাদের দেশটির নাম কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ কিভাবে এদেশের নামকরণ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ২.১ বাংলাদেশের ইতিবৃত্ত

আজকের বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ এলাকাকে প্রাচীনকালে বলা হতো 'বাংলা'। তবে প্রাচীন যুগে এই সম্পূর্ণ দেশটির একক নাম বাংলা ছিল না। হিন্দু ও বৌদ্ধদের শাসনকালে এই দেশ অনেকগুলো অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি অংশের ছিল ভিন্ন ভিন্ন নাম। মধ্যযুগে যখন এদেশে মুসলমান শাসকদের অধিকারে আসে তখন থেকে দেখা যায় দেশটির নামের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসছে। বাংলা ভাষায় কথা বলা লোকেরা যে অঞ্চলে বাস করত এসময়ে তারই নাম হয় বাংলা। মুসলমান শাসন যুগ অর্থাৎ মধ্য যুগের শুরুর দিকে মুসলিম শাসক ও ইতিহাস লেখকগণ 'বঙ্গ বা বাঙলা (বাংলা)' বলতে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাকে বুঝাতেন। এ যুগের সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াসশাহ প্রথম পুরো বাংলাকে নিজের অধিকারে আনেন। ইতিহাস লেখকগণ তখন তাঁকে উপাধি দেন 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' এবং 'সুলতানই বাঙ্গালা'। এ সময় থেকেই পুরো দেশটি বাংলা নামে পরিচিত হয়। রাঢ় ও লক্ষণাবতীর (গৌড়) লোকেরা ইলিয়াস শাহের সময় থেকেই বাঙালি বলে পরিচিত হতে থাকে।

অনেককাল পরে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের অধিকারে চলে যায় এদেশ। ধীরে ধীরে পুরো ভারতের ক্ষমতা দখল করে ইংরেজরা। আমাদের এদশেটি ব্রিটিশদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ইংরেজরা তখন এই প্রদেশকে বলত 'বেঙ্গল'। বেঙ্গল নামটি ছিল ইংরেজি ভাষায় আর বাংলা ভাষায় বলা হতো বাংলাদেশ। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো দেশের জন্ম হয়। এ সময় পূর্ব বাংলা হয়ে যায় পাকিস্তানের অংশ আর পশ্চিম বাংলা হয় ভারতের অংশ। পরে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, জাতিগত এবং সংস্কৃতিগত স্বতন্ত্র সত্তাগুলো ক্রমশ প্রকট হতে থাকে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ স্বাধীন হওয়ার আকঙ্ক্ষায় ১৯৭১ এর ২৬ মার্চে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। তখন থেকে এদেশবাসী তাদের দেশেন নাম দেয় 'বাংলাদেশ'। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে। তখন থেকে 'বাংলাদেশ' একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের নাম হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিত হয়।

### ২.২ বাংলা নামকরণ

মোগল সম্রাট আকবরের ইতিহাস লেখক আবুল ফজল বাংলা নামের উৎপত্তির একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মতে এদেশের প্রাচীন নাম ছিল 'বঙ্গ'। এর আগে আমরা অবশ্য একটি ছোট জনপদ হিসেবে বঙ্গ নামক অঞ্চলের সাথে পরিচিত হয়েছি। আবুল ফজলের মতে প্রাচীনকালে এই বঙ্গ অঞ্চলের রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ চওড়া প্রকাণ্ড 'আল বা বাঁধ' নির্মাণ করতেন। এ থেকে বঙ্গ+আল=বঙ্গাল, বাঙ্গাল বা 'বাঙ্গালা' নাম হয়েছে। তবে একথা ঠিক মুসলিম আমলের পূর্বে 'বঙ্গ' ও বাঙ্গালা বাংলার অংশ বিশেষের নাম ছিল। আবুল ফজল সে সময়ের বাংলার একটি সীমা এঁকেছেন। তার মতে বাংলা চট্টগ্রাম থেকে রাজমহলের নিকট তেলিয়াগর্হি পর্যন্ত চারশত ক্রোশ লম্বা ছিল। পূর্ব ও উত্তর দিক ছিল পাহাড়ে ঘেরা। বাংলার দক্ষিণে ছিল সাগর আর পশ্চিমে বিহার প্রদেশ। তখন প্রদেশগুলোর নাম হয় 'সুবা'। সুবা বাংলা তখনও চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগর্হি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্রিটিশ শাসন যুগেও সীমারেখার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। তখন চট্টগ্রাম থেকে রাজমহল এবং হিমালয় পর্বত থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বাংলার বিস্তার ছিল। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত সিলেট জেলা ছিল আসামের সাথে যুক্ত। পরে তা আবার বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হয়।

**সার-সংক্ষেপ**

সেই প্রাচীনকালের শুরু থেকেই এদেশের নাম 'বাংলা' বা 'বাংলাদেশ' ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষার আর বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা এক এক সময় এদেশ শাসন করেছে। এরই সাথে সাথে দেশটির নামে এসেছে বিভিন্ন পরিবর্তন। বিভিন্ন পরিবর্তনের পথ ধরে এদেশের নাম বাংলা বা বাংলাদেশ হয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে বাংলাদেশের আকৃতি কেমন ছিল?
   ক. একক রাষ্ট্র খ. দুটি অংশে বিভক্ত
   গ. অনেকগুলো অংশে বিভক্ত ঘ. পাঁচটি অংশে বিভক্ত

২. পুরো বাংলাকে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করেন কে?
   ক. সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ খ. সম্রাট আকবর
   গ. আবুল ফজল ঘ. সম্রাট জাহাঙ্গীর

৩. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর এদেশের কি নামকরণ করা হয়?
   ক. পূর্ব বাংলা খ. পূর্ব পাকিস্তান
   গ. বাংলাদেশ ঘ. বেঙ্গল

৪. বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রথমে ব্যাখ্যা কে করেন?
   ক. ইলিয়াস শাহ খ. আবুল ফজল
   গ. সম্রাট আকবর ঘ. সম্রাট জাহাঙ্গীর

৫. মোগল যুগে এদেশকে কি বলা হতো?
   ক. সুবা খ. দেশ
   গ. প্রদেশ ঘ. জনপদ

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. কোন কোন সময় ‘বাংলা’ নামের পরিবর্তন হয়ে কি কি নাম হয়েছে আলোচনা করুন।

২. ‘বাংলা’ নামটির উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে বর্ণনা করুন।

## পাঠ-৩ : মৌর্য ও গুপ্ত শাসনামলে বাংলা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ মৌর্য শাসনামলে বাংলার অবস্থা বলতে পারবেন।
☞ গুপ্তযুগের বাংলার অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

**৩.১**

বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের প্রসিদ্ধ দুটি রাজবংশের নাম মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশ। এ দুই রাজবংশের সময় বাংলার সার্বিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল। নিম্নে মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের শাসনামলের বাংলার অবস্থার বিবরণ দেয়া হলো :

### ৩.২ মৌর্য শাসনামলে বাংলা

গ্রিক লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে বর্তমান বাংলাদেশ এলাকায় গঙ্গারিডই নামে সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। এ রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল গঙ্গা। এ সময়কালকে মৌর্য শাসনামল বলে ধারণা করা হয়। পণ্ডিতদের ধারণা হলো, 'গঙ্গারিডই' ছিল বর্তমানকালের বাংলা। আর্যদের আগমনের আগেই বাংলায় মৌর্য বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২১ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ভারতে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় রাজা অশোকের সময়ে ২৬৯-২৩২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। বাংলা ছিল মৌর্যদের একটি প্রদেশ। এর রাজধানী ছিল প্রাচীন পুণ্ড্র নগর।

মৌর্য শাসনামলে বাংলার রাজা খুবই প্রতাপশালী ছিলেন। তার বিশাল সামরিক বাহিনীতে ৪ হাজার সুসজ্জিত হাতি ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, বিশাল হস্তী বাহিনীর ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর খবর শুনে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার বাংলা আক্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করেন।

মৌর্য শাসনামলে বাংলা ছিল ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজ্য। 'গঙ্গারিডই' (বাংলার পূর্বনাম) রাজ্যের রাজধানীতে সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় তৈরি হতো, যা সুদূর পশ্চিমা দেশে রপ্তানি হতো।

মৌর্য শাসনামলে বাংলার সীমানা বিস্তৃত হয়। মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় প্রাচীন পুণ্ড্ররাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে উত্তরবঙ্গের এ অঞ্চল তখন মৌর্য শাসনাধীন একটা প্রদেশে পরিণত হয়।

### ৩.৩ গুপ্তযুগে বাংলা

গুপ্তযুগ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা সুস্পষ্ট তথ্য প্রদান করতে পারেননি। আনুমানিক ৩২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত পাটলীপুত্র এলাকা (বর্তমান পাটনায়) গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ধারণা করা হয়, গুপ্ত সাম্রাজ্য বর্তমান পাটনা এলাকায়, যার তৎকালীন নাম পাটলীপুত্র। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, গুপ্ত বংশের আদি পুরুষেরা বাংলার পশ্চিমাংশে একটি ছোট রাজ্যের সামন্ত অধিপতি ছিলেন। পরবর্তীকালে সমগ্র বাংলাই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনস্ত হয়।

গুপ্ত যুগে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করার মাধ্যমে শাসন করা হতো বলে জানা যায়। বাংলার উত্তরাংশ 'পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি' নামে একটি প্রদেশ অথবা প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে সংঘটিত হয়েছিল। গুপ্ত সম্রাটের নিযুক্ত একজন শাসনকর্তা দ্বারা এটি শাসিত হতো। ৫০৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বা সমতট শাসন করতেন। প্রথমে তিনি গুপ্ত সম্রাটের অধীনে একজন সামন্ত শাসনকর্তা ছিলেন। পরে সম্ভবত তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

গুপ্ত যুগের শাসনামলে বাংলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল। সে সময় বাংলাদেশে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। গুপ্ত শাসনাধীন বাংলাদেশ ছিল বেশ সমৃদ্ধ। ঐতিহাসিকদের মতামত বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, প্রাচীন বাংলা সমৃদ্ধশালী ছিল।

**সার-সংক্ষেপ**

আর্যদের আগমের আগেই বাংলায় মৌর্য বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২১ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে ভারতে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় রাজা অশোকের সময়। তখন এটা মৌর্যদের একটি প্রদেশ ছিল। তাদের সময়ে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সমৃদ্ধ ও শান্তিময় ছিল।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৩

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**এক কথায়/এক বাক্য উত্তর লিখুন :**

১. কোন সময়ে বাংলাদেশ এলাকায় 'গঙ্গারিডই' নামে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল?
২. কাদের আগমনের পূর্বেই বাংলায় মৌর্যদের রাজত্ব চলছিল?
৩. গ্রিক বীর আলেকজান্ডার কেন বাংলা আক্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করেছিল?
৪. গুপ্ত রাজ্য কোন এলাকা নিয়ে ছিল?
৫. কোন যুগে বাংলাদেশে সোনা-রুপার মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল?

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. মৌর্য শাসনামলের বাংলার অবস্থা লিখুন।
২. গুপ্ত বংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা কেমন ছিল?

## পাঠ-৪ : পাল পূর্ব যুগে বাংলা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ পাল পূর্ব যুগে বাংলার বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্রের বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ স্বাধীন গৌড় রাজের বর্ণনা দিতে পারবেন।

### ৪.১ পাল পূর্ব যুগে বাংলা

ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধেই ভারতের বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। দুর্ধর্ষ পাহাড়ি জাতি হূনদের আক্রমণে টুকরো টুকরো হয়ে যায় গুপ্ত সাম্রাজ্য। এ সুযোগে সমগ্র উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজবংশের উদ্ভব হয়। এভাবে গুপ্ত পরবর্তীকালে সমস্ত উত্তর ভারতব্যাপী যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল, বাংলাতেও তার ঢেউ এসে লাগে। এ অস্থিতিশীলতার সুযোগে বাংলাদেশে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। এর একটি ছিল প্রাচীন 'বঙ্গরাষ্ট্র' এবং দ্বিতীয় স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম গৌড়রাজ্য।

### ৪.২ স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্র

গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বঙ্গ জনপদে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজ্যকে ঐতিহাসিকরা স্বাধীন বঙ্গরাজ্য নামে আখ্যা দিয়েছেন। স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্রের প্রাচীন রাজারা তামার পাতে খোদাই করে বিভিন্ন ঘোষণা বা রাজকীয় নির্দেশ জারি করতেন। এগুলোকে বলা হতো তাম্র শাসন। স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্রের যুগে এরূপ সাতটি তাম্র শাসন পাওয়া গেছে। এসব থেকে জানা যায় যে, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব নামে তিনজন রাজা স্বাধীন বঙ্গরাজ্য শাসন করেছেন। উল্লিখিত তিন রাজা ৫২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেছিল। এক সময় বঙ্গ রাষ্ট্রের পতন ঘটে। ধারণা করা হয়, দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশের রাজা কীর্তি বর্মণের হাতে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের পতন ঘটেছিল। তবে কারো কারো মতে স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উত্থান ঘটলে বঙ্গরাজ্যের পতন ঘটে। স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের পতনের পেছনে কিছু সামন্ত রাজার উত্থানকেও দায়ী করা হয়। কারণ সপ্তম শতকের পূর্বেই দক্ষিণ বাংলার সমতট রাজ্যে ভদ্র, খড়গ, রাঢ় প্রভৃতি বংশের স্বাধীন সামন্ত রাজাদের উত্থান ঘটেছিল।

### ৪.৩ স্বাধীন গৌড়রাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে পরবর্তী গুপ্তবংশ নামে পরিচিত গুপ্ত উপাধি নেয়া রাজাগণ বাংলা, পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ ও মগধে ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন। বিভিন্ন কারণে গুপ্ত বংশের রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে মগধে শশাঙ্ক নামক এক খ্যাতিমান শাসক গৌড় রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেন। প্রাথমিক যুগে শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত রাজ মহাসেন গুপ্তের একজন মহাসামন্ত। ৬০৬ খ্রিস্টাব্দের আগে কোন এক সময় তিনি গৌড়ের স্বাধীন নরপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাথমিক সময়ে স্বাধীন গৌড় রাষ্ট্রের রাজা শশাঙ্ক দণ্ডভুক্তি রাজ্য, উড়িষ্যার উৎকল ও কঙ্গোগ রাজ্য এবং বিহারের মগধ রাজ্য জয় করে তার রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। পশ্চিমে তার রাজ্য বারানসী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কামরূপ রাজারাও শশাঙ্কের হাতে পরাজিত হন।

এরপর শশাঙ্ক উত্তর ভারত জয়ের চিন্তা করেন। উত্তর ভারতে এ সময় দুটো শক্তিশালী রাজ্য ছিল। যথা–
১. একটি পুষ্যভূতি রাজবংশের অধীনস্থ থানেশ্বর।
২. অন্যটি মৌখরীরাজবংশের অধীনে কান্য কুব্জ (কনৌজ)।
শশাঙ্ক গুপ্তদের চিরশত্রু মৌখরীদের পরাজিত করার সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হন। এজন্য তিনি মালব রাজ দেবগুপ্তের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন। শশাঙ্ক উত্তর ভারতে পৌঁছার আগেই দেবগুপ্তের হাতে মৌখরীরাজ গ্রহবর্মা পরাজিত ও নিহত হন।
দেবগুপ্ত এবার থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হন। সে সময় থানেশ্বরের রাজা ছিলেন রাজ্যবর্ধন। তিনি পথিমধ্যে দেবগুপ্তকে বাধা দেন। যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত ও নিহত হন। এরপর রাজ্যবর্ধন কনৌজের দিকে অগ্রসর হলে শশাঙ্কের মুখোমুখি হন। যুদ্ধে শশাঙ্কের জয় হয়। রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হাতে বন্দি হন। পরে তাকে হত্যা করা হয়।
রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর থানেশ্বরের পরবর্তী অধিপতি হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ সফল হতে পারেননি।
৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে শশাঙ্ক মৃত্যুবরণ করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ে কোন যোগ্য শাসক ছিলেন না। ফলে রাজ্যব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। এসময় পার্শ্ববর্তী রাজা হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মণের হাতে গৌড়রাজ্য ছিন্ন-

বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পাশাপাশি ভূ-স্বামীরা একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে ওঠে। বাংলার এই অরাজকতাপূর্ণ অবস্থাকে তাম্রশাসনে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হয়েছে।

এভাবে একশ বছর অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা চলার পর গৌড় রাজ্যের অরাজকতার অবসান ঘটে। ক্ষমতাসীন হয় পাল রাজবংশ।

ক্ষমতার বিবর্তনের ধারায় বাংলার ইতিহাস অগ্রসর হতে থাকে। শশাঙ্কের পর পর্যায়ক্রমে বাংলার ক্ষমতাসীন হন পাল রাজবংশ, সেন রাজবংশ ইত্যাদি। এভাবে এক পর্যায়ে ক্ষমতায় আবির্ভাব ঘটে মুসলিম শাসনের।

**সার-সংক্ষেপ**

খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন এটিই বাংলার প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন। এদেশবাসী ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, পশুপালন ও কারিগরি শিল্পে দক্ষ ছিল। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় গংগা তীরবর্তী অঞ্চলে গংগারিডই নামক একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পুণ্ড্রনগর ছিল এই প্রদেশের রাজধানী। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আমলে প্রায় সারা বাংলা গুপ্ত শাসনাধীনে ছিল। তখন বাংলা ছিল খুবই সমৃদ্ধশালী। গুপ্ত শাসনের অবসানের পর দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় বঙ্গ এবং পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় গৌড় নামক দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যের উত্থান ঘটে। বঙ্গ রাজ্যের তিনজন সার্বভৌম রাজা ছিলেন- গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব। গৌড় রাজ শশাঙ্ক ছিলেন প্রাচীন বাংলার প্রথম শক্তিশালী রাজা। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। তাঁর আমলে বাংলার সামরিক শক্তির প্রভাব উত্তর ভারতেও অনুভূত হয়েছিল। উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধনের সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয়। শশাঙ্ক গৌড়ের সার্বভৌম ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সময় বাংলার সুখ-সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ন ছিল।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৪

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**এক কথায় উত্তর দিন :**

১. কোন শতকে ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে?
২. কাদের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়?
৩. স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্র যুগের তিনজন রাজার নাম লিখুন।
৪. কোন রাজ্যের উত্থানে বঙ্গরাজ্যের পতন ঘটে?
৫. প্রাথমিক যুগে শশাঙ্ক কি ছিলেন?
৬. শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কি?
৭. শশাঙ্কের রাজ্য পশ্চিমে কোন অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?
৮. কোন সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়?
৯. বাংলার অরাজকতাপূর্ণ অবস্থাকে তাম্রশাসনে কি বলা হয়?
১০. বাংলার অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা কত বছর চলছিল?

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. পাল পূর্ব যুগের স্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্রের বিবরণ দিন।
২. পাল পূর্ব যুগের স্বাধীন গৌড় রাষ্ট্রের অবস্থা বর্ণনা করুন।

## পাঠ-৫ : পাল বংশের শাসনাধীনে বাংলা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ পাল রাজা গোপাল-এর শাসনকাল বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ ধর্মপালের শাসনকালের বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ দেবপাল-এর শাসনামলের বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ প্রথম মহীপালের শাসনামলের বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ দ্বিতীয় মহীপাল সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ রামপালের শাসনকাল বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ পাল বংশের পতন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৫.১ পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা

প্রাচীন বাংলার রাজবংশসমূহের তালিকায় পালবংশ বিখ্যাত একটি রাজবংশ। এই বংশই বাংলার সর্বপ্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ বলে ধারণা করা হয়। পাল রাজারা প্রায় চারশ বছর যাবৎ এদেশে রাজত্ব করেন। ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা গোপাল বাংলায় পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এক অরাজকতাপূর্ণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সামন্তরা গোপালকে ক্ষমতায় বসান। রাজা গোপালের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশই পাল বংশ নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

### ৫.২ গোপাল (৭৫৬-৭৮১ খ্রি.)

পাল বংশের স্থপতি হলেন রাজা গোপাল। ৭৫৬ সালে গোপাল শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়ে ৭৮১ সাল পর্যন্ত ২৫ বছর যাবৎ রাজত্ব করেন। গোপাল বরেন্দ্র অঞ্চলের এক প্রভাবশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতার নাম ছিল বপ্যট। গোপাল খ্যাতিমান যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ক্ষমতায় বসে শক্ত হাতে দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। ধীরে ধীরে সমস্ত অরাজকতার অবসান হয়। বাংলার উত্তর এবং পূর্ব অংশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা গোপাল অধিকার করতে পারেননি। পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। গোপাল বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারে মনোযোগ দিয়েছিলেন।

### ৫.৩ ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ খ্রি.)

পিতার মৃত্যুর পর ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। পাল রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। বাংলা ও বিহারে পাল শাসনের শক্ত ভিত্তি তৈরি করার কৃতিত্ব ধর্মপালের। এ সময় উত্তর ভারত অধিকার করার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল তিনটি বংশ। একটি বাংলার পাল বংশ অন্যটি রাজপুতনার গুর্জর-প্রতীহার বংশ এবং তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুট বংশ। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ' নামে পরিচিত।

ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ শুরু হয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে। প্রথম যুদ্ধ হয় ধর্মপাল ও প্রতীহার বংশের বৎসরাজের মধ্যে। এ যুদ্ধে পরাজিত হন ধর্মপাল। এর কিছুকাল পরেই দাক্ষিণাত্য থেকে এগিয়ে আসেন রাষ্ট্রকুট রাজা ধ্রুব ধারাবর্ষ। তিনি একে একে বৎসরাজ ও ধর্মপালকে পরাজিত করেন। ত্রিশক্তি সংঘর্ষে ধর্মপাল পরাজিত হলেও তার বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কারণ বিজয়ের পর রাষ্ট্রকুট রাজ দাক্ষিণাত্যে ফিরে গিয়েছিলেন। ফলে ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করেন। তিনি বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করেছিলেন। তাঁকে উপাধি দেয়া হয় 'উত্তরাপথ স্বামী'। এই উপাধি ছিল যথার্থ। বাংলার আর কোন রাজ্য উত্তর ভারত জুড়ে ক্ষমতা বিস্তার করতে পারেননি। কোন কোন সূত্র মতে ধর্মপাল নেপালও জয় করেছিলেন। এর পরেও উত্তর ভারতে বৎসরাজ ও রাষ্ট্রকুট রাজদের সাথে যুদ্ধ করে ধর্মপালকে জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে হয়।

ধর্মপাল একদিকে যেমন ছিলেন বিজয়ী বীর অন্যদিকে তেমনি ছিলেন জনপ্রিয় শাসক। তাঁর চেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ভাগলপুরের ২৪ মাইল পূর্ব দিকে তিনি একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। বিহারটির নাম দেওয়া হয় বিক্রমশীল বিহার। ধর্মপালের দ্বিতীয় নাম বিক্রমশীল। এই নাম থেকেই বিহারটির নামকরণ হয়। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর বৌদ্ধবিহারটিও ধর্মপাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

নিজে বৌদ্ধ হলেও হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি তিনি উদার ছিলেন। হিন্দু ধর্ম তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। একজন ব্রাহ্মণকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ দিয়েছিলেন। ধর্মপাল প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব করেন।

### ৫.৪ দেবপাল (৮২১-৮৬১ খ্রি.)

পিতার মৃত্যুর পর দেবপাল সাম্রাজ্যের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। পিতার মতো তিনিও দক্ষতার সাথে রাজ্য বিস্তার করেন। উত্তর ভারতে প্রতীহার ও রাষ্ট্রকুট রাজাদের সাথে যুদ্ধে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন তার দুই ব্রাহ্মণমন্ত্রী দর্ভপাণি ও কেদার মিশ্র। উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চল তাঁর অধিকারে এসেছিল। উড়িষ্যা ও কামরূপ রাজার উপরও তিনি শক্তি প্রয়োগ করে সফল হয়েছিলেন। দেবপালের সময়েই পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়েছিল।

গোপাল অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে পাল রাজত্বের উত্থান ঘটিয়েছিলেন। ধর্মপাল ও দেবপাল এই সাম্রাজ্যের গৌরব বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। বাংলার গৌরব উত্তর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ৮৬১ খ্রিস্টাব্দে দেবপালের মৃত্যু হয়। তাঁর পর পাল সাম্রাজ্যে দুর্যোগ চলে একটানা দীর্ঘ দিন। ৮৬১ থেকে ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল রাজত্ব করেন। এরা সবাই ছিলেন দুর্বল শাসক। তাঁদের দুর্বলতার কারণে পাল সাম্রাজ্যের অঙ্গহানি হয়। উত্তর-পশ্চিম বাংলায় কাম্বোজ নামে এক রাজবংশের উত্থান ঘটে।

### ৫.৫ প্রথম বিগ্রহপাল (৮৬১-৯৮৯ খ্রি.)

দেবপালের মৃত্যুর পর প্রথম বিগ্রহপাল থেকে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল (৮৬১-৯৮৯) পর্যন্ত পাল রাজ্যকে বেশি দুর্বল দেখা যায়। প্রথম বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণ পাল দীর্ঘকাল (৮৬৬-৯২০) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এরপর একে একে পাল সিংহাসনে বসেন রাজ্যপাল (৯২০-৯৫২), দ্বিতীয় গোপাল এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপাল।

### ৫.৬ প্রথম মহীপাল (৯৯৫-১০৪৯ খ্রি.)

দেবপালের মৃত্যুর পর পালবংশের রাজত্বে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। রাজা ১ম মহীপাল সেসব বিপর্যয় রোধ করে আনুমানিক ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় অর্ধশত বছর যাবৎ রাজত্ব করে পাল বংশের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি সুসংহত করার চেষ্টা করেন। ১০৪৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র ১ম মহীপাল পাল সাম্রাজ্যের গৌরব কিছুটা ফিরিয়ে আনেন। তিনি উত্তর ও পশ্চিম বাংলা থেকে কাম্বোজদেরকে বিতাড়িত করেন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান শাসক। তাঁর শাসনামলে অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ সাধিত হয়। বাংলার অনেক কীর্তির সাথে ১ম মহীপালের নাম জড়িয়ে রয়েছে। 'মহীপাল দিঘী', 'মহিশুর', 'মহীসন্তোষ', 'মহীপালের গীত' ইত্যাদি ১ম মহীপালের কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে।

১ম মহীপালের মৃত্যুর পর যোগ্য শাসকের অভাবে অতি দ্রুত পাল সাম্রাজ্যের পতন হয়। পতন যুগের পাল রাজাদের মধ্যে দ্বিতীয় মহীপাল ও রামপালের নাম উল্লেখযোগ্য।

### ৫.৭ দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭৫-১০৮০খ্রি.)

প্রথম মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নয়পাল ও পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল একে একে রাজা হন। তাঁদের দুর্বলতার সুযোগে বাইরের আক্রমণকারীরা বারবার আক্রমণ করে পাল সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তৃতীয় বিগ্রহপালের পর রাজা হন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল। তাঁর সময় উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলে বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন দিব্যক। দিব্যক ছিলেন কৈবর্ত নেতা। এই জন্য এই বিদ্রোহ কৈবর্ত বিদ্রোহ বা বরেন্দ্র বিদ্রোহ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহীদের দমন করতে গিয়ে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। দিব্যক বরেন্দ্র অঞ্চলের রাজা হন।

দ্বিতীয় মহীপালের পর রাজা হন তার ছোট ভাই শূরপাল। তিনি মাত্র দু'বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পর রাজা হন সর্বকনিষ্ঠ ভাই রামপাল।

### ৫.৮ রামপাল (১০৮২-১১২৪ খ্রি.)

রামপাল রাজা হয়েই বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। এই সময় কৈবর্তদের নেতা ছিলেন ভীম। প্রথম চেষ্টায় রামপাল ব্যর্থ হন। নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য রামপাল পার্শ্ববর্তী অনেক রাজার সাহায্য গ্রহণ করেন। তাঁর মামা রাষ্ট্রকুট রাজা মথন তাঁকে অর্থ, অস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। যুদ্ধে ভীম পরাজিত ও বন্দি হন। পরে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। বরেন্দ্র অঞ্চলের উপর রামপালের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে তিনি কামরূপ এবং উড়িষ্যার উপরও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিত" নামে রামপালের জীবনী লিখেন। তা থেকে আমরা রামপালের জীবনকথা জানতে পারি। তাঁর মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের গৌরব দ্রুত বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। রামপালকে পালবংশের শেষ 'মুকুটমণি' বলা যায়।

রামপালের পর কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল ও মদনপাল একে একে রাজা হন। তাঁরা সবাই ছিলেন শাসক হিসেবে অত্যন্ত দুর্বল। যুদ্ধ-বিগ্রহে পাল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অবশেষে সেনবংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে পাল রাজত্বের অবসান ঘটে।

### ৫.৯ পাল বংশের পতন

রাজা রামপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। অল্পদিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যায় পাল রাজবংশ। সমাপ্ত হয় দীর্ঘ ৪শ বছরের পাল শাসন। এভাবে বাংলার ক্ষমতার মসনদে অন্য একটা রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হবার পথ সৃষ্টি হয়ে যায়।

উত্থান আর পতন ইতিহাসের চিরন্তন ধারা। একদা মহাপ্রতাপে পাল রাজবংশ বাংলার মসনদে ক্ষমতাসীন হয়েছিল। অতঃপর ইতিহাসের অমোঘ ধারায় মিলিয়ে যায় তাদের রাজত্ব। পাল বংশের পতনের পর বাংলায় সেন বংশের উত্থান ঘটে।

**সার-সংক্ষেপ**

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশ বছর বাংলায় অরাজকতা চলে। এই অরাজক অবস্থাকে বলা হয় 'মাৎস্যন্যায়'। গোপাল নামক একজন শক্তিশালী লোক এই অরাজকতার অবসান ঘটান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম পালবংশ। পালবংশের রাজারা প্রায় চারশ বছর রাজত্ব করেন। এযুগে বাংলা একটি স্থিতিশীল ও ঐশ্বর্যশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। গোপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময় উত্তর ভারতের আধিপত্য নিয়ে গুর্জর প্রতিহার, রাষ্ট্রকুট ও পালবংশের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি বাংলার শক্তিকে উত্তরভারত পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হন। ধর্মপালের পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র দেবপাল। তাঁর শাসনামলে পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়। দেবপালের পর পাল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে পালবংশের গৌরব পুনরায় ফিরে আসে। কিন্তু তা ছিল স্বল্পস্থায়ী। দ্বিতীয় মহীপাল ও রামপালের রাজত্বকালে বরেন্দ্র অঞ্চলে কৈবর্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। রামপাল কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করে বরেন্দ্র অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। তিনি পালবংশের শেষ মুকুটমণি। অবশেষে সেনবংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে পাল শাসনের অবসান ঘটে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৫

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন :**

১. মাৎস্যন্যায় কথাটির অর্থ কি?
   ক. মাছের মতো খ. শান্তির যুগ
   গ. অরাজকতা ঘ. যুদ্ধবিগ্রহ

২. কে মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটান?
   ক. শশাঙ্ক খ. ভাস্করবর্মণ
   গ. হর্ষবর্ধন ঘ. গোপাল

৩. কাকে 'উত্তরাপথ স্বামী' বলা হতো?
   ক. গোপালকে খ. ধর্মপালকে
   গ. দেবপালকে ঘ. প্রথম মহীপালকে

৪. সোমপুর বৌদ্ধ বিহার কে তৈরি করেন?
   ক. শশাঙ্ক খ. ধর্মপাল
   গ. দেবপাল ঘ. রামপাল

৫. পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় কোন রাজবংশের উত্থান ঘটে?
   ক. কাম্বোজ খ. চন্দেলা
   গ. কলচুরি ঘ. রাষ্ট্রকুট

৬. কৈবর্ত বিদ্রোহ 'কার' নেতৃত্বে হয়?
   ক. মথনের নেতৃত্বে খ. বিজয়সেনের নেতৃত্বে
   গ. দিব্যকের নেতৃত্বে ঘ. দ্বিতীয় মহীপালের নেতৃত্বে

৭. রামচরিতের লেখক কে?
   ক. সন্ধ্যাকর নন্দী খ. হলায়ুধ
   গ. জয়দেব ঘ. বল্লালসেন

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

পিতার মৃত্যুর পর ধর্মপাল —— সিংহাসনে বসেন। পাল রাজাদের মধ্যে —— ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। —— ও —— পাল শাসনের শক্ত ভিত্তি তৈরি করার কৃতিত্ব ধর্মপালের। এ সময় উত্তর ভারত অধিকার করার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল —— বংশ। একটি বাংলার পাল বংশ অন্যটি ———— বংশ এবং তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের —— বংশ। ইতিহাসে এই যুদ্ধ '———' নামে পরিচিত।

**গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. ধর্মপালের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।
২. শাসক হিসেবে দেবপালের মূল্যায়ন করুন।
৩. প্রথম মহীপালের শাসনামলের বর্ণনা দিন।
৪. রামপালের সময় কৈবর্ত রাজা কে ছিলেন? রামপাল কিভাবে তাঁকে দমন করেন?

## পাঠ-৬ : দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজবংশসমূহ

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ পাল রাজত্বের যুগে বাংলার স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ও অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সমস্ত রাজবংশ গড়ে উঠেছিল, তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

### ৬.১ পাল রাজত্বের যুগ

পাল রাজারা বাংলা, বিহার থেকে শুরু করে উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চলের উপর ক্ষমতা বিস্তার করলেও সমগ্র বাংলা সকল সময়ের জন্য তাঁদের অধিকারে রাখতে পারেননি। পাল যুগের বেশিরভাগ সময় জুড়েই বঙ্গ বলে পরিচিত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বিভিন্ন স্বাধীন রাজবংশের অধিকারে ছিল। অর্থাৎ গুপ্ত যুগের পর থেকে সেন বংশের উদ্ভব কাল পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা খুব অল্প সময়ের জন্যই উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার সাথে জড়িত ছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ করে যে সকল রাজবংশ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো :

### ৬.২ খড়্গ বংশ

সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন মগধ ও গৌড়ে পরবর্তী গুপ্ত বংশের রাজাগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখনই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পত্তন হয়। এই রাষ্ট্রের রাজাগণ ছিলেন খড়্গ বংশের। খড়্গদের রাজধানীর নাম কর্মান্ত-বাসক। এটি সম্ভবত কুমিল্লা জেলার 'বড়কামতার' প্রাচীন নাম। ত্রিপুরা ও নোয়াখালি অঞ্চলের উপর খড়্গদের অধিকারে ছিল।

### ৬.৩ দেব বংশ

খড়্গ বংশের শাসনের পর অষ্টম শতকের মাঝামাঝি একই অঞ্চলে দেববংশের উদ্ভব হয়। দেববংশের চারজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এরা হলেন- শ্রী শান্তিদেব, শ্রী বীরদেব, শ্রী আনন্দদেব ও শ্রী ভবদেব। রাজারা প্রত্যেকেই বড় বড় উপাধি নিয়ে প্রচার করতে চেয়েছিলেন যে তাঁরা খুব শক্তিধর। এসব উপাধি হচ্ছে- পরম সৌগত, পরম ভট্টারক, পরমেশ্বর, মহারাজাধিরাজ ইত্যাদি। শক্তিশালী দেব রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁদের রাজধানী ছিল দেবপর্বতে। কুমিল্লার নিকট ময়নামতির দক্ষিণে ছিল এই দেবপর্বত। সমগ্র সমতট অঞ্চল জুড়ে দেবরাজাদের রাজত্ব ছিল। দেবরাজা আনন্দের রাজধানীতে 'আনন্দবিহার' বলে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করা হয়। আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেবরাজাদেব শাসন চালু থাকে।

### ৬.৪ কান্তিদেবের স্বাধীন রাজ্য

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার একটি অংশ ছিল হরিকেল। এখানে কান্তিদেব নামে এক রাজা নবম শতকে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। কান্তিদেবের পিতার নাম ধনদত্ত ও পিতামহের নাম ভদ্রদত্ত। সিলেট কান্তিদেবের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজ্যটির রাজধানীর নাম বর্ধমানপুর। বর্ধমানপুর ঠিক কোথায় তা এখন নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই। কান্তিদেবের বংশের অন্য পুরুষদের কথা জানা যায় না। তবে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ। কান্তিদেব বা তাঁর বংশের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয় চন্দ্রবংশ। এ থেকে ধারণা করা হয়, দেববংশ ও চন্দ্রবংশের মাঝামাঝি সময়ে কান্তিদেব ও তাঁর বংশধরেরা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় রাজত্ব করেন।

### ৬.৫ চন্দ্র রাজবংশ

পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় সবচেয়ে শক্তিধর রাজবংশ হচ্ছে চন্দ্রবংশ। খ্রিস্টীয় দশম শতকের শুরুতেই চন্দ্রবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় দেড়শ বছর এই বংশ শাসনকার্য পরিচালনা করে। এই বংশের প্রথম শক্তিধর রাজার নাম ত্রৈলোক্যচন্দ্র। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। কুমিল্লার লালমাই পাহাড়কে সে যুগে বলা হতো রোহিতাগিরি। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পিতা ছিলেন সুবর্ণচন্দ্র এবং পিতামহ ছিলেন পূর্ণচন্দ্র। চন্দ্রবংশের রাজাদের ধর্মও ছিল বৌদ্ধ। শক্তিধর ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেল দখল করেছিলেন। এই সাথে তিনি চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল ও এর চারপাশের অঞ্চল) জয় করেন। একে একে তাঁর অধিকারে আসে বঙ্গ ও সমতট। ত্রৈলোক্যচন্দ্র প্রায় ত্রিশ বছর (আনুমানিক ৯০০-৯৩০ খ্রি.) শাসন করেন।

পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন শ্রীচন্দ্র। শ্রীচন্দ্র বংশের গৌরব আরও বৃদ্ধি করেন। তিনি বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে রাজধানী গড়ে তোলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'পরমেশ্বর' 'পরম ভট্টারক' 'মহারাজাধিরাজ'। পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ছাড়াও শ্রীচন্দ্র উত্তর-পূর্বে কামরূপ ও উত্তরে গৌড়ের উপরও শক্তি বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীচন্দ্র প্রায় পয়তাল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। (আনুমানিক ৯৩০-৯৭৫ খ্রি.) এর পর সিংহাসনে বসেন শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্র (আনুমানিক ৯৭৫-১০০০

খ্রি.)। কল্যাণচন্দ্রের সময় চন্দ্রবংশের গৌরব অক্ষণ্ন ছিল। কল্যাণচন্দ্রের পুত্র লড়হচন্দ্রের রাজত্বকালেও (আনুমানিক ১০৪৫-১০২০ খ্রি.) এই গৌরব ম্লান হয়নি।
শেষ চন্দ্ররাজা ছিলেন গৌবিন্দচন্দ্র। তিনি লড়হচন্দ্রের পুত্র। তাঁর রাজত্বকালে (আনুমানিক ১০২০-১০৪৫ খ্রি.) বাইরের আক্রমণের আঘাত আসে। চোল সম্রাট রাজেন্দ্রচোল ও কলচুরিরাজ কর্ণ বঙ্গ আক্রমণ করলে চন্দ্রবংশের পতন হয়।

**৬.৬ বর্ম রাজবংশ**

একাদশ শতকের শেষ দিকে পাল শক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল; তখন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্ম বলে এক রাজবংশের উত্থান ঘটে। ধারণা করা হয় কলচুরিরাজ কর্ণের সাথে বর্মরা এসেছিল। বর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মা। উত্তর বাংলায় যখন দিব্যকের নেতৃত্বে কৈবর্ত বিদ্রোহ চলছিল, তখন তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। জাতবর্মার পর পুত্র হরিবর্মা রাজা হন। তিনি একটানা ৪৬ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। পাল রাজাদের সাথে তিনি বন্ধুত্ব রক্ষা করে নাগাভূমি ও আসাম পর্যন্ত ক্ষমতা বিস্তৃত করেন। হরিবর্মার পর তার এক পুত্র রাজা হলেও এ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। এরপর একে একে ক্ষমতায় বসেন সামলবর্মা ও ভোজবর্মা। এর পরই বর্ম রাজবংশের পতন হয়। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সেনবংশের রাজা বিজয়সেন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা দখল করেন।

**সার-সংক্ষেপ**

গুপ্ত যুগের পর থেকে শুরু করে সেন রাজত্বের সূচনাকাল পর্যন্ত বেশিরভাগ সময় জুড়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা স্বাধীন ছিল। এখানে বেশকিছু রাজবংশ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল। এগুলোর মধ্যে খড়গবংশ, দেববংশ, কান্তিদেবের রাজ্য, চন্দ্রবংশ ও বর্মবংশের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। কোন কোন রাজবংশ বেশ শক্তিশালী ছিল। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সেনবংশের রাজা বিজয়সেন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা দখল করেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৬

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন :**

১. কর্মান্ত-বসাক কি?
ক. দেবরাজার নাম খ. খড়গদের রাজধানী গ. একটি স্বাধীন রাজ্য ঘ. ময়নামতির একটি পাহাড়

২. আনন্দ বিহার কোন বংশের রাজত্বকালে নির্মিত হয়?
ক. খড়গবংশ খ. দেববংশ গ. চন্দ্রবংশ ঘ. বর্মবংশ

৩. দেবপর্বত কোথায় অবস্থিত?
ক. গৌড়ে খ. বরেন্দ্রে গ. সিলেটে ঘ. কুমিল্লায়

৪. চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
ক. সুবর্ণচন্দ্র খ. পূর্ণচন্দ্র গ. শ্রীচন্দ্র ঘ. ত্রৈলোক্যচন্দ্র

৫. রোহিতগিরি কি?
ক. লালমাই পাহাড় খ. দেবপর্বত গ. চন্দ্রদ্বীপ ঘ. হরিকেল

৬. শেষ চন্দ্র রাজার নাম কি ছিল?
ক. লড়হচন্দ্র খ. কল্যাণচন্দ্র গ. শ্রীচন্দ্র ঘ. গোবিন্দচন্দ্র

৭. বর্মরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
ক. বজ্রবর্মা খ. জাতবর্মা গ. হরিবর্মা ঘ. ভোজবর্মা

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার দেববংশের শাসনকাল আলোচনা করুন।
২. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার চন্দ্র রাজাদের কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।

## পাঠ-৭ : সেন বংশের শাসনাধীনে বাংলা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ সেন বংশের পরিচয় বলতে পারবেন।
☞ বিজয় সেনের রাজত্বকাল বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ বল্লাল সেনের রাজত্বকালের বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ সেন বংশের পতন সম্বন্ধে আলোকপাত করতে পারবেন।

### ৭.১ পরিচয়

ক্ষমতা দখলের পালাবদলের ধারাবাহিকতায় বাংলার মসনদে আগমন ঘটেছিল সেন বংশের। সেনরা সুদূর দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট থেকে এদেশে আসেন। পাল বংশের শেষ রাজা মদন পালের অযোগ্যতার ফলে দেশে দেখা দেয় অরাজকতা এবং সেন বংশের আবির্ভাবে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে সেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর বাংলার সামন্তচক্রের বিদ্রোহের কারণে সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। তাদের দুর্বলতার সুযোগে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়সেন ধীরে ধীরে ক্ষমতা সুসংহত করেন। পাল সম্রাট মদন পালের রাজত্বকালে সেন বংশ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়।

### ৭.২ বিজয় সেনের রাজত্বকাল (১০৯৮-১১৬০ খ্রি.)

১০৯৮ সালে বিজয় সেন সিংহাসন লাভ করেন। সিংহাসন লাভের পর বিজয় সেন নিম্নলিখিত বিজয় অভিযানসমূহ পরিচালনা করেন :

বিজয় সেন শূর বংশীয় রাজকন্যা বিলাস দেবীকে বিবাহ করেন। এ সময় রাঢ় ছিল শূর বংশীয়দের অধীনে। বিজয় সেন বিবাহের ফলে রাঢ় এলাকায় নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান।

রাঢ় দখলের পর বিজয় সেন বর্মবংশীয় রাজাকে পরাজিত করে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলা অধিকার করেন।

পাল রাজা মদন পালের শাসনামলে বিজয় সেন উত্তর-পশ্চিম বাংলা আক্রমণ করে সেখানে আপন প্রভুত্ব কায়েম করেন।

বিজয় সেন ছিলেন বীরযোদ্ধা। তিনি কামরূপরাজ, কলিঙ্গরাজ ও মিথিলার নান্যদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এভাবে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করে বিজয় সেন প্রায় সমগ্র বাংলায় বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে বিজয় সেন মৃত্যুবরণ করেন। বিজয় সেন ছিলেন শৈব ধর্মের অনুসারী। শৈবধর্ম হিন্দু ধর্মেরই একটি শাখা। তিনি বেশ কিছু উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। যেমন- 'পরম মাহেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, অরিরাজ নিশঙ্ক শঙ্কর' ইত্যাদি। তার প্রথম রাজধানী ছিল হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে এবং দ্বিতীয় রাজধানী ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে।

### ৭.৩ বল্লাল সেনের রাজত্বকাল (১১৬০-১১৭৮ খ্রি.)

বিজয় সেনের পর ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে পুত্র বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। বল্লাল সেনও ছিলেন পিতার মতো দক্ষ যোদ্ধা। যোগ্যতার সাথে রাজত্ব পরিচালনা করতে থাকেন তিনি।

**রাজ্য বিস্তার**

সিংহাসনে আরোহণের পর রাজা বল্লাল সেন রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি মগধ ও মিথিলা জয় করেন। তার শাসনামলে সমগ্র বাংলাদেশের ওপর সেন বংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

**সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন**

রাজা বল্লাল সেন বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দু'খানি পুস্তক রচনা করেছিলেন। তিনি এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি শৈবধর্ম প্রচারের বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি 'অরিরাজ নিশঙ্ক শঙ্কর' উপাধিও গ্রহণ করেন। শৈবধর্ম প্রচারের জন্য তিনি আরাকান, কামরূপ, নেপাল, উড়িষ্যা ও মগধে দূত পাঠান। তাঁর রাজত্বকালে সূফী বাবা আদম শহীদ ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। বল্লাল সেনের সাথে রাজধানী বিক্রমপুরে সূফীর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সূফী শহীদ হয়েছিলেন। শেষ বয়সে তিনি পুত্র লক্ষ্মণ সেনের হাতে রাজত্বের ভার ছেড়ে দিয়ে ধর্ম সাধনায় দিন কাটান।

রাজা বল্লাল সেন পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ন রাখেন। জ্ঞানী ও পণ্ডিত হিসেবেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১৮ বছর কাল রাজত্ব করেছিলেন।

### ৭.৪ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল (১১৭৮-১২০৬ খ্রি.)

রাজা লক্ষ্মণ সেন তার পিতার পর ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সেন বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন। লক্ষ্মণ সেন অনেকগুলো বিজয় অভিযান পরিচালনা করে তার রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান। তিনি গৌড়, কলিঙ্গ ও কামরূপ রাজাদেরকে পরাজিত করেন। কাশী ও প্রয়াগ জয় করে তিনি সেখানে একটি বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

পিতার মতো লক্ষ্মণ সেন একজন সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। তিনি তার পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুত সাগর' সমাপ্ত করেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মিলনস্থল ছিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হলায়ুদ তার প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ লক্ষ্মণ সেনের দানশীলতা ও অন্যান্য গুণাবলীর প্রশংসা করেন।

### ৭.৫ সেন বংশের পতন

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলিম শক্তি উত্তর ভারত থেকে বাংলার দিকে অগ্রসর হয়। বৃদ্ধ বয়সে লক্ষ্মণ সেন দ্বিতীয় রাজধানী নদীয়ায় বসবাস করছিলেন। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী নদীয়া আক্রমণ করেন।

নদীয়ায় পরাজিত হয়ে লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে আসেন পূর্ব বাংলায়। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা মুসলিম অধিকারে চলে যায়। লক্ষ্মণ সেন আরো দু'বছর রাজত্ব করে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। যদিও এর পরে আরো কিছুকাল পূর্ব বাংলায় সেন শাসন চলছিল, তবুও বলা চলে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় সেন শাসনের অবসান ঘটে।

**সার-সংক্ষেপ**

প্রাচীন বাংলার শেষ শক্তিশালী রাজবংশ ছিল সেনবংশ। বাংলা ও বাংলার বাইরের কিছু অংশ অধিকার করে সেন রাজারা এক বিরাট রাজত্ব গড়ে তুলেছিলেন। সুদূর কর্ণাট থেকে এসে এই ব্রহ্মা-ক্ষত্রিয় রাজারা পাল রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে এদেশে সেন শাসনের সূত্রপাত করেছিলেন। বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের মাধ্যমে সেন শাসনের গৌরব বিকশিত হয়। শুধু রাজ্য শাসনেই নয়, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে সেনদের যথেষ্ট সুনাম ছিল। দীর্ঘদিন শাসন করার পর ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলমান শক্তির হাতে সেনদের পতন ঘটে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৭

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**এক কথায় উত্তর দিন :**

১. সেনরা কোথা থেকে এদেশে এসেছিল?
২. সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি?
৩. বিজয়সেন শূর বংশীয় কোন রাজকন্যাকে বিয়ে করেন?
৪. কার আমলে উত্তর-পশ্চিম বাংলায় সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়?
৫. বিজয়সেনের প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল?
৬. বিজয়সেন কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
৭. কার শাসনামলে সমগ্র বাংলাদেশ সেন রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়?
৮. বল্লালসেনের দুটি গ্রন্থের নাম কি লিখুন?
৯. বল্লালসেনের সাথে কোন সূফীর যুদ্ধ হয়?
১০. বল্লালসেন কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?
১১. নদীয়া কোন রাজার রাজধানী ছিল?
১২. লক্ষ্মণসেন কার কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে পূর্ব বাংলায় আসেন?

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. সেন বংশের পরিচয় দিন।
২. বিজয়সেন সম্বন্ধে টীকা লিখুন।
৩. বল্লালসেনের রাজত্বকালের বিবরণ দিন।
৪. লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের বিবরণ দিন।
৫. সেন বংশের পতনের কথা লিখুন।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৪

**বিশদ উত্তরমূলক প্রশ্ন**

১. প্রাচীন বাংলার জনপদসমূহের বিবরণ দিন।
২. বাংলা নামের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত লিখুন।
৩. মৌর্য ও গুপ্ত শাসনামলে বাংলার অবস্থা বর্ণনা করুন।
৪. পাল-পূর্ব যুগে বাংলার বিবরণ দিন।
৫. পাল বংশের শাসনামলে বাংলার অবস্থা বর্ণনা করুন।
৬. গোপাল ও ধর্মপালের রাজত্বকাল বর্ণনা করুন।
৭. দেবপাল, প্রথম মহীপাল, দ্বিতীয় মহীপাল ও রামপালের রাজত্বকালের বিবরণ দিন।
৮. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজবংশসমূহের বিবরণ দিন।
৯. বিজয়সেন, বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের বর্ণনা দিন।

ইউনিট ৫

# ইসলামের অভ্যুদয় ও ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

## ভূমিকা

অজ্ঞতা, অনাচার আর হানাহানিতে ডুবে যাওয়া আরব ভূমিতে আবির্ভাব ঘটে ইসলামের। ইসলাম ধর্মের প্রচারক হযরত মুহম্মদ (স)। নবীর মৃত্যুর পর খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে পৃথিরীর বিভিন্ন অংশে। খলিফাগণ নতুন প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্য পরিচালনার জন্য একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মুসলিম আধিপত্য সম্প্রসারণে যে অভিযান শুরু হয় তার ধারাবাহিকতায় ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুদেশ জয় করেন। এভাবে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের পথ তৈরি হয়। এর প্রায় তিনশ বছর পর গজনীর সুলতান মাহমুদ ভারত আক্রমণ করেন। দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে মুহম্মদ ঘুরী ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহ অধিকার করেন এবং উপমহাদেশে আফগান শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করেন।

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ–

- ➔ পাঠ ১ : হযরত মুহম্মদ (স) ও ইসলাম
- ➔ পাঠ ২ : খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসন
- ➔ পাঠ ৩ : ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা
- ➔ পাঠ ৪ : বাংলায় মুসলিম আগমন
- ➔ পাঠ ৫ : বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয় ও মুসলিম শাসনের সূত্রপাত
- ➔ পাঠ ৬ : বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠা
- ➔ পাঠ ৭ : ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনাধীনে বাংলা
- ➔ পাঠ ৮ : রাজা গণেশ ও পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন
- ➔ পাঠ ৯ : হুসেন শাহী বংশের শাসনাধীনে বাংলা

## পাঠ-১ : হযরত মুহম্মদ (স) ও ইসলাম

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে আরবের অবস্থা কেমন ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ হযরত মুহম্মদ (স) এর জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
☞ হযরত মুহম্মদ (স) এর নেতৃত্বে মক্কা ও মদীনায় ইসলাম প্রচার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

### ১.১ ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে আরবের অবস্থা

বিশ্ব ইতিহাসে মধ্যযুগকে বলা হয় অন্ধকার যুগ। প্রাচীন যুগে পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল নগর সভ্যতা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চমৎকার উন্নতি ঘটেছিল সে যুগে। অথচ মধ্যযুগে এসে মানুষের অগ্রগতি যেন থেমে গেল। এই হতাশার যুগে এশিয়ার আরব ভূমিতে জ্বলে উঠল আশার আলো। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে 'ইসলাম' নামে সত্য ধর্মের বাণী নিয়ে এলেন হযরত মুহম্মদ (স)। ইসলামের বাণীতে ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথা, সাম্যের কথা। তাই দ্রুত ইসলামের বিস্তার ঘটতে থাকল। ইসলাম বিস্তারের এই ঢেউ এসে লাগে ভারতবর্ষেও। এরই পথ ধরে ত্রয়োদশ শতক থেকে এদেশে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ভারতবর্ষ ও বাংলায় মুসলমানদের শাসনকাল সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে ইসলাম কিভাবে এলো তা জানা প্রয়োজন।

### ১.২ ইসলামের উৎপত্তির পূর্বকথা

হযরত মুহম্মদের (স) জন্মের আগে আরবের মানুষেরা মূর্তি পূজা করত। তখন আরবে কোন রাষ্ট্র ছিল না। আরব দেশ অনেক ছোট ছোট গোত্রে বিভক্ত ছিল। গোত্রগুলো সারাক্ষণ একে অন্যের সাথে ঝগড়া-বিবাদে মেতে থাকত। অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ ছিল সমাজ জীবন। মরুভূমিতে বসবাসকারী অধিকাংশ আরবদের বলা হতো বেদুঈন। মেষপালন করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত।

মক্কা ছিল এ যুগে আরবদের প্রধান নগরী। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এখানে অনেক লোক সমাগম হতো। তবে মক্কার বিশেষ গুরুত্ব ছিল 'কাবা' গৃহের জন্য। কাবাঘর সে যুগে মূর্তি পূজারী আরবদের জন্য ছিল খুব পবিত্র। এই ঘরে রাখা ছিল অনেক মূর্তি আর কালো একখণ্ড পাথর। এই পবিত্র ঘর দেখাশোনা করত মক্কার কুরাইশ বংশের লোকেরা। তখন আরবদের নিকট কুরাইশ বংশের মর্যাদা ছিল অনেক বেশি। হানাহানি আর অন্যায়-অবিচারের এই যুগকে বলা হতো 'আইয়্যামে জাহিলিয়াহ্' অর্থাৎ 'অন্ধকার যুগ'।

### ১.৩ হযরত মুহম্মদ (স) ও ইসলাম

মক্কার এই কুরাইশ বংশেই জন্ম নিয়েছিলেন ইসলামের নবী হযরত মুহম্মদ (স)। তাঁর জন্ম তারিখ ছিল ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট সোমবার। জন্মের আগেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ মারা যান। শৈশবে তিনি মা আমিনাকেও হারান। তাই তাঁর লালন-পালনের ভার নেন তাঁর দাদা আব্দুল মোত্তালিব। আব্দুল মোত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর লালন-পালনের ভার পড়ে তাঁর চাচা আবু তালিবের উপর।

ছোটবেলা থেকেই হযরত মুহম্মদ (স) তাঁর চরিত্রের গুণে সবার প্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি অমায়িক ব্যবহার করতেন সবার সাথে। কখনও মিথ্যা বলতেন না। তাঁর উদারতা ও বুদ্ধিমত্তা সবাইকে আকৃষ্ট করত। তাই তখন মক্কার মানুষ হযরতকে 'আল-আমিন' বলে ডাকত। আল-আমিন শব্দের অর্থ সত্যবাদী। চাচার ব্যবসায়ের কাজে তরুণ বয়সেই মুহম্মদ (স) কে বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হয়েছিল। তাই তিনি বিভিন্ন জাতি ও ভাষার সাথে পরিচিত হন। পঁচিশ বছর বয়সে খাদিজা নামে মক্কার এক ধনী মহিলাকে তিনি বিয়ে করেন।

শৈশব থেকে মুহম্মদ (স) মূর্তি পূজা পছন্দ করতেন না। আরবদের হানাহানি আর অনাচার তাঁকে কষ্ট দিত। তাই অবসর পেলেই তিনি মক্কার অদূরে হেরা নামে এক পাহাড়ের গুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এভাবে অনেক বছর কাটে। তাঁর বয়স যখন ৪০ বছর তখন একদিন ধ্যান ভাঙ্গে আল্লাহর বাণীতে। আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর উপর নির্দেশ আসে নতুন এক ধর্ম প্রচার করার জন্য। এই বাণীকে বলা হয় 'ওহী'। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নির্দেশ নিয়ে এমন অনেক ওহী আসে। পরবর্তীতে এই ওহীগুলো একত্রিত করে যে গ্রন্থ লেখা হয় তাই 'কুরআন' নামে পরিচিত। আর এই নতুন ধর্মের নাম হয় 'ইসলাম'। ইসলামের মূল কথা হচ্ছে- আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রভু নেই। শুধুমাত্র তাঁরই উপাসনা করতে হবে, আর হযরত মুহম্মদ (স) হচ্ছেন আল্লাহরই প্রেরিত প্রতিনিধি অর্থাৎ 'রাসুল'। যিনি একথা বিশ্বাস করে কুরআনের নিয়ম মতো জীবন যাপন করেন তিনিই হচ্ছেন মুসলমান।

হযরত মুহম্মদ (স) ওহী লাভের পর প্রথম তিন বছর গোপনে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে ইসলাম প্রচার করেন। পরে আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। এবার আসে বিপত্তি। দীর্ঘদিন থেকে গোঁড়ামী আর কুসংস্কারে অন্ধ ছিল মক্কার মানুষ। প্রথমে তারা এ ধর্ম গ্রহণ করল না। বরং মুহম্মদের (স) উপর শুরু করল নানা অত্যাচার। অবশেষে বাধ্য হয়ে হযরত মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে এলেন (৬২২ খ্রি.)। এই চলে আসাকে আরবিতে বলা হয় হিজরত অর্থাৎ দেশত্যাগ। আর এই ঘটনাকে স্মরণীয় করার জন্য মুসলমানরা আরবে একটি নতুন সন গণনা শুরু করে। এই সনের নাম হয় হিজরি। প্রথম দিকে প্রচার করতে গিয়ে মদীনায়ও বাধা পান হযরত মুহম্মদ (স)। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হয়। এক সময় মদীনার অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুহম্মদ (স) মক্কায় ফিরে আসেন। জয় করেন পুরো এলাকা। মক্কাবাসীরা ভেবেছিল এতদিনের অত্যাচারের এবার বুঝি প্রতিশোধ নেবেন হযরত মুহম্মদ (স)। কিন্তু নবী তা করলেন না। সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। হযরতের এই মহানুভবতায় আকৃষ্ট হলো মক্কাবাসী। এভাবে তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করল। মদীনায় তিনি ইসলামের ভিত্তিতে আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। রাষ্ট্রের প্রধান হন হযরত মুহম্মদ (স) নিজেই। সমাজ ও রাষ্ট্রে তিনি ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন সর্বশেষ ও বিশ্বনবী।

**সার-সংক্ষেপ**

হানাহানি আর অন্যায়-অবিচারে আরব যখন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল তখন মক্কা নগরীতে জন্ম নেন মহামানব হযরত মুহম্মদ (স)। তিনি ইসলামের বাণী প্রচার শুরু করেন। প্রথম দিকে আরবের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি। তারা অত্যাচার শুরু করে হযরত মুহম্মদ (স) এর উপর। হযরত মুহম্মদ (স) বাধ্য হন দেশ ত্যাগ করতে। তিনি মদীনায় চলে যান। মদীনায় তিনি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। মদীনাবাসীদের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মদীনা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এক সময় হযরত (স) ফিরে আসেন মক্কায়। মক্কা তাঁর দখলে আসে। মক্কাবাসীরা এবার বুঝতে পারে নবীকে। তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.১

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. বেদুঈন কাদের বলা হতো?
   ক. সকল আরববাসীদের — খ. মক্কাবাসীদের
   গ. মদীনাবাসীদের — ঘ. মরুভূমিতে বসবাসকারী আরবদের

২. ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে 'কাবা ঘরে' কি করা হতো?
   ক. নামাজ পড়া — খ. মূর্তিপূজা
   গ. ধ্যান করা — ঘ. ব্যবসা করা

৩. 'আইয়্যামে জাহিলিয়াহ্ কি?
   ক. একটি উপাসনা গৃহের নাম — খ. অন্ধকার যুগ
   গ. আরবের একটি গোত্র — ঘ. একজন কুরাইশ নেতা

৪. হযরত মুহম্মদ (স) কত বছর বয়সে আল্লাহর কাছ থেকে ইসলাম প্রচারের বাণী লাভ করেন?
   ক. ২৫ বছর — খ. ৩০ বছর
   গ. ৩৫ বছর — ঘ. ৪০ বছর

৫. 'হিজরত' কি?
   ক. আরবি সনের নাম — খ. আরবের একটি গোত্রের নাম
   গ. হযরতের (স) মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় যাওয়া — ঘ. একজন আরব নেতার নাম

**খ. শূনস্থান পূরণ করুন :**

মক্কার এই —— বংশেই জন্ম নিয়েছিলেন ইসলামের নবী হযরত ——। তাঁর জন্ম তারিখ ছিল —— খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট ——। জন্মের আগেই তাঁর পিতা —— মারা যান। শৈশবে তিনি মা —— হারান। তাই তাঁর লাল-পালনের ভার নেন তাঁর দাদা —— ——। আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর লালন-পালনের ভার পড়ে চাচা —— —— উপর।

**গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. হযরত মুহম্মদ (স) এর জন্মের পূর্বে আরবের অবস্থা কেমন ছিল বর্ণনা করুন।
২. ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে আলোচনা করুন।
৩. হযরত মুহম্মদ (স) এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত লিখুন।
৪. ওহী বলতে কি বুঝ?

## পাঠ-২ : খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ খুলাফায়ে রাশিদীনের পরিচয় বলতে পারবেন।
☞ খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনকালের বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ২.১ খুলাফায়ে রাশিদীন

হযরত মুহম্মদ (স) এর মৃত্যুর পর আশ্চর্যজনকভাবে ইসলাম ধর্মের বিস্তার ঘটতে থাকে। হযরতের সহচরদের বলা হতো সাহাবী। তাঁর মৃত্যুর পর একে একে চারজন সাহাবী আরবের মুসলিম রাজ্যের শাসক হন। তাঁরা ছিলেন সৎ শাসক। তাঁদের বলা হতো খলিফা। খলিফার বহুবচন খুলাফা। এই চার খলিফার শাসনকালকে বলা হয় খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ। চার খলিফা হলেন যথাক্রমে—

ক. হযরত আবু বকর (রা) (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.)
খ. হযরত উমর (রা) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.)
গ. হযরত উসমান (রা) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.)
ঘ. হযরত আলী (রা) (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.)

খুলাফায়ে রাশিদীনের খলিফাগণ হযরত মুহম্মদ (স) কে কাছে থেকে দেখেছেন। তাই তাঁর জীবনের আদর্শকে গ্রহণ করে তাঁরা নিজেদেরও সেভাবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় ইসলাম পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ স্থান মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এযুগে পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ছিল খুবই শক্তিশালী। কিন্তু চার খলিফার আমলে মুসলিম শক্তির হাতে তা পর্যুদস্ত হয়। এভাবে ইসলাম ধর্ম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশী অঞ্চল ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সামাজিক রীতিনীতি ছিল আরবদেশীয়। তাই এসকল দেশের অধিবাসীরা সহজেই ইসলাম গ্রহণ করে। খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে ইসলাম বিস্তারের পেছনে কিছু কারণও ছিল। এযুগে বিভিন্ন দেশের ধর্মে যে বিধান ছিল তাতে সাধারণ মানুষকে সব ধরনের অধিকার দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে ইসলামের মূলনীতি ছিল সহজ ও সরল। সাধারণ মানুষও সহজে ধর্মের নিয়মনীতি বুঝতে পারত। ইসলাম ধর্মে কোন জাতিভেদ প্রথা নেই। তাই মুসলমান সমাজে সকল স্তরের মানুষই একসাথে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। এতে মুসলমানদের মধ্যে একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

### ২.২ খলিফাদের প্রশাসনিক সংস্কার

এযুগের খলিফাদের হাতে ছিল অনেক ক্ষমতা। তারা একই সাথে ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান, প্রধান সেনাপতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রধান নেতা। মুসলিম রাষ্ট্রের শাসন কাঠামো খলিফাদের হাতেই তৈরি হয়। সকল শ্রেণীর মানুষের সুযোগ-সুবিধা কেমন হবে এবং তাদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্য কি থাকবে তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন খলিফাগণ। হযরত মুহম্মদ (স)-এর বিশিষ্ট সাহাবীদের নিয়ে রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ পরিচালনার জন্য একটি পরিষদ গঠন করা হয়। পরিষদকে বলা হতো 'মজলিস-উশ-শুরা' বা 'পরামর্শ সভা'।

রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে বলা হতো 'বায়তুল মাল'। নগদ টাকা-কড়ি ছাড়াও এখানে মজুদ রাখা হতো প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ। বায়তুল মালের অর্থে গরিব-দুঃখীদের সাহায্যে করা হতো।

চাষযোগ্য জমির হিসাব বের করার জন্য জরিপের ব্যবস্থা করেছিলেন খলিফাগণ। উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ রাজস্ব হিসেবে দিতে হতো। কৃষির প্রয়োজনে সরকারি খরচে খাল কাটা এবং কূপ তৈরি করা হতো।

আরবের ইসলামী রাষ্ট্রে সকল ধর্মের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। সকল ধর্মের লোকেরা যার যার মতো ধর্ম পালন করতে পারত। এই ধারা পরবর্তীকালে ভারত ও বাংলার মুসলিম সুলতান, মোগল সম্রাট ও নবাবদের শাসনকালে প্রচলিত থাকে।

**সার-সংক্ষেপ**

হযরত মুহম্মদ (স) এর মৃত্যুর পর চারজন খলিফা একে একে আরবে খুলাফায়ে রাশিদীনের কর্ণধার হন। এ যুগ ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ বলে পরিচিত। খলিফাদের নেতৃত্বে এ সময় ইসলাম প্রায় সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের অধিকারে আসে নতুন নতুন অঞ্চল। খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রশাসনিক সংস্কারে মুসলিম শাসনের যে ভিত্তি তৈরি হয় তার প্রভাব পরবর্তীকালে ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. সাহাবী কাদের বলা হয়?

ক. যোদ্ধাদের খ. খলিফাদের

গ. হযরতের (স) সহচরদের ঘ. আরব বণিকদের

২. তৃতীয় খলিফা কে ছিলেন?

ক. হযরত উসমান (রা) খ. হযরত আলী (রা)

গ. হযরত আবু বকর (রা) ঘ. হযরত উমর (রা)

৩. খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রধান কে ছিলেন?

ক. সূফী খ. গোত্র প্রধান

গ. কাবা ঘরের প্রধান ঘ. খলিফাগণ

৪. 'বায়তুল মাল' কি?

ক. কাবা গৃহ খ. মসজিদ

গ. রাষ্ট্রীয় কোষাগার ঘ. মজলিস-উশ-শুরা

৫. উৎপন্ন ফসলের কত ভাগ রাজস্ব হিসেবে দিতে হতো?

ক. দশ ভাগের এক ভাগ খ. সাত ভাগের এক ভাগ

গ. পাঁচ ভাগের এক ভাগ ঘ. তিন ভাগের এক ভাগ

**খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. খুলাফায়ে রাশিদীন কারা?

২. খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগের ব্যাখ্যা দিন।

৩. খুলাফায়ে রাশিদীন যুগে ইসলামের কতটুকু বিস্তার হয়েছিল বর্ণনা করুন।

৪. খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫. 'মজলিশ-উশ-শুরা' কাকে বলে?

৬. 'বায়তুল মাল' কি?

## পাঠ-৩ : ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ আরবের মুসলমান সেনাপতিরা কীভাবে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

☞ ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় গজনীর সুলতানদের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

### ৩.১ ভারতের সাথে আরবের সম্পর্ক

খুলাফায়ে রাশিদীনের সময় থেকে যেভাবে ইসলামের বিস্তার ঘটেছিল তাতে মুসলমান শক্তি নতুন নতুন রাজ্য জয়ে উৎসাহ পায়। বরাবরই ভারতের ধন-ঐশ্বর্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল আরবদের। তাই ইসলামের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব থেকেই বাণিজ্যের উদ্দেশ্য আরব বণিকরা ভারতে আসত। সুতরাং ভারতে আসার রাস্তা আরবদের জানাই ছিল। খুলাফায়ে রাশিদীনের পর আরবে মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব নেন উমাইয়া খলিফাগণ। এ যুগেই প্রথম ভারতের দিকে খলিফাদের দৃষ্টি পড়ে।

### ৩.২ আরবদের সিন্ধু বিজয় (৭১২ খ্রি.)

এ যুগের খলিফা মুয়াবিয়ার সময় উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম শাসন বিস্তৃত হয়। পরবর্তী খলিফা প্রথম ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খ্রি.) দখল করেন বলখ, তুখারিস্তান, ফারগানা, সমরকন্দ প্রভৃতি অঞ্চল। মুসলিম সেনাপতি মুসা ও তারিক স্পেন জয় করেন। এ যুগেই ইরাকে আরব শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। তাঁরই নির্দেশে মুহম্মদ-বিন-কাসিম ভারতের দিকে অগ্রসর হন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুদেশ মুহম্মদ-বিন-কাসিমের অধিকারে আসে। এরপর মুলতানসহ পাঞ্জাবের দক্ষিণ অংশ মুসলমানেরা জয় করে নেয়। সিন্ধু অঞ্চলে জাঠ, মেঠ প্রভৃতি নিম্ন বর্ণের লোকেরা উঁচু বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত হতো। যুদ্ধের সময় এরা মুহম্মদ-বিন কাসিমের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল।

মুহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করে সেখানে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। নাগরিকদের যার যার ধর্ম পালনের অধিকার দেন। বহু হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করেন। এই বিজয়ের সূত্র ধরে অনেক আরব সিন্ধু ও এর আশেপাশে বসবাস করতে থাকে। এভাবে আরবের সাথে ভারতের একটি সম্পর্ক তৈরি হয়।

### ৩.৩ সুলতান মাহমুদ (৯৯৮-১০৩০ খ্রি.)

সিন্ধু অভিযানের প্রায় তিনশত বছর পর আবার মুসলমানরা ভারত অভিযান শুরু করে। এবার অভিযান চালান গজনীর সুলতান মাহমুদ। তিনি ছিলেন গজনীর অধিপতি সবুক্তগীনের পুত্র। ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সতের বার এ উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে অভিযান চালান।

### ৩.৪ মুইজুদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী

সুলতান মাহমুদের পর মুহম্মদ ঘুরী প্রথম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারতে রাজত্ব স্থাপনের। গজনী ও হিরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে 'ঘোর' নামে একটি রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজা আলাউদ্দীন হোসেন গজনী আক্রমণ করে শহরটি ধ্বংস করে দেন। পরে গজনী রাজ্য দখল করেন তাঁর ভ্রাতৃপুত্র গিয়াসউদ্দীন মুহম্মদ ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে।

গিয়াসউদ্দীন মুহম্মদ ঘুরীর ভাই ছিলেন শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী। তাঁকে গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ভারতে রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যই মুহম্মদ ঘুরী অভিযান পরিচালনা করেন। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা তখন ভালো ছিল না। এতে সুবিধা হয় মুহম্মদ ঘুরীর। ভারতে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো তখন একে অন্যের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল।

মুহম্মদ ঘুরী ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুলতান ও সিন্ধুর কিছু অংশ দখল করে ভারতে প্রবেশের পথ তৈরি করেন। পেশোয়ার তাঁর দখলে আসে ১১৭৯ সালে। এরপর আস্তে আস্তে সিন্ধু ও পাঞ্জাব তাঁর অধিকারে আসে। তবে তিনি পরাজিত হন ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে। এখানে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন আজমীর ও দিল্লির চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বিরাজ চৌহান। কিন্তু এতে দমে যাননি মুহম্মদ ঘুরী। শক্তি বৃদ্ধি করে পরের বছর আবার তিনি ভারত অভিযান করেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজিত হন পৃথ্বিরাজ ও তার বন্ধু রাজ্যগুলোর সৈন্যরা।

এভাবে মুহম্মদ ঘুরী ভারতে আফগান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করেন। তিনি তাঁর তুর্কী সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবকের হাতে ভারতের এ সমস্ত রাজ্যের শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে ফিরে যান গজনীতে। কুতুবুদ্দীন যোগ্য সেনাপতি ছিলেন। তিনি একে একে মিরাট, দিল্লি প্রভৃতি অঞ্চল দখল করতে থাকেন। কুতুবুদ্দীন ১১৯৩ সালে দিল্লিতে শাসন কেন্দ্র স্থাপন করেন। পরের বছর মুহম্মদ ঘুরী আবার আসেন ভারতে। আইবেককে সাথে নিয়ে বানারসী পর্যন্ত রাজ্য সীমা বৃদ্ধি করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে

এবার কুতুবুদ্দীন ও মুহম্মদ ঘুরী গোয়ালিয়র জয় করে নেন। এর কয়েক বছর পর কুতুবুদ্দীন বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গ দখল করেন। আর এমনি করে ভারতে মুসলিম রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী মারা গেলে ঘোর ও ভারতের পুরো ক্ষমতা আসে শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ ঘুরীর হাতে। সুলতান হিসেবে তার নাম হয় মুইজুদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী।

**সার-সংক্ষেপ**

খুলাফায়ে রাশিদীনের সময় থেকে মুসলমান সেনাপতিরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিম শাসন বিস্তারে মন দেন। উমাইয়া শাসন যুগে মুহম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু এবং পরে মুলতান ও পাঞ্জাব জয় করে ভারতে মুসলমান অভিযানের পথ তৈরি করেন। এর অনেককাল পর গজনীর সুলতান মাহমুদ ভারতে অভিযান চালান। ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ নেন মুহম্মদ ঘুরী। দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে তিনি ও তাঁর সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবেক ভারতে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহ অধিকার করে এখানে আফগান শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৩

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. কত খ্রিস্টাব্দে মুসলমান সেনাপতি সিন্ধুদেশ জয় করেন?
ক. ৭৩০ খ্রিস্টাব্দে খ. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে গ. ৫১২ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ৭১২ খ্রিস্টাব্দে

২. ১৭ বার ভারত অভিযান করেছেন কোন মুসলমান সেনাপতি?
ক. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খ. মুহম্মদ বিন কাসিম গ. সুলতান মাহমুদ ঘ. মুহম্মদ ঘুরী

৩. পৃথ্বিরাজ চৌহান কার হাতে পরাজিত হন?
ক. সুলতান মাহমুদের খ. মুহম্মদ বিন কাসিমের গ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ঘ. মুহম্মদ ঘুরীর

৪. কুতুবুদ্দীন আইবেক কে ছিলেন?
ক. মুহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি খ. মুলতানের সুলতান গ. ইরাকের অধিপতি ঘ. বাংলার সুলতান

৫. কত খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী ঘোর ও ভারতের সুলতান হন?
ক. ১১৯৩ খ্রি. খ. ১১৯২ খ্রি. গ. ১২০৩ খ্রি. ঘ. ১২০৪ খ্রি.

**খ. মিল করুন**

| | |
|---|---|
| ১. ভারতের ধন-ঐশ্বর্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল— | ১. মুহাম্মদ বিন কাসিম। |
| ২. খুলাফায়ে রাশিদীনের পর মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করেন— | ২. মুসলিম সেনাপতি মুসা ও তারিক। |
| ৩. প্রথম ভারতে মুসলিম অভিযান চালান— | ৩. মুহাম্মদ ঘুরী। |
| ৪. স্পেন জয় করেন— | ৪. উমাইয়া খলিফাগণ। |
| ৫. ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ নেন— | ৫. আরবদের। |

**গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. ভারতে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা কীভাবে নেওয়া হয়েছিল বর্ণনা করুন।

২. মুহম্মদ ঘুরী কীভাবে ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লিপিবদ্ধ করুন।

## পাঠ-৪ : বাংলায় মুসলিম আগমন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ বাংলায় মুসলমানদের প্রাথমিক আগমন কীভাবে হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ কীভাবে এ দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ কি কারণে বাংলার সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৪.১ বাংলায় মুসলমানদের আগমন

মধ্যযুগের পুরো সময় জুড়ে এ দেশ শাসন করেছেন মুসলমান শাসকগণ। প্রাচীনকাল থেকে এদেশে যারা বসবাস করে আসছিল তাদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ। হঠাৎ করে কিভাবে বাংলার বাইরে থেকে আসা মুসলমানদের হাতে এ দেশের ক্ষমতা চলে যায় এবং অল্প দিনের মধ্যে বাংলার অধিবাসীদের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তা লক্ষ্য করার বিষয়। এমন একটি ঘটনা ঘটা নিশ্চয়ই খুব সহজ ছিল না। এ বিষয়টি বোঝার জন্য বাংলার মুসলমানদের আগমনের ধারাটি খুঁজে দেখা প্রয়োজন।

মুসলমান শাসকগণ রাজ্য জয় করতে বাংলায় এসেছিলেন ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে। এরও অনেক আগে সাধারণ মুসলমানেরা বাংলায় আসতে থাকে। অষ্টম শতকে আরবের কিছু সংখ্যক মুসলমান প্রথম বাংলায় আসে। ধর্ম প্রচার করা তাদের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। জাহাজে পাল তুলে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তারা এসেছিল বাণিজ্য করতে। তাই চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির সমুদ্রতীরের অঞ্চলগুলোতে তাদের বসতি গড়ে ওঠে। এরা ইসলাম প্রচার না করলেও দীর্ঘদিন বসবাস করতে গিয়ে ছোট করে হলেও একটি মুসলিম সমাজ গড়ে তোলে। এই আরব আর বাংলার মানুষের মধ্যে বিয়ে-শাদির সম্পর্কও গড়ে উঠতে থাকে। এতে করে এদেশে একটি নতুন মুসলমান সমাজ গড়ে উঠার পথ তৈরি হয়।

### ৪.২ বাংলায় ইসলামের বিকাশ

তবে এ দেশে প্রকৃত অর্থে ইসলামের বিকাশ ঘটেছে আরও পরে। সময়ের হিসেবে বলা যায় একাদশ শতক থেকে। এ সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে সূফী সাধকগণ প্রবেশ করতে থাকেন। তাদের কাছে এ দেশবাসীর অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে। জোর করে মুসলমান বানানোর ঘটনা বাংলাদেশে খুব বেশি ঘটেনি। যে দু'চারটি ঘটনা জানা যায় তা সামন্ত রাজাদের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ঘটেছিল। যুদ্ধের সময় কোন কোন মুসলমান সৈনিক জোর করে অন্য ধর্মের কাউকে মুসলমান বানানোর চেষ্টাও করতে পারে। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ছিল খুবই কম। ধর্ম প্রচারকগণের মাধ্যমে বাংলায় সবচেয়ে বেশি ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছে।

প্রথম দিকের ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা যায় শাহ সুলতান রূমী-র। ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ময়মনসিংহ জেলায় এসেছিলেন। এরপর ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বিক্রমপুরে আসেন বাবা আদম শহীদ। অতঃপর বাংলার বিভিন্ন অংশে সূফী সাধকদের আগমন চলতেই থাকে।

বাংলার সাধারণ মানুষ ধর্ম প্রচারকদের সহজেই গ্রহণ করেছিল। সেন রাজাদের অত্যাচারে সাধারণ হিন্দু ও বৌদ্ধদের জীবন খুব কষ্টের ছিল। ধর্মে তাদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তাদের আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। নিম্নবর্ণের মানুষদের কোন মূল্যই ছিল না সেন রাজা এবং উচ্চবর্ণের লোকজনের কাছে। সমাজে সাধারণ মানুষের যখন এমন দুর্দশা তখনই মুসলিম প্রচারক দল এদেশে আগমন করতে থাকেন।

প্রচারকগণ যেখানে এসে আস্তানা তৈরি করতেন তাকে বলা হতো খানকাহ। খানকায় তারা লঙ্গরখানা বসাতেন। এখানে দরিদ্রদের বিনা পয়সায় খাওয়ানোর ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা বিস্তারের জন্য গড়া হতো মক্তব-মাদ্রাসা। ইসলাম ধর্মে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। এখানে সকল মানুষই সমান, এই সাম্যের বাণীই তারা প্রচার করেন। এতে আকৃষ্ট হয় সাধারণ হিন্দু ও বৌদ্ধ।

ব্রাহ্মণরা যে ধর্মের কথা প্রচার করেছিল তাতে মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথা ছিল না। তাই এই বর্ণ-বৈষম্য ইসলাম প্রচারের জন্য একটি পথ তৈরি করে দিয়েছিল।

ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার হারানো সাধারণ হিন্দু ও বৌদ্ধরা অবাক চোখে দেখে এই মুসলিমদের অভেদ নীতি। এদের জীবনযাত্রার সরলতা ও সাম্যের বাণী সাধারণ মানুষের মনে বেশ নাড়া দেয়। এদেরই একটি বড় অংশ অসহায় জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকার আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় সবচেয়ে বেশি মানুষ মুসলমান হয়েছিল। আর ইতিহাসে দেখা যায় এই দুই অঞ্চলেই বর্ণ-বৈষম্য ছিল বেশি।

বাংলায় ইসলাম ধর্মের আগমন ও বিস্তার আরও বেড়ে যায় ত্রয়োদশ শতকের পর। মুসলমান শাসকদের হাতে রাজক্ষমতা চলে এলে মুসলমান শাসকদের সহযোগিতায় প্রচারক দল সমগ্র দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এভাবেই মধ্য যুগে বাংলায় মুসলিম সমাজের ব্যাপক বিকাশ ঘটে।

**সার-সংক্ষেপ**

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন মুসলিম প্রচারক দল। একাদশ শতক থেকে তাই বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম সমাজ গড়ে উঠতে থাকে। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলিম সমাজ বিকাশের গতি আরও বেড়ে যায়। কারণ বাংলার শাসন ক্ষমতা এ সময় চলে আসে মুসলমানদের হাতে। এর আগে দীর্ঘদিন বাংলা শাসন করেছিলেন হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসকগণ। মুসলমানগণ কিভাবে হঠাৎ করে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা লক্ষ্য করার বিষয়। ক্ষমতা দখলের পর থেকে পরবর্তী দেড়শ বছরকে বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক স্তর বলা চলে। এ যুগে বেশি সময় বাংলা ছিল দিল্লির অধিকারভুক্ত একটি প্রদেশ। কখনও কখনও কোন শাসনকর্তা দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন স্বাধীন হতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিল্লির আক্রমণের মুখে টিকে থাকতে পারে নি। তবে এ যুগে বাংলা জুড়ে ভবিষ্যৎ মুসলিম শাসনের ভিত্তি তৈরি হতে থাকে।

মধ্যযুগে ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে মুসলিম শাসন গড়ে ওঠে। বিভিন্ন মুসলিম প্রচারক দল ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তুর্কানা-তরীকা ও সুফিয়ানা তরীকা-এ দুটি পদ্ধতিতে ধর্ম প্রচার করা হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৫.৪

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. মধ্যযুগে বাংলাদেশ শাসন করেছে কারা?

ক. হিন্দুরা খ. মুসলমানেরা গ. ব্রাহ্মণেরা ঘ. বৌদ্ধরা

২. মুসলমানদের কোন অংশ প্রথম বাংলায় এসেছিল?

ক. আরব বণিক খ. সূফী গ. সুলতান ঘ. সৈনিক

৩. বাংলায় অধিকাংশ মানুষের ইসলাম গ্রহণের কারণ কি?

ক. ব্রাহ্মণদের অত্যাচার খ. সৈনিকদের বল প্রয়োগ গ. সুলতানদের প্রচেষ্টা ঘ. সূফীদের আকর্ষণ

৪. মুসলিম ধর্ম প্রচারকদের আস্তানাকে কি বলা হতো?

ক. মসজিদ খ. লঙ্গরখানা গ. খানকাহ ঘ. মাদ্রাসা

৫. কোন সময়ে ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে বেশি বিস্তার ঘটেছিল?

ক. একাদশ শতকে খ. একাদশ শতকের পর গ. ত্রয়োদশ শতকের পর ঘ. ত্রয়োদশ শতকে

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. প্রথম দিকের ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা যায় শাহ———। ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি——জেলায় এসেছিলেন।

২. এরপর ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ¾ আসেন বাবা আদম শহীদ।

৩. বাংলার সাধারণ মানুষ মুসলিম ¾ সহজেই গ্রহণ করেছিল।

৪. সেন ¾ অত্যাচারে সাধারণ ¾ ও বৌদ্ধদের জীবন খুব কষ্টের ছিল।

৫. ধর্মে তাদের কোনরূপ ¾ ছিল না।

**গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. প্রথমদিকে বাংলায় কীভাবে মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল বর্ণনা করুন।

২. কীভাবে এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হয়েছিল আলোচনা করুন।

৩. কী কারণে বাংলার সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল বর্ণনা করুন।

## পাঠ-৫ : বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয় ও মুসলিম শাসনের সূত্রপাত

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ কীভাবে বাংলায় মুসলিম বিজেতাগণ প্রবেশ করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ বাংলায় বখতিয়ার খলজীর মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ বখতিয়ার খলজী কীভাবে মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৫.১ বাংলায় বখতিয়ার খলজীর আগমন

বখতিয়ার খলজীর আক্রমণের সময় সেনরাজা লক্ষ্মণসেন অবস্থান করছিলেন নদীয়ায়। সেনদের মূল রাজধানী ছিল ঢাকার বিক্রমপুর। নদীয়া ছিল তাঁদের দ্বিতীয় রাজধানী। আফগানিস্তানের তুর্কী সেনাপতি বখতিয়ার খলজী ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার কাছাকাছি বিহার জয় করেছিলেন। তাই নদীয়ার অধিবাসীদের মধ্যে একটি ভীতি কাজ করছিল, কখন নদীয়ার উপর তুর্কীদের আঘাত আসবে। বখতিয়ার খলজী খুব বুদ্ধিমান যোদ্ধা ছিলেন। বাইরের যোদ্ধাদের তখন বাংলায় প্রবেশ করতে একটিই পথ খোলা ছিল, তা হচ্ছে তেলিয়াগর্হির গিরিপথ। বখতিয়ার খলজী বুঝেছিলেন সেন রাজারা বাধা দেয়ার জন্য এখানে সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত রাখবে। তাই তিনি ঝাড়খন্দের জঙ্গল-পথে অগ্রসর হন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজের মতে অরণ্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন যে, তিনি যখন নদীয়া পৌঁছেন তখন মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী তার সঙ্গে আসতে পেরেছিল, মূল বাহিনী পশ্চাতে ছিল। তিনি সোজা প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হন এবং প্রাসাদ রক্ষীদের হত্যা করেন। চারদিকে শোরগোল উঠল। লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদ বখতিয়ারের দখলে এল। ইতোমধ্যে বখতিয়ার খলজীর বাকি সৈন্যরা এসে পড়েছে। ফলে সহজেই নদীয়া মুসলমানদের অধিকারে আসে। লক্ষ্মণসেন পালিয়ে যান পূর্ববঙ্গে।

### ৫.২ মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

বখতিয়ার খলজী নদীয়া অধিকার করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তিনি ১২০৫ সালে সেনদের অন্যতম রাজধানী লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। তখন থেকে লক্ষ্মণাবতীর নাম হয় লখনৌতি। রাজধানীকে নিরাপদ করার জন্য তিনি আরও উপযুক্ত জায়গা খুঁজছিলেন। তেমন জায়গা পাওয়া গেল দিনাজপুরের দেবকোটে। তিনি দেবকোট অধিকার করে এখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। এরপরে বখতিয়ার বাংলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার আর চিন্তা করেননি। তিনি তিব্বত অভিযানে বের হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এ অভিযান ব্যর্থ হয়। তিনি ফিরে আসেন দেবকোটে এবং এখানে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

### ৫.৩ বাংলায় মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা

বখতিয়ার খলজী শুধু বাংলার একটি অংশ অধিকার করেই থেমে যাননি। যাতে পরবর্তীকালে এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য তিনি কতকগুলো পদক্ষেপ নিলেন। তিনি তাঁর অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলোকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেন। প্রদেশের নাম দেওয়া হয় 'ইকতা' ও শাসনকর্তার পদটিকে বলা হয় 'মুকতা'। তিনি মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এভাবে বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

**সার-সংক্ষেপ**

বখতিয়ার খলজী দক্ষ শাসক ও যোদ্ধা ছিলেন। সুকৌশলে লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য দেশকে প্রদেশে ভাগ করেন। প্রদেশের শাসনকর্তাকে 'মুকতা' বলা হতো। তিনি অনেক জনহিতকর কাজ করেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৫

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. বখতিয়ার খলজীর আক্রমণের সময় লক্ষ্মণসেন কোথায় ছিলেন?

ক. লক্ষ্মণাবতীতে খ. বিক্রমপুরে
গ. সোনারগাঁওয়ে ঘ. নদীয়ায়

২. সেন রাজাদের মূল রাজধানী কোথায় ছিল?

ক. বিক্রমপুর খ. নদীয়া
গ. লক্ষ্মণাবতী ঘ. ঝাড়খন্দ

৩. বখতিয়ার খলজী কোন সময় লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন?

ক. ১২০৪ খ. ১২০৫
গ. ১২০৬ ঘ. ১২০৭

৪. বখতিয়ার খলজী লক্ষ্মণাবতী থেকে রাজধানী কোথায় স্থানান্তর করেন?

ক. নদীয়ায় খ. বিক্রমপুরে
গ. সোনারগাঁওয়ে ঘ. দেবকোটে

৫. খলজীদের আমলে বাংলার প্রদেশগুলোর নাম কি ছিল?

ক. মুকতা খ. ইকতা
গ. লক্ষ্মণাবতী ঘ. গৌড়

**খ. সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন**

১. নদীয়া ছিল সেন রাজাদের দ্বিতীয় রাজধানী।
২. আফগানিস্তানের তুর্কী সেনাপতি বখতিয়ার খলজি ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার কাছাকাছি বিহার জয় করেছিলেন।
৩. বখতিয়ার খলজী একজন ভীতু যোদ্ধা ছিলেন।
৪. বখতিয়ার খলজী যখন নদীয়া পৌঁছেন তখন মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী তাঁর সঙ্গে আসতে পেরেছিল।
৫. বখতিয়ার খলজীর মূল বাহিনী পালিয়ে গিয়েছিল।
৬. লক্ষ্মণসেন পালিয়ে গিয়েছিল।
৭. বখতিয়ার খলজী এদেশে অনেক জনহিতকর কাজ করেন।

**গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. কীভাবে বাংলার মুসলমান বিজেতাগণ প্রবেশ করেছিল বর্ণনা করুন।
২. কীভাবে বখতিয়ার খলজী বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিস্তারিত বর্ণনা দিন।
৩. বখতিয়ার খলজির প্রশাসনিক ব্যবস্থার বর্ণনা দিন।

## পাঠ-৬ : বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- ☞ বাংলার একটি অংশে কীভাবে স্বাধীন সুলতানী শাসনের সূচনা হলো তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় সুলতানগণ কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ☞ বাংলার একটি অংশের স্বাধীনতা কীভাবে ধীরে ধীরে পুরো বাংলার স্বাধীনতায় রূপান্তরিত হলো তা বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৬.১ বাংলায় সুলতানী শাসন

বখতিয়ার খলজীর অভিযানের মাধ্যমেই বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। ১২০৪ থেকে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় জুড়ে যাঁরা এদেশ শাসন করেছেন তাঁদের একেবারে স্বাধীন সুলতান বলা যাবে না। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন বখতিয়ারের সহযোদ্ধা খলজী মালিক। আবার কেউ কেউ তুর্কী বংশের শাসক। এরা ছিলেন দিল্লির সুলতানদের অধীনে বাংলার গভর্নর। অনেকে দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তবে এসব বিদ্রোহ সফল হয়নি। দিল্লির আক্রমণের মুখে তা ব্যর্থ হয়। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানীর সূচনা করেন। এরপর ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দু'শ বছর বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল। এই দু'শ বছরের শাসনামল ছিল ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ, ইলিয়াস শাহী বংশ, হাবশী শাসন ও হুসেন শাহী বংশের শাসনামল। দু'শ বছরের স্বাধীন সুলতানী আমল বাংলার গৌরবময় যুগ।

### ৬.২ স্বাধীন সুলতানী যুগ

১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত বাংলা দিল্লির অধীনেই ছিল। এ বছরেই বাংলার ইতিহাসে আসে বিরাট পরিবর্তন। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যু হয়। বাহরাম খানের সিলাহদার (বর্ম রক্ষক) ছিলেন 'ফখরা' নামের একজন রাজকর্মচারী। তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ উপাধি নিয়ে সোনাগাঁয়ের সিংহাসনে বসেন। এভাবেই সূচনা হয় বাংলার স্বাধীন সুলতানী যুগের।

সোনারগাঁওয়ের বাইরে লখনৌতি ও সাতগাঁও শাসন কেন্দ্রে তখন দিল্লির গভর্নরগণ শাসন করছিলেন। তাঁরা ফখরুদ্দিনের স্বাধীনতা ঘোষণাকে সুনজরে দেখেননি। তাই লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খান ও সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা ইজ্জউদ্দিন মিলিতভাবে সোনারগাঁও আক্রমণ করেন। প্রথম দিকে ফখরুদ্দিন আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে বেড়ান। কদর খান সোনারগাঁও অধিকার করেন এবং সেখানে থেকে যান। ওদিকে ফখরুদ্দিন বর্ষার আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কারণ সোনারগাঁও নিচু এলাকা। বর্ষায় চারদিক ডুবে গেলে কদর খানের ঘোড়সওয়ার বাহিনী বিপদে পড়বে। এদিকে কদর খানের বিরুদ্ধে তাঁর সৈন্যরাও অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিল। এ যুগের নিয়ম ছিল যুদ্ধ জয়ের পর লুণ্ঠিত সম্পত্তি সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া। কদর খান সৈন্যদের ধনরত্নের ভাগ না দেওয়ায় সৈনরা ক্ষুব্ধ হয়। এই সুযোগে ফখরুদ্দিন কদরখানের সৈন্যদের সাথে যোগাযোগ করেন। সৈন্যদের অনেকে দলত্যাগ করে ফখরুদ্দিনের সাথে যোগ দেয়। ফলে এবার যে যুদ্ধ হয় তাতে কদর খান পরাজিত ও নিহত হন। ফখরুদ্দিন সোনারগাঁও পুনরুদ্ধার করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন।

ফখরুদ্দিন একজন স্বাধীন সুলতান হিসেবে নিজ নামে মুদ্রা জারি করেছিলেন। তিনি ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সোনারগাঁওয়ে রাজত্ব করেন।

অন্যদিকে কদরখানের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে লখনৌতিতে তাঁর সেনাপতি আলী মোবারক সিংহাসনে বসেন। ফখরুদ্দিন লখনৌতি অধিকার করার জন্য বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি সফল হতে পারেননি। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ তাঁর রাজ্যসীমা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছুটা বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম জয় করেন। চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায়।

বিখ্যাত পর্যটক ইবনেবতুতা ফখরুদ্দিনের রাজত্বকালে এসেছিলেন (১৩৪৫-৪৬ খ্রি.) তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে সে যুগের বাংলা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। ফখরুদ্দিনের পর ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ সোনারগাঁওয়ের স্বাধীন সুলতান হিসেবে সিংহাসনে বসেন এবং ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছর রাজত্ব করেন। তিনি ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের পুত্র ছিলেন।

**সার-সংক্ষেপ**

১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ সোনারগাঁওয়ের স্বাধীনতা ঘোষণা করার সাথে সাথে বাংলা দিল্লির শাসন থেকে স্বাধীন হয়। সাতগাঁও ও লখনৌতিতে নিয়োজিত দিল্লির গভর্নররা ফখরুদ্দিনকে দমন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সফল হতে পারেন নি। এভাবে বাংলার একটি অংশে স্বাধীন সুলতানীর সূচনা হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৬

### ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

**মিল করুন :**

| | |
|---|---|
| ১. ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানীর সূচনা করেন —— | ১. বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল। |
| ২. ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দু'শত বছর —— | ২. সোনারগাঁও আক্রমণ করেন। |
| ৩. দু'শ বছরের স্বাধীন সুলতানী আমল ছিল —— | ৩. মুদ্রা চালু করেছিলেন। |
| ৪. লাখনৌতির শাসনকর্তা কদরখান ও সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা ইজ্জউদ্দিন মিলিতভাবে বাংলার —— | ৪. বাংলার গৌরবময় যুগ। |
| ৫. স্বাধীন সুলতান হিসেবে নিজ নামে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ —— | ৫. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ। |

### খ. সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. সোনারগাঁওয়ে কোন সুলতান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?

ক. বাহরাম খান খ. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
গ. কদর খান ঘ. ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ

২. লখনৌতির কোন শাসনকর্তা ফখরুদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন?

ক. মালিক ইজ্জউদ্দিন খ. বাহরাম খান
গ. গাজী শাহ ঘ. কদর খান

৩. ফখরুদ্দিন সোনারগাঁওয়ের বাইরে কোন অঞ্চল দখল করেন?

ক. সাতগাঁও খ. চট্টগ্রাম
গ. লখনৌতি ঘ. দিল্লি

৪. ইবনেবতুতা কে?

ক. একজন যোদ্ধা খ. একজন ব্যবসায়ী
গ. একজন পর্যটক ঘ. একজন সূফী সাধক

### গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলার একটি অংশে কীভাবে স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা হয়?
২. বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসনের সূচনা করেন কে?
৩. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ সম্বন্ধে একটি রচনা লিখুন।

## পাঠ-৭ : ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনাধীনে বাংলা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ বাংলায় স্বাধীন সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ সুলতান সিকান্দর শাহের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ কৃতি সুলতান হিসেবে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের রাজত্বকালের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

### ৭.১ ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা

আলী শাহ লখনৌতির স্বাধীন রাজা ছিলেন। তিনি তার রাজধানী ফিরুজাবাদে স্থানান্তরিত করেন। আলী শাহ ক্ষমতায় ছিলেন ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর দুধ ভাই ছিলেন হাজী ইলিয়াস। তিনি আলী শাহকে পরাজিত ও নিহত করে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নাম দিয়ে বাংলায় একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। এরপর ইলিয়াস শাহের বংশধরগণ অনেকদিন বাংলা শাসন করেন। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য হিন্দু রাজত্বের উত্থান ঘটেছিল।

ইলিয়াস শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন হাজী ইলিয়াস। তিনি ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম বাংলার শাসনকর্তা আলাউদ্দিন শাহকে হত্যা করে 'সুলতান-ই-বাংলা' ও 'শাহ-ই-বাংলা' নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে তিনি নিজেকে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধিতে ভূষিত করেন। তার নামানুসারে এ বংশের নাম হয় 'ইলিয়াস শাহী বংশ'।

### ৭.২ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ফিরুজাবাদের সিংহাসন অধিকারের মাধ্যমে ইলিয়াস শাহ উত্তর-পশ্চিম বাংলার অধিপতি হন। ইলিয়াস শাহের স্বপ্ন ছিল পুরো বাংলার অধিপতি হওয়া।

তিনি প্রথম দৃষ্টি দেন পশ্চিম বাংলার দিকে। ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই সাতগাঁও তাঁর অধিকারে চলে আসে। তবে ইলিয়াস শাহের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ছিল পূর্ব বাংলা অধিকার। ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও দখলের মাধ্যমে ইলিয়াস শাহের পুরো বাংলা অধিকারে আসে। তাই বলা হয়, ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ বাংলার স্বাধীনতার সূচনা করলেও প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে। এ কারণেই দিল্লির ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফীফ ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথম দিকে দিল্লির সুলতানরা বাংলার এ স্বাধীনতা মেনে নেননি।

ইলিয়াস শাহ বাংলার বাইরে বিহারের কিছু অংশ, চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী জয় করেন।

দিল্লির সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলক ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর থেকে শুরু করে ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন বাংলাকে দিল্লির অধিকারভুক্ত করতে। ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। দিল্লি বাহিনীর পক্ষে একডালা দুর্গ দখল করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ফিরুজশাহ তুঘলক বাংলার স্বাধীনতা মেনে নিয়েছিলেন। তিনি ইলিয়াস শাহের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিল্লি ফিরে যান।

একজন দক্ষ সুলতান হিসেবে ইলিয়াস শাহের সুনাম রয়েছে। তিনি একজন সফল সেনাপতি হিসেবে যেমন রাজ্য জয় করেছিলেন, তেমনি দিল্লির আক্রমণও প্রতিহত করেছিলেন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তিনি সূফী দরবেশদের সম্মান করতেন। তিনি দীর্ঘ ষোল বছর রাজত্ব করেন। এ সময় বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

### ৭.৩ সুলতান সিকান্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৯৩ খ্রি.)

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রায় ৩৫ বছর শাসন করেছিলেন। তিনি পিতার মতোই একজন দক্ষ ও শক্তিশালী শাসক ছিলেন। ইলিয়াস শাহ মারা গেলে দিল্লির সুলতান আরেকবার চেষ্টা করেন বাংলা অধিকার করতে। ১৩৫৮ থেকে ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফিরুজশাহ তুঘলক অভিযান চালান। পিতার মতো সিকান্দর শাহও একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে দিল্লিতে ফিরে যান।

পিতার মতো সিকান্দর শাহও সূফী দরবেশদের শ্রদ্ধা করতেন। তিনি দিনাজপুরে সূফী মোল্লা আতার দরগাহে মসজিদ তৈরি করেন। এছাড়াও সিকান্দর শাহের সময় অনেক মসজিদ ও দালানকোঠা তৈরি করা হয়েছিল। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ সিকান্দর শাহই তৈরি করিয়েছিলেন। বিশালতায় ও সৌন্দর্যে এই মসজিদটি ছিল অতুলনীয়। গৌড়ের কোতওয়ালী দরজা তাঁরই কীর্তি। সিকান্দর শাহের শাসনকালে দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। ইলিয়াস শাহ যে স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সিকান্দর শাহ তাকে আরও শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করান।

### ৭.৪ গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ ( ১৩৯৩-১৪১১ খ্রি.)

সিকান্দর শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ ১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি ১৮ বছর রাজত্ব করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসে আযম শাহ ছিলেন সবচেয়ে আকর্ষণীয় সুলতান। পুরো শাসনকালে তাঁকে যুদ্ধ-বিগ্রহে তেমন একটা জড়াতে হয়নি। তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর মহান চরিত্রের জন্য । তিনি বিদ্বান ও কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি দেশ-বিদেশে বাংলার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

আযম শাহ ছিলেন একজন ন্যায়বিচারক সুলতান। তাঁর ন্যায়বিচারের কথা গল্পের মতো ছড়িয়ে আছে। তিনি নিজে একজন কবি ছিলেন। বিদ্যা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের উৎসাহ দিতেন। পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজকে তিনি এদেশে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

আযম শাহের সময় বাংলা ধন-ঐশ্বর্যে পূর্ণ ছিল। তিনি মক্কা ও মদীনায় মাদ্রাসা তৈরি করেছেন এবং এগুলোর শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যয়ভার বহন করেন। চীনের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের। তাঁর সময় বাংলা-চীন বহু বছর দূত বিনিময় করে। চীনা পর্যটকদের বিবরণ থেকে আযম শাহের রাজত্বকালে বাংলা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

পূর্বপুরুষদের মতো আযম শাহও সূফী দরবেশদের সম্মান করতেন। বিখ্যাত সূফী নূর কুতুব উল আলমের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এ সমস্ত কৃতিত্ব ছাড়াও পিতা ও পিতামহের গড়ে তোলা বিশাল রাজত্বকে অক্ষুণ্ন রেখে একজন দক্ষ শাসক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন।

### ৭.৫ সাইফুদ্দিন হামজা শাহ

গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সাইফুদ্দিন হামজা শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু এ সময় অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতা দখল নিয়ে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। তিনি মাত্র একবছর শাসন করার পর ১৪১২ খ্রিস্টাব্দে তার ক্রীতদাস শিহাবউদ্দিনের হাতে নিহত হন।

**সার-সংক্ষেপ**

ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ বাংলায় স্বাধীনতার যে সূচনা করেছিলেন তার পূর্ণতা এনে দেন সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। তিনি লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও নিজের অধিকারে নিয়ে আসেন। গোটা বাংলার স্বাধীন সুলতানের মর্যাদা লাভ করেন ইলিয়াস শাহ। দিল্লির সুলতান ফিরুজশাহ তুঘলক কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন বাংলাকে পুনরায় দিল্লির অধিকারে নিয়ে নিতে। কিন্তু তিনি সফল হতে পারেননি। ইলিয়াস শাহী বংশের অপর দুই সুলতান সিকান্দর শাহ ও গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ সাফল্যের সাথে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৭

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. বাংলার স্বাধীন সুলতানীর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ খ. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

গ. সুলতান সিকান্দর শাহ ঘ. গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ

২. ইলিয়াস শাহের সময় দিল্লির কোন সুলতান বাংলা আক্রমণ করেন?

ক. মোহাম্মদ বিন তুঘলক খ. ফিরুজশাহ তুঘলক

গ. ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ ঘ. সামস-ই-সিরাজ আফীফ

৩. আদিনা মসজিদ কোথায় অবস্থিত?

ক. গৌড়ে খ. সোনারগাঁওয়ে

গ. পাণ্ডুয়াতে ঘ. লখনৌতিতে

৪. সিকান্দর শাহ কত বছর রাজত্ব করেন?

ক. ১৫ বছর খ. ১৮ বছর

গ. ৫ বছর ঘ. ৩৫ বছর

৫. আযম শাহ বাংলার বাইরে কোথায় মাদ্রাসা তৈরি করিয়েছিলেন?

ক. আগ্রায় খ. বিহারে
গ. মক্কা-মদীনায় ঘ. চীনে

৬. আযম শাহ কোন দেশের সাথে দূত বিনিময় করেন?
ক. চীন খ. মক্কা
গ. মদীনা ঘ. পারস্য

**খ. সত্য-মিথ্যা নিরূপণ করুন**

১. ইলিয়াস শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন হাজী ইলিয়াস।
২. হাজী ইলিয়াস নিজেকে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করে বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা করেন।
৩. দিল্লির সুলতানরা বাংলার স্বাধীনতা সহজেই মেনে নেন।
৪. সুলতান সিকান্দর শাহ ৩৫ বছর বাংলার স্বাধীন সুলতান ছিলেন।
৫. গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ ছিলেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের পুত্র।
৬. গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সময়ে বাংলা ধন-ঐশ্বর্যে পূর্ণ ছিল।
৭. সাইফুদ্দিন হামযাশাহ অনেক বছর বাংলা শাসন করেন।
৮. আযম শাহ সূফী দরবেশদের সম্মান করতেন।

**গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।
২. সুলতান সিকান্দর শাহের রাজত্বকালের মূল্যায়ন করুন।
৩. সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।
৪. সাইফুদ্দিন হামজা শাহ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
৫. ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিবরণ দিন।

## পাঠ-৮ : রাজা গণেশ ও পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরদের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানদের শাসন আমলের বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ হাবশীদের পরিচয় ও তাঁদের শাসনকালের বর্ণনা দিতে পারবেন।

### ৮.১ রাজা গণেশের ক্ষমতা দখলের পটভূমি

গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের পর তাঁর ছেলে সাইফুদ্দিন হামজা শাহ মাত্র এক বছর শাসন করেন। এই সময় অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতা দখল নিয়ে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। শিহাবুদ্দিন নামক এক ক্রীতদাসের হাতে সুলতান নিহত হন। শিহাবুদ্দিন বায়েজিদ শাহ নাম নিয়ে এই ক্রীতদাস নিজেই সুলতান হয়ে বসেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনিও নিহত হন। এরপর রাজা গণেশ নামক একজন হিন্দু অভিজাত ক্ষমতা দখল করেন। তিনি ও তাঁর বংশধরেরা প্রায় ত্রিশ বছর বাংলা শাসন করেন।

### ৮.২ রাজা গণেশ

গণেশ ছিলেন দিনাজপুরের ভাতুড়িয়া অঞ্চলের একজন জমিদার। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সময় তিনি খুব প্রভাবশালী ছিলেন। শিহাবুদ্দিন বায়েজিদ শাহের নিহত হওয়ার পর তিনি বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করেন। শাসক হিসেবে তিনি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন। অনেক সূফী-সাধক তাঁর আদেশে নিহত হন। তখন দরবেশদের নেতা নূর কুতুবুল আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে মুসলমানদের রক্ষা করার আহ্বান জানান। ইব্রাহীম শর্কী সসৈন্য বাংলা অভিযান করেন। ভয় পেয়ে রাজা গণেশ নূর কুতুবুল আলমের সাথে আপোষ করেন। শর্ত অনুযায়ী গণেশ তাঁর ছেলে যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করান। যদুর নাম হয় জালালউদ্দিন মাহমুদ। গণেশ ছেলের হাতে বাংলার সিংহাসন ছেড়ে দেন। ইব্রাহীম শর্কী জৌনপুরে ফিরে যান।

ইব্রাহীম শর্কী দেশে ফেরার সাথে সাথে গণেশের বিপদ কেটে যায়। ইতোমধ্যে নূর কুতুবুল আলমও মারা যান। তাই গণেশ জালালউদ্দিন মাহমুদকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে নিজে পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি ছেলেকে আচার-অনুষ্ঠান করিয়ে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন। ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা গণেশের মৃত্যু হয়।

### ৮.৩ জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪১৮-১৪৩২ খ্রি.)

যদু মনে-প্রাণেই মুসলমান হয়েছিলেন। তাই গণেশের মৃত্যুর পর তিনি জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ নামেই বাংলার সিংহাসনে বসেন। এ পর্যায়ে তিনি ১৪১৮ থেকে ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটানা শাসন করেন।

জালালউদ্দিন যোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন। তাঁর সময়ে বেশ কিছু মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছিল। তিনি তাঁর মুদ্রায় নিজেকে 'খলিফাতুল্লাহ' বা 'আল্লাহর খলিফা' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি চীন, পারস্য, মিশর ও দামেস্কের সাথে দূত বিনিময় করেছিলেন।

জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহের পর তাঁর ছেলে শামসুদ্দিন আহমদ শাহ সুলতান হন। ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নাসির নামক তার এক ক্রীতদাসের হাতে নিহত হন। এভাবে রাজা গণেশ ও তার বংশধরদের প্রায় ত্রিশ বছরের শাসনের অবসান ঘটে।

### ৮.৪ পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা

শামসুদ্দিন আহমদ শাহের হত্যাকারী ছিলেন ক্রীতদাস নাসির খান। প্রভুকে হত্যা করে একজন দাস ক্ষমতায় বসলে গৌড়ের অভিজাতবর্গ ক্ষুব্ধ হন। তারা একযোগে আক্রমণ করে নাসির খানকে হত্যা করেন। তারা ১৪৫২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে বসান ইলিয়াস শাহের এক বংশধর নাসির শাহকে। ইতিহাসে তিনি নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ নামে পরিচিত। ইলিয়াস শাহের বংশধরগণ এভাবে পুনরায় স্বাধীন রাজত্ব শুরু করেন বলে এ যুগ পর্বকে বলা হয় পরবর্তী ইলিয়াস শাহী আমল।

### ৮.৫ নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ

নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ একজন দক্ষ সেনাপতি ও ন্যায়পরায়ন শাসক ছিলেন। তাঁর সময় বাংলার সীমা অনেকটা বৃদ্ধি পায়। ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র রুকন উদ্দিন বারবক শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন।

**৮.৬ বারবক শাহ**

পিতার রাজত্বকাল থেকেই বারবক শাহ শাসক হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শাহজাদা বারবক শাহকে সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তার পদ দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সময়ে ৮,০০০ হাবশী ক্রীতদাস সংগ্রহ করে শাসনকার্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়।

**৮.৭ শামসুদ্দিন আবু মুজাফফর ইউসুফ শাহ**

বারবক শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দিন আবু মুজাফফর ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার সুলতান হন। তিনি একজন আদর্শবাদ ও সুদক্ষ সুলতান ছিলেন। পিতা ও দাদার গড়া বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর সময়কাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল।

**৮.৮ সিকান্দর শাহ ও জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ**

ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে অপসারণ করে বারবক শাহের ছোট ভাই জালালউদ্দিন ফতেহ শাহকে (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ) সিংহাসনে বসানো হয়।

**৮.৯ হাবশী শাসন**

১৪৮৭ থেকে ১৪৯৩ পর্যন্ত ছয় বছর বাংলায় হাবশী শাসন কায়েম ছিল। বাংলায় হাবশীদের এনেছিলেন সুলতান বারবক শাহ ও ইউসুফ শাহ। ফতেহ শাহের সময় তাদের ক্ষমতা অত্যন্ত বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বারবক শাহযাদা নামক একজন হাবশী ক্রীতদাস সুলতান ফতেহ শাহকে হত্যা করে নিজেই সিংহাসনে বসেন। ছয় বছরের মধ্যে চারজন হাবশী সুলতান শাসন করেন। যথাক্রমে এঁদের নাম ছিল- শাহজাদা বারবক শাহ, সাইফউদ্দিন ফিরুজ শাহ, নাসিরুউদ্দিন মাহমুদ শাহ এবং শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহ। এরা প্রত্যেকেই নিহত হন। সুতরাং দেশে দেখা দেয় অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, হতাশা ও ষড়যন্ত্র। মুজাফফর শাহ খুব অত্যাচারী ছিলেন। তিনি মাত্র দুবছর শাসন করেন। এই দুবছরের মধ্যে বহু শিক্ষিত, ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত লোককে হত্যা করা হয়। ফলে গৌড়ের সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তাঁদের সাথে যোগ দেন মুজাফফর শাহের উজির সৈয়দ হুসেন। মুজাফফর শাহ নিহত হন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সৈয়দ হুসেনকে সিংহাসনে বসান। এভাবে হাবশী দুঃশাসন থেকে দেশের জনগণ মুক্তি পায়।

**সার-সংক্ষেপ**

গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরেই রাজা গণেশ নামক একজন হিন্দু অভিজাত বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। তিনি মুসলমানদের উপর খুব অত্যচার শুরু করেন। তাই অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে ক্ষমতা ছাড়তে হয়। তাঁর ছেলে যদু মুসলমান হয়ে সিংহাসনে বসেন। মুসলমান হিসেবে তাঁর নাম হয় জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ। জালালউদ্দিনের পর সুলতান হন তাঁর পুত্র শামসুদ্দিন আহমদ শাহ। রাজা গণেশ ও তাঁর বংশ প্রায় ৩০ বছর বাংলায় শাসন করেন। এরপর ১৪৪২ সালে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহকে ক্ষমতায় বসান হয়। তিনি ছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের। তাই তাঁর সময় থেকে যে বংশের শাসন শুরু হয় তাকে পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ বলা হয়। এই বংশের রুকনউদ্দিন বারবক শাহ ছিলেন খুব সুশাসক। তিনি জ্ঞানী-গুণীদের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষণ করতেন। তিনি কবি মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়।

বারবক শাহ ও তাঁর পুত্র ইউসুফ শাহ বাংলায় বহু হাবশী ক্রীতদাস এনেছিলেন। কালক্রমে হাবশীগণ খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে একজন হাবশী ক্রীতদাস ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান ফতেহ শাহকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে। চারজন হাবশী সুলতান ছয় বছর শাসন করেন। শেষ সুলতান মুজাফফর শাহ ছিলেন খুবই অত্যাচারী। গৌড়ের অভিজাতবর্গ তাঁকে নিহত করে উজির সৈয়দ হুসেনকে সিংহাসনে বসান। এভাবে হাবশী শাসনের অবসান হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৮

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**এক কথায় উত্তর দিন :**

১. কার হাতে সাইফুদ্দিন হামজা শাহ নিহত হন?
২. রাজা গণেশ কে ছিলেন?
৩. গণেশ কখন বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করেন?
৪. রাজা গণেশ মুসলমানদের প্রতি কিরূপ আচরণ করেন?
৫. যদু কে ছিলেন? তাঁর মুসলিম নাম কী?
৬. ইব্রাহীম শর্কী কে ছিলেন?
৭. ইব্রাহীম শর্কীকে কে বাংলায় আমন্ত্রণ জানান?
৮. জালালউদ্দিন কেমন মুসলিম ছিলেন?
৯. কে মুদ্রায় নিজেকে 'খলিফাতুল্লাহ' হিসেবে উল্লেখ করেন?
১০. কত সালে বাংলার সিংহাসনে পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়?
১১. কত বছর পর্যন্ত বাংলায় হাবশী শাসন কায়েম ছিল?
১২. মুজাফফর শাহ কেমন শাসক ছিলেন?

**খ. সঠিক উত্তরটি লিখুন**

১. রাজা গণেশ কোন অঞ্চলের জমিদার ছিলেন?
ক. গৌড় খ. পাণ্ডুয়া
গ. ভাতুড়িয়া ঘ. সোনারগাঁও

২. জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ কোথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন?
ক. গৌড়ে খ. পাণ্ডুয়ায়
গ. সাতগাঁওয়ে ঘ. সোনারগাঁওয়ে

৩. কত খ্রিস্টাব্দে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের মৃত্যু হয়?
ক. ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে
গ. ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৪৬২ খ্রিস্টাব্দে

৪. সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহ কাকে গুণরাজ খান উপাধি দেন?
ক. বৃহস্পতি মিশ্রকে খ. মালাধর বসুকে
গ. কৃত্তিবাসকে ঘ. মনসুর সিরাজীকে

৫. গৌড়ের কদম রসুল মসজিদ কোন সুলতানের সময় তৈরি হয়?
ক. ইউসুফ শাহের খ. ফতেহ শাহের
গ. ফিরুজ শাহের ঘ. মুজাফফর শাহের

**গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. বাংলার ইতিহাসে রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরদের রাজত্বকালের বিবরণ দিন।
২. পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ ও রুকনউদ্দিন বারবক শাহের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।
৩. বাংলায় কিভাবে হাবশীদের উত্থান হয়? কয়েকজন হাবশী সুলতানের নাম করুন। কিভাবে হাবশী শাসনের অবসান ঘটে।

## পাঠ-৯ : হুসেন শাহী বংশের শাসনাধীনে বাংলা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ হুসেন শাহী বংশের বর্ণনা দিতে পারবেন।

☞ আলাউদ্দিন হুসেন শাহের কৃতিত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

☞ নাসিরুদ্দিন নুসরাত শাহের রাজত্বকালের বর্ণনা দিতে পারবেন।

☞ কীভাবে বাংলার স্বাধীনতার অবসান ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ৯.১ হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা

বাংলায় স্বাধীন সুলতানদের শাসনকালে হুসেন শাহী আমল ছিল সবচেয়ে কৃতিত্বের যুগ। শেষ হাবশী সুলতান মুজাফফর শাহ নিহত হলে উজির সৈয়দ হুসেন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সিংহাসনে বসে সৈয়দ হুসেন সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। এই সুলতানের নাম থেকেই তাঁর বংশের নাম হয় হুসেন শাহী বংশ। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বংশের চারজন সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, নাসিরুদ্দিন নুসরত শাহ, আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহ ও গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। এদের শাসনকালে বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে সারা বাংলা জুড়ে এ যুগে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়।

### ৯.২ সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ( ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.)

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলেন হুসেন শাহী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান। তাঁর আদি বাস তুর্কীস্থানের তিরমিজ শহরে। পিতা সৈয়দ আশরাফ আল হুসেন ও ভাই ইউসুফের সাথে তিনি বাংলায় আসেন। পরিবারটি রাঢ়ের চাঁদপাড়া অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। হুসেনের বাল্যকাল সম্পর্কে দু'ধরনের কাহিনী প্রচলিত। প্রথমটিতে জানা যায়, তিনি বাল্যকালে চাঁদপাড়ায় এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে কাজ করতেন। আর অন্যটি হচ্ছে, চাঁদপাড়ার কাজী তাঁদের দুই ভাইকে লালন-পালন করেন ও শিক্ষা দীক্ষায় পারদর্শী করে তোলেন। তাঁদের উচ্চ-বংশমর্যাদার কথা শুনে কাজী তাঁর কন্যার সাথে হুসেনের বিয়ে দেন। হুসেন পরে বাংলার রাজধানী গৌড়ে যান এবং মুজাফফর শাহের অধীনে চাকরি নেন। পরবর্তীকালে তিনি উজির হন এবং মুজাফফর শাহ নিহত হলে বাংলার সিংহাসনে বসেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। দীর্ঘ ২৬ বছর তিনি রাজত্ব করেন। এসময় বাংলার রাজ্যসীমা অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি কামরূপ ও কামতা জয় করেন। উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশ তাঁর অধিকারে আসে। তিনি আরাকানীদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম পুনরাধিকার করেন। তিনি দিল্লির সুলতান সিকান্দার লোদীর বাংলা অভিযান ব্যর্থ করে দেন। একমাত্র আসাম অভিযানে তিনি সফল হতে পারেননি। হুসেন শাহ তাঁর রাজ্যসীমা শুধু বৃদ্ধিই করেননি, রাজ্যের সব ধরনের নিরাপত্তা বিধানও করেছিলেন। ধর্মের ব্যাপারে হুসেন শাহ উদার ছিলেন। বহু হিন্দুকে তিনি উচ্চ রাজপদ দেন। তাঁর উজির ছিলেন পুরন্দর খান। তাঁর একজন সেনাপতির নাম গৌরমল্লিক। রূপ ও সনাতন নামের দুই ভাই ছিলেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তাঁর প্রধান চিকিৎসকের নাম মুকুন্দ দাস। দেহরক্ষীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছিলেন কেশব ছত্রী, মুদ্রাশালার প্রধান ছিলেন অনুপ। এছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ হিন্দুদের দেওয়া হয়। অনেক হিন্দু কবিও হুসেন শাহ ও তাঁর কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। তাই বিভিন্ন হিন্দু লেখক হুসেন শাহকে 'নৃপতি তিলক', 'জগৎ ভূষণ', 'কৃষ্ণাবতার' প্রভৃতি উপাধি দিয়েছিলেন। হুসেন শাহ আরবি ও ফারসি সাহিত্যের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর সাহায্য পেয়েছেন কবি বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস ও যশোরাজ খান। হুসেন শাহের কর্মকর্তা পরাগল খান ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী বাংলা

ভাষায় মহাভারত রচনা করেছিলেন। হুসেন শাহের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্য নব্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। এই ধর্ম প্রচারে হুসেন শাহ চৈতন্যকে বাধা দেননি। কখনও কখনও তিনি তাঁকে সহযোগিতা করেছেন।

হুসেন শাহ ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তিনি মালদহে মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। পাণ্ডুয়ায় সূফী নূর কুতুবুল আলমের দরগায় মসজিদ তৈরি করেন। হুসেন শাহের সময় নির্মিত বহু মসজিদের মধ্যে গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ এবং গুমতিদ্বার সৌন্দর্যের দিক থেকে সবাইকে আকৃষ্ট করে। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সাফল্যের সাথে রাজ্য পরিচালনা করে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

### ৯.৩ সুলতান নাসিরুদ্দিন নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রি.)

পিতার মৃত্যুর পর নুসরত শাহ নাসিরুদ্দিন আবুল মুজাফফর নুসরত শাহ নাম নিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসেন। এর আগেই হুসেন শাহ রাজকার্য পরিচালনায় নুসরত শাহকে কিছু কিছু ক্ষমতা দিয়েছিলেন। পিতার মতো তিনিও ছিলেন দক্ষ শাসক। প্রায় সমগ্র বিহার তাঁর অধিকারে আসে। মোগল সম্রাট বাবরের সাথে প্রথমে তিনি মিত্রতা স্থাপন করেন। কিন্তু পরে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয় না। নুসরত শাহ বাবরের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। পিতার মতো নুসরত শাহ বাংলা সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্টপোষকতা করেন। সমসাময়িক অনেক কবি শ্রদ্ধার সাথে নুসরত শাহের নাম উল্লেখ করেছেন। কবি শেখর নুসরত শাহের একজন কর্মচারী ছিলেন। স্থাপত্য শিল্পেও নুসরত শাহের কৃতিত্ব ছিল। গৌড়ের বিখ্যাত 'বার দুয়ারী মসাজিদ' তিনি তৈরি করেন। ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে নুসরত শাহ আততায়ীর হাতে নিহত হন।

### ৯.৪ সুলতান আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহ (১৫৩২-৩৩ খ্রি.)

নুসরত শাহের পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহ ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আসেন। তিনি প্রায় এক বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁর স্বল্পকালীন রাজত্বে তেমন উল্লেখ করার মতো ঘটনা ঘটেনি। নুসরত শাহের সময় থেকে অহোম রাজ্যের সাথে বাংলার সংঘর্ষ চলছিল। ফিরুজ শাহের সময়ও তা অব্যাহত থাকে। যুবরাজ থাকার সময়েই তিনি কবি শ্রীধর কবিরাজের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁর উৎসাহে শ্রীধর তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন।

### ৯.৫ গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রি.)

গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ ছিলেন নুসরত শাহের ছোট ভাই। তিনি ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ভাইয়ের ছেলে ফিরুজ শাহকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। তিনি পাঁচ বছর রাজত্ব করেন। আফগান নেতা শেরশাহ শূরের সাথে তাঁর সংঘর্ষ চলতে থাকে। অবশেষে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ গৌড় দখল করেন। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলার দুশো বছরের স্বাধীনতারও অবসান হয়।

**সার-সংক্ষেপ**

হাবশী শাসনের অবসান করে বাংলার ক্ষমতায় আসেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। তিনি ছিলেন বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য শাসক। হুসেন শাহের মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় হুসেন শাহী যুগ। হুসেন শাহী যুগের শাসকদের কৃতিত্বপূর্ণ শাসনে বাংলার সীমা সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যকলার প্রভূত উন্নতি হয়। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল সময় ছিল হুসেন শাহী যুগ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৯

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**
**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. হুসেন শাহী বংশের শেষ সুলতানের নাম কি?
ক. নুসরত শাহ খ. হুসেন শাহ গ. মাহমুদ শাহ ঘ. ফিরুজ শাহ

২. কোন শহরে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের জন্ম হয়?
ক. চাঁদপাড়া খ. তিরমিজ গ. গৌড় ঘ. সাতগাঁও

৩. হুসেন শাহের ব্যক্তিগত চিকিৎসকের নাম কী?
ক. পরাগল খাঁ খ. কেশব ছত্রী গ. মুকুন্দ দাস ঘ. পুরন্দর খান

৪. ছোট সোনা মসজিদের নির্মাতা কে?
ক. হুসেন শাহ খ. নুসরত শাহ গ. মাহমুদ শাহ ঘ. ফিরুজ শাহ

৫. মোগল সম্রাট বাবরের সাথে কার যুদ্ধ হয়?
ক. শেরশাহের খ. নুসরত শাহের গ. মাহমুদ শাহের ঘ. কেশব ছত্রীর

৬. কোন কবি ফিরুজ শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন?
ক. বিজয়গুপ্ত খ. বিপ্রদাস গ. শ্রীকর নন্দী ঘ. শ্রীধর কবিরাজ

৭. সুলতানী যুগের শেষ স্বাধীন সুলতান কে?
ক. আলাউদ্দিন ফিরুজশাহ খ. গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ গ. শেরশাহ শূর ঘ. বাবর

**খ. এক কথায়/এক বাক্যে উত্তর লিখুন**

১. সৈয়দ হুসেন শাহ কখন বাংলার ক্ষমতা দখল করেন?
২. হুসেন শাহী বংশের শাসনাধীনে বাংলার অবস্থা কেমন ছিল?
৩. সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ কে ছিলেন?
৪. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ কত বছর রাজত্ব করেন?
৫. কে, কাদেরকে বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেন?
৬. কোন বাংলার সুলতান দিল্লির সুলতান সিকান্দর লোদীর বাংলা অভিযান ব্যর্থ করে দেন?
৭. হুসেন শাহকে বিভিন্ন হিন্দু লেখক কি কি উপাধিতে ভূষিত করেন?
৮. কোন কোন হিন্দু কবি হুসেন শাহের সাহায্য পেয়েছিলেন?
৯. কার প্রেরণায়, কে মহাভারত বাংলা ভাষায় রচনা করেন?
১০. শ্রীচৈতন্য নব্য বৈষ্ণব ধর্ম কোন সময় প্রচার করেন?
১১. গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ কে তৈরি করেন?
১২. মোগল সম্রাট বাবরের সাথে কে মিত্রতা স্থাপন করেন?
১৩. গৌড়ের বিখ্যাত ‘বার দুয়ারী মসজিদ’ কে তৈরি করেন?
১৪. কার উৎসাহে কে ‘বিদ্যা সুন্দর’ কাব্য রচনা করেন?
১৫. কার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলার দু’শো বছরের স্বাধীনতার অবসান ঘটে?

**গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. হুসেন শাহী বংশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. আলাউদ্দিন হুসেন শাহের কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।
৩. স্বাধীন সুলতান হিসেবে নাসিরুদ্দিন নুসরত শাহের রাজত্বকালের বিবরণ দিন।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৫

**বিশদ উত্তর-প্রশ্ন**

১. ইসলামের অভ্যুদয়ের ইতিবৃত্ত লিখুন।
২. হযরত মুহম্মদ (স) ও ইসলামের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখুন।
৩. খুলাফায়ে রাশেদীন কারা? তাদের শাসন ব্যবস্থার বিবরণ দিন।
৪. ভারত উপ-মহাদেশে মুসলিম শাসক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিখুন।
৫. আরবদের সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৬. সুলতান মাহমুদ কীভাবে ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন আলোচনা করুন।
৭. মুইজুদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরীর বিজয় কাহিনী লিখুন।
৮. বাংলায় মুসলিম আগমণের ইতিবৃত্ত লিখুন।
৯. বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয় এবং বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১০. বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১১. বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনামল বর্ণনা দিন।
১২. রাজা গণেশ সম্পর্কে বিবরণ দিন।
১৩. বাংলায় পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের বিবরণ দিন।
১৪. বাংলায় হুসেন শাহী বংশের শাসনের ইতিহাস লিখুন।

ইউনিট ৬

# বাংলায় আফগান ও মোগলদের শাসন

## ভূমিকা

১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসনের অবসান হয়। মোগল সম্রাট হুমায়ুন শেরশাহের অধিকার থেকে গৌড় দখল করে নিলেও তা ধরে রাখতে পারেননি। হুমায়ুনের পরাজয়ের পর বাংলা-বিহার অঞ্চল আফগানদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তাদের মধ্যে দুই বংশের শাসকরা এ সময় বাংলার ক্ষমতায় আসে। শেরশাহ ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা ছিলেন শূর বংশের। পরবর্তী শাসকরা ছিলেন কররানী বংশের। কররানী বংশের শাসক দাউদ খানের হাত থেকে মোগল সম্রাট আকবর বাংলা কেড়ে নেন। সূত্রপাত ঘটে বাংলায় মোগল শাসনের। কিন্তু আকবরের শাসনামলে মোগল অধিকার বাংলার উত্তর-পশ্চিম এলাকাতেই সীমিত থাকে। পূর্ববঙ্গসহ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে অনেক স্বাধীন জমিদার ছিল যারা মোগল শাসন সহজে মেনে নেয়নি। তাঁদের বলা হতো বারভূঁইয়া। তাঁরা মোগলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। আকবরের সেনাপতিরা তাঁদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু তাদের দমন করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে সুবাদার ইসলাম খান বারভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ–


- ➔ পাঠ ১ : বাংলায় আফগান শাসন
- ➔ পাঠ ২ : সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়
- ➔ পাঠ ৩ : বাংলার বারভূঁইয়া

## পাঠ-১ : বাংলায় আফগান শাসন (১৫৩৮-৭৬ খ্রি.)

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

☞ বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
☞ শূর আফগান বংশের রাজত্বের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ কররানী আফগানদের শাসনকাল সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

### ১.১ বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি

বাংলায় আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শের খান শূর। উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার ও বাংলার দখল নিয়ে এ আফগান নেতা মোগল সম্রাট হুমায়ুনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি ছিলেন বিহারে অবস্থিত সাসারাম অঞ্চলের জায়গীরদার। সমগ্র ভারতের অধিপতি হবার স্বপ্ন ছিল তাঁর মনে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য শের খান শক্তিশালী চুনার দুর্গ ও বিহার অধিকার করে নেন। ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি দু'বার বাংলার রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন। বাদশাহ হুমায়ুন অনুভব করলেন যে শের খানের কার্যকলাপকে আর উপেক্ষা করা যায় না। তিনি প্রথমে চুনার দুর্গ ও বিহার শের খানের নিকট থেকে কেড়ে নেন। পরে তাঁকে ধাওয়া করে তিনি গৌড়ে উপস্থিত হন। রণকুশলী শের খান যুদ্ধে না জড়িয়ে বাংলা ত্যাগ করেন। সে সুযোগে হুমায়ুন গৌড় দখল করে নেন (১৫৩৮ খ্রি.)। গৌড়ের সুরম্য প্রাসাদসমূহ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে তিনি এর নাম দেন জান্নাতাবাদ। জাহাঙ্গীর কুলীকে তিনি বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং গৌড়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মোগল সৈন্য রাখার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দিল্লি ফেরার পথে বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে শের খানের সঙ্গে হুমায়ুনের তুমুল যুদ্ধ হয় (১৫৩৯ খ্রি.)। হুমায়ুন পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। আফগান নেতা শের খান 'শেরশাহ' উপাধি ধারণ করে বিহারের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ত্বরিতগতিতে গৌড় আক্রমণ করে মোগল শাসক জাহাঙ্গীর কুলী ও তাঁর অনুচরদের নিহত করে তিনি বাংলা অধিকার করে নেন। একই বছর অর্থাৎ ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে তিনি পুনরায় হুমায়ুনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন লাভ করেন। এর ফলে বাংলা আবার দিল্লির অধীনে চলে যায়। চট্টগ্রাম ও সিলেট পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ শেরশাহের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

### ১.২ বাংলায় শূর আফগান বংশের শাসনকাল

শেরশাহ শূর-এর বংশের শাসনকালই বাংলার ইতিহাসে শূর-আফগান বংশের শাসনামল নামে পরিচিত। শের শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইসলাম শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত (১৫৪৫-৫৩ খ্রি.) বাংলা দিল্লির অধীনে ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আফগান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এ সুযোগে আফগান শাসনকর্তা মুহম্মদ শাহ শূর বাংলায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে আরাকানের মগরা চট্টগ্রাম দখল করে। মগদের পরাজিত করে মুহম্মদ শাহ চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেন এবং আরাকান অধিকার করেন। কিন্তু উচ্চাভিলাসের কারণে দিল্লি দখল করার চেষ্টা করে তিনি আদিল শাহের সেনাপতি হিমুর হাতে পরাজিত ও নিহত হন (১৫৫৫ খ্রি.)। মুহম্মদ শাহের পুত্র বাহাদুর শাহ শূর পিতার মৃত্যুর পর গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। তিনি পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেন আদিল শাহ শূরকে নিহত করে। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হলে তাঁর ভাই জালাল শাহ শূর গৌড়ের সুলতান হন। তিনি তিন বছর রাজত্ব করেন। এরপর তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারীকে হত্যা করে গিয়াসউদ্দিন নামে এক ব্যক্তি বাংলার সিংহাসন দখল করে। এর ফলে বাংলায় শূর আফগান বংশের শাসনের অবসান হয়।

### ১.৩ কররানী আফগান বংশের শাসনকাল (১৫৬৪-১৫৭৬ খ্রি.)

'কররানী' আফগানদেরই অন্য একটি বংশের নাম। এ বংশের তাজ খান ও সুলায়মান খান শের শাহের সেনাপতি ছিলেন। ইসলাম শাহের রাজত্বকালে তাজ খান সেনাপতি ও সুলতানের পরামর্শদাতা ছিলেন। বাংলার সিংহাসনের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল। গিয়াসউদ্দিন যখন শূর-আফগানদের ক্ষমতা কেড়ে নেয় তখন সুযোগ বুঝে তিনি গৌড় আক্রমণ করেন। গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা করে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলা জয় করেন। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় কররানী বংশের শাসন।

তাজ খান কররানী অল্পদিন রাজত্ব করে মারা যান। পরে তাঁর ভাই সুলায়মান কররানী বাংলার সুলতান হন। তিনি ছিলেন একজন সুচতুর ও দক্ষ শাসনকর্তা। আফগান সর্দারদের ঐক্যবদ্ধ করে তিনি বাংলা ও বিহারে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। উড়িষ্যাতেও তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর পুত্র বায়েজিদ এবং সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয়ের নেতৃত্ব দেন। কুচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহ কররানী রাজ্য জয় করার জন্য যে বাহিনী পাঠিয়েছিল তারা সুলায়মান কররানীর সৈন্যদের কাছে চরম পরাজয় বরণ করে। তিনি তাঁর বিজ্ঞ বিবেচনা ও কৌশলী নীতি দ্বারা মোগল সম্রাট আকবরের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিলেন। সে কারণে আকবর কররানী রাজ্য আক্রমণ করার কোন অজুহাত পান নাই। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে

সুলায়মান কররানীর মৃত্যু হলে সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র বায়েজিদ। তিনি একজন অত্যাচারী শাসক ছিলেন এবং আফগান সর্দারদের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। এবার সিংহাসনে বসেন সুলায়মান কররানীর দ্বিতীয় পুত্র দাউদ কররানী। বাংলায় আফগান শাসনকর্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ। দাউদ কররানী অদূরদর্শী শাসক ছিলেন। তাঁর সময়েই সম্রাট আকবর বাংলা দখল করে নেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে মোগলদের হাতে বন্দি হবার পর দাউদ কররানীকে হত্যা করা হয়। ফলে বাংলায় কররানী আফগান বংশের শাসনের অবসান হয়।

**সার-সংক্ষেপ**

বাংলায় আফগান শাসনের সূচনা করেন শেরশাহ। মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি দিল্লি দখল করেন। একই সঙ্গে বাংলার উপরও তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শেরশাহ ছিলেন শূর বংশের। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় এ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। এরপর আফগানদেরই আরেক বংশ কররানীদের শাসন শুরু হয়। তাজ খান বাংলার ক্ষমতা দখল করলে শুরু হয় কররানী বংশের শাসন। এ বংশের সবচেয়ে যোগ্য ও দূরদর্শী শাসক ছিলেন সুলায়মান খান কররানী। শেষ শাসক দাউদ খান কররানীর সময় মোগল সম্রাট আকবর বাংলা জয় করেন। এর ফলে বাংলায় আফগান শাসনের অবসান হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.১

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. সাসারাম কোথায় অবস্থিত?
ক. দিল্লিতে খ. উড়িষ্যায় গ. বিহারে ঘ. ত্রিপুরায়

২. গৌড়ের নাম জান্নাতাবাদ কে রাখেন?
ক. বাবর খ. হুমায়ুন গ. শেরশাহ ঘ. তাজ খান

৩. বাংলায় কররানী বংশের প্রতিষ্ঠা কে করেন?
ক. শেরশাহ খ. বাহাদুর শাহ গ. তাজ খান ঘ. সুলায়মান খান

৪. কালাপাহাড় কে ছিলেন?
ক. মোগল সেনাপতি খ. মগ সেনাপতি গ. কররানী সেনাপতি ঘ. শূর আফগান সেনাপতি

৫. কার সময় বাংলা মোগলদের হাতে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে?
ক. দাউদ খান কররানী খ. সুলায়মান কররানী গ. বায়োজিদ কররানী ঘ. তাজ খান কররানী

**খ. মিল করুন**

| | |
|---|---|
| ১. মোগল সম্রাট হুমায়ুনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাত জড়িয়ে পড়েন —— | ১. বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানের যুদ্ধে। |
| ২. শেরখান শূর উত্তরাধিকার সূত্রে ছিলেন —— | ২. ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে। |
| ৩. শেরখান শূর দিল্লির সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করেন —— | ৩. ইসলাম শাহ। |
| ৪. শেরখান শূর —— উপাধি ধারন করে বিহারের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। | ৪. দাউদ কররানী নিহত হওয়ার সময়ে। |
| ৫. শেরশাহ দিল্লির সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন | ৫. 'শেরশাহ'। |
| ৬. শেরশাহের পুত্র ও উত্তারাধিকারী —— | ৬. সাসারাস অঞ্চলের জায়গীরদার। |
| ৭. বাংলায় কররানী আফগান বংশের অবসান হয়—— | ৭. শেরখান শূর। |

**গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করুন।
২. বাংলায় শূর বংশের শাসনকালের বর্ণনা দিন।
৩. বাংলায় কররানী বংশের শাসনকাল আলোচনা করুন।

## পাঠ-২ : সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ মোগল সম্রাট আকবর বাংলায় কেন সামরিক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
☞ সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত হবেন।

### ২.১ সম্রাট আকবরের বাংলায় সামরিক অভিযানের কারণ

কররানী বংশীয় সুলতান সুলায়মান তাঁর কৌশলী নীতি দ্বারা সম্রাট আকবরের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু পিতার ন্যায় দাউদ কররানী এত বুদ্ধিমান ছিলেন না। বিশাল রাজ্য, শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ও প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে তিনি নিজেকে সম্রাট আকবরের সমকক্ষ ভাবতে থাকেন। বাদশাহ উপাধি নিয়ে তিনি নিজ নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা অঙ্কিত করেন। এতদিন বাংলার আফগান শাসকগণ মোগলদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন। দাউদ কররানীর আচরণে সম্রাট আকবর বাংলায় সামরিক অভিযানের কারণ পেয়ে যান।

সম্রাট আকবর বহুদিন থেকে কররানী রাজ্য জয়ের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণাধিকার তাঁর লক্ষ্য ছিল। তা ছাড়া আফগানরা এমনিতেই মোগলদের শত্রু ছিল। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ধ্বংস করাকে তিনি নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেছিলেন। প্রথমে তিনি জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খানকে নির্দেশ দেন কররানী রাজ্য দখল করার জন্য।

### ২.২ আকবরের বাংলা বিজয়ের ইতিহাস

১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে মুনিম খান বিহার আক্রমণ করেন। প্রতিরোধ যুদ্ধে না গিয়ে দাউদ খান কররানী উজির লোদীর পরামর্শে মুনিম খানের সঙ্গে ধনরত্ন দিয়ে আপোস করেন। এতে সম্রাট আকবর অসন্তুষ্ট হন। তিনি পুনরায় মুনিম খানকে বাংলা বিহার অধিকার করার নির্দেশ দেন। পরের বছর মুনিম খান সর্বশক্তি নিয়ে আবার বিহার আক্রমণ করেন। দাউদ কররানী ও তাঁর সেনাপতিরা সুরক্ষিত পাটনা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সে কারণে সম্রাট আকবর স্বয়ং বিহার অভিযানে অগ্রসর হন। তিনি গঙ্গানদীর অপর তীরে হাজিপুর দখল করে পাটনা দুর্গের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেন। এতে নিরাশ হয়ে আফগানরা বাংলার দিকে পালিয়ে যায়। আকবর পাটনা দুর্গ দখল করেন। এরপর মুনিম খানের উপর অভিযানের ভার দিয়ে তিনি রাজধানী আগ্রায় ফিরে যান।

বিহারের অন্যান্য স্থান অধিকার করে মুনিম খান বাংলার দিকে অগ্রসর হন। কররানীদের রাজধানী ছিল তান্ডায়। তারা রাজধানী ছেড়ে হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে আশ্রয় নেয়। তান্ডা অধিকার করে মোগল সৈন্যরা সপ্তগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। দাউদ খান পালিয়ে যান উড়িষ্যায়। মুনিম খান ও মোগল সেনাপতি রাজা টোডরমল তাঁকে অনুসরণ করেন। তুকারয় নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয় (৩ মার্চ ১৫৭৫ খ্রি.)। দাউদ খান কটক দুর্গে আশ্রয় নিলে মোগল সৈনরা তা ঘিরে ফেলে। দাউদ খান বাধ্য হয়ে মোগলদের সাথে সন্ধি করেন। কটকের সন্ধি নামে পরিচিত চুক্তি অনুযায়ী দাউদখান মোগল সম্রাটের সামন্তরূপে উড়িষ্যা শাসনের অধিকার পান। তিনি সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন।

মুনিম খান তান্ডায় ফিরে গেলে অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করেন। এখানে প্লেগ রোগের মহামারীতে অনেক মোগল সৈন্য মারা যায়। এ বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগে দাউদ খান পশ্চিম ও উত্তর বাংলা পুনরায় দখল করেন। তিনি রাজধানী তান্ডায় পুনঃপ্রবেশ করেন। ভাটির জমিদার ঈসা খান পূর্ব বাংলা হতে মোগল নৌবহর বিতাড়িত করেন। বাধ্য হয়ে মোগল সৈন্যরা বাংলা ছেড়ে বিহারে আশ্রয় নেয়।

মুনিম খানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সম্রাট আকবর বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠান খান জাহান হোসেন কুলি খানকে। রাজা টোডরমল তাঁর সহকারী নিযুক্ত হন। রাজমহলের প্রবেশ পথে দাউদ খান মোগল সৈন্যদের বাধা দেন। সম্রাটের নির্দেশে বিহারের শাসনকর্তা মুজাফফর খান তুরবাতি আরো সৈন্য নিয়ে তাদের সাথে এগিয়ে আসেন। অবশেষে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের নিকট মোগল ও আফগানদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়। রাজমহলের যুদ্ধ নামে পরিচিত এই লড়াইয়ে দাউদ খানের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। পরে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এভাবে বাংলায় কররানী-আফগান শাসন শেষ হয় এবং মোগল শাসনের সূত্রপাত ঘটে। তখন অবশ্য বাংলার বারভূঁইয়াদের কারণে মোগল অধিকার খুব বেশি বিস্তৃত হতে পারেনি। বাংলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেই মোগল শাসন সীমিত থাকে।

**সার-সংক্ষেপ**

সম্রাট আকবর অনেক দিন থেকেই বাংলা বিজয়ের সুযোগ খুঁজছিলেন। কিন্তু কররানী বংশের আফগান শাসকরা বহুদিন সে সুযোগ দেননি। শেষ আফগান শাসক দাউদ খান তাঁর অহংকারী মনোভাব দেখিয়ে মোগল আক্রমণকে অনিবার্য করে তোলেন। তাঁর সময় সম্রাট আকবরের সেনাপতিরা বিহার ও বাংলা আক্রমণ করে। উড়িষ্যা পর্যন্ত তাঁরা দাউদ ও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ধাওয়া করে। শেষ যুদ্ধ সংঘটিত হয় রাজমহলে (১৫৭৬ খ্রি.)। এ যুদ্ধে দাউদ কররানীর শোচনীয় পরাজয়ের পর বাংলা মোগল সম্রাট আকবরের অধিকারে আসে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. জৌনপুরের শাসনকর্তা কে ছিলেন?

ক. রাজা মনি সিং খ. মুনিম খান গ. কালাপাহাড় ঘ. হোসেন কুলি খান

২. দাউদ খানের হাত থেকে আকবর কোন দুর্গ দখল করেন?

ক. আগ্রার দুর্গ খ. কটক দুর্গ গ. পাটনা দুর্গ ঘ. চুনার দুর্গ

৩. কররানী আফগানদের রাজধানী কোথায় ছিল?

ক. হাজিপুরে খ. তান্ডায় গ. সপ্তগ্রামে ঘ. কলকাতায়

৪. রাজমহলের যুদ্ধ কত সালে হয়?

ক. ১৫৭২ সালে খ. ১৫৭৪ সালে গ. ১৫৭৬ সালে ঘ. ১৫৭৮ সালে

৫. প্রথমদিকে মোগল শাসন বাংলার কোন অঞ্চলের মধ্যেই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ ছিল?

ক. উত্তর-পূর্ব খ. দক্ষিণ-পশ্চিম গ. দক্ষিণ-পূর্ব ঘ. উত্তর-পশ্চিম

**খ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. মুনিম খান কোথাকার শাসনকর্তা ছিলেন?
২. ঈশা খান কোথাকার জমিদার ছিলেন?
৩. বিহারের কোন শাসনকর্তা মোগলদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন?
৪. টোডরমল কে ছিলেন?
৫. মুনিম খান কিভাবে মারা যান?
৬. কোন যুদ্ধে দাউদ খানের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে?
৭. কি কারণে বাংলায় মোগর অধিকার খুব বেশি বিস্তৃত হতে পারেনি?

**গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. সম্রাট আকবরের বাংলা অভিযানের কারণ ব্যাখ্যা করুন।
২. সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের বর্ণনা দিন।

## পাঠ-৩ : বাংলার বারভূঁইয়া

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ বাংলার বারভূঁইয়াদের পরিচয় সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
☞ সম্রাট আকবরের সময়ে বারভূঁইয়াদের প্রতিরোধ সম্পর্কে অবহিত হবেন।
☞ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বারভূঁইয়াদের কিভাবে দমন করা হয় তা বর্ণনা দিতে পারবেন।

### ৩.১ বাংলার বারভূঁইয়াদের পরিচয়

সম্রাট আকবর পুরো বাংলার উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। তখন মোগল অধিকার উত্তর-পশ্চিম বাংলার নগর ও দুর্গ এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার বড় বড় জমিদাররা মোগল শাসন মেনে নেয়নি। দীর্ঘদিন তারা বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় তৎপর ছিল। দাউদ কররানীর হত্যার পর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আফগান এবং হিন্দু সামন্ত প্রধান স্বাধীন হয়ে যায়। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একজোট হয়ে তাঁরা মোগল সেনাপতিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। বাংলার ইতিহাসে এ জমিদারগণ বারভূঁইয়া নামে পরিচিত। তবে বার বলতে বারো জনের সংখ্যা বুঝায় না।

বারভূঁইয়ার উৎপত্তি হয় বাংলার আফগান শাসন আমলে। সে সময় সামরিক কর্মচারীদের জায়গীর দেওয়া হতো। বারভূঁইয়াদের কেউ কেউ এসব জায়গীরদারদের বংশধর ছিলেন। তাছাড়া রাজস্ব আদায়ের জন্য তখন ইজারাদার নিয়োগ করা হতো । কোন কোন ক্ষেত্রে ইজারাদারী বংশগত হয়ে পড়ে এবং এসব ইজারাদাররা পরবর্তীকালে জমিদার নামে পরিচিত হন। আফগান শাসন পতনের পর অনেক পাঠান সরদার বাংলায় আশ্রয় নেন। এদের কেউ কেউ একটি অঞ্চল দখল করে স্বাধীন জমিদারির প্রতিষ্ঠা করেন। বারভূঁইয়াদের প্রধান নেতা ছিলেন সোনারগাঁওয়ের জমিদার ঈসা খান। হুসেন শাহী বংশের অবসান হলে ঈসা খানের পিতা সুলায়মান খান সোনারগাঁও অঞ্চলে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। ভাওয়ালের গাজী পরিবার জমিদারি গড়ে তোলে শেরশাহের বাংলা জয়ের পূর্বেই। এভাবে ক্রমে ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, মানিকগঞ্জ, বরিশাল, নোয়াখালী, সিলেট অঞ্চলে অনেক বড় বড় জমিদারি গড়ে ওঠে। বাংলার পশ্চিম অংশেও বেশ কিছু জমিদারি সৃষ্টি হয়। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এসব জমিদারি ছিল। হিন্দু জমিদারদের মধ্যে বাঁকুড়ার বীর হামির, চন্দ্রদ্বীপের পরমান্দ রায়, ভূলুয়ার লক্ষ্মণমানিক্য, যশোরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায়, পাবনার রাজা রায়, মানিকগঞ্জের বিনোদ রায় প্রধান ছিলেন।

### ৩.২ সম্রাট আকবরের সময়কালে বারভূঁইয়াদের প্রতিরোধ

বারভূঁইয়াদের দমন করে সম্রাট আকবর পুরো বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ মনোযোগ দেন। তাঁর সুবাদার শাহবাজখান, সাদিকখান ও রাজা মানসিংহ বহুবার ঈশাখান ও অন্যান্য জমিদারদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কিন্তু তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। রাজা মানসিংহ একবার ঈসাখানের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঈসাখানের মৃত্যুর পর বারভূঁইয়াদের নেতা হন তাঁর পুত্র মুসা খান। রাজা মানসিংহ ১৬০১ সালে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলায় আসেন। এবার তিনি জমিদারদের শক্তি খর্ব করতে কিছুটা সফল হন। কিন্তু সম্রাট আকবরের অসুস্থতার জন্য ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ফিরে যেতে হয়।

### ৩.৩ সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বারভূঁইয়াদের দমনের ব্যবস্থা

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার বারভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করা সম্ভব হয়। এ কাজে পুরোপুরি সফল হন সুবাদার ইসলাম খান। তিনি বারভূঁইয়াদের দমনের উদ্দেশ্য বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন। কারণ জমিদারদের নেতা মুসাখানের মূল ঘাঁটি ছিল ঢাকার অদূরে সোনারগাঁওয়ে। ঢাকায় আসার পথে ইসলাম খান কুটকৌশলে কয়েকজন জমিদারের আনুগত্য পেয়ে যান। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বারভূঁইয়াদের প্রতিহত করার জন্য তিনি একটি শক্তিশালী নৌবহর ব্যবহার করেন।

মুসা খানের সাথে মোগল সৈন্যদের প্রথম সংঘর্ষ হয় ১৬০৯ খ্রিস্টব্দে করতোয়া নদীর পূর্ব তীরে যাত্রাপুরে। এখানে মুসা খানের দুর্গ ছিল। প্রথম দিকে মোগল সৈন্যদের ক্ষতি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইসলাম খানের আক্রমণের মুখে মুসা খান ও তাঁর মিত্র জমিদারগণ পিছু হটতে বাধ্য হন।

এবার মুসা খানের নেতৃত্বে জমিদারদের নৌবহর একত্রিত হয় শীতলক্ষ্যা নদীতে। এখানেও ইসলাম খানের সৈন্যদের আক্রমণে বারভূঁইয়াদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত মুসা খানের কদম রসুল ও অন্যান্য দুর্গ মোগলদের অধিকারে চলে আসে। মুসা খান আশ্রয় নেন সোনারগাঁওয়ে। কিন্তু মোগলরা সোনারগাঁও দখল করে নেয়। নিরুপায় হয়ে বাহাদুর গাজীসহ অন্যান্য জমিদারগণ একে একে আত্মসমর্পণ করেন। শেষ পর্যন্ত মুসা খানও বাধ্য হন

আত্মসমর্পণ করতে। সুবাদার ইসলাম খান তাঁর সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেন। তিনি মুসা খানকে তাঁর জমিদারিতেই মোগলদের অধীনস্থ জায়গীরদারের দায়িত্ব দেন।

মুসা খানের আত্মসমর্পণের পর অনেক জমিদারই নিরাশ হয়ে পড়েন। একে একে সবাই মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। ভূলুয়ার অনন্ত মানিক্য মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন নি। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি আরাকানে পলায়ন করেন। সিলেট অঞ্চলের আরেক জমিদার উসমান লোহানী মোগল সম্রাটের আধিপত্য মেনে নিতে রাজি হননি। মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি প্রাণ হারান। এভাবে বাংলার বারভূঁইয়াদের শাসনের অবসান হয়।

**সার-সংক্ষেপ**

বাংলায় আফগান শাসনকাল বেশ কিছু স্বাধীন জমিদারের উদ্ভব হয়। ইতিহাসে তাঁরা বারভূঁইয়া নামে পরিচিত। বারভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খান ও মুসা খান জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ করে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হন। সম্রাট আকবরের শাসনকালে অনেক চেষ্টা করেও এসব জমিদারদের দমন করা সম্ভব হয়নি। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নতুনভাবে চেষ্টা চলে। সুবাদার ইসলাম খান তাঁদের বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা নেন। ফলে জমিদারগণ একে একে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। এভাবে বাংলার বারভূঁইয়াদের শাসনকালের অবসান ঘটে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.৩

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. বারভূঁইয়া কাদের বলা হতো?
   ক. বারজন জমিদার
   খ. মোগল সেনাপতিদের
   গ. বাংলার স্বাধীন জমিদারদের
   ঘ. আফগান সর্দারদের

২. বারভূঁইয়াদের প্রধান নেতা কে ছিলেন?
   ক. শেরশাহ
   খ. ঈসা খান
   গ. মান সিংহ
   ঘ. কালা পাহাড়

৩. কোন মোগল সুবাদার ঈসা খানের সঙ্গে সন্ধি করেন?
   ক. ইসলাম খান
   খ. শাহবাজ খান
   গ. রাজা মানসিংহ
   ঘ. শায়েস্তা খান

৪. ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন কে?
   ক. ঈসা খান
   খ. মানসিংহ
   গ. সম্রাট আওরঙ্গজেব
   ঘ. ইসলাম খান

৫. মোগলদের কাছে পরাজিত হয়ে কোন জমিদার আরাকানে পলায়ন করেন?
   ক. মুসা খান
   খ. কেদার রায়
   গ. অনন্ত মানিক্য
   ঘ. উসমান লোহানী

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. বারভূঁইয়া কারা? তাঁদের পরিচয় দিন।
২. বারভূঁইয়াদের কিভাবে দমন করা হয়েছিল তার বর্ণনা দিন?
৩. সম্রাট আকবরের সময়কালে বারভূঁইয়াদের অবস্থা বর্ণনা করুন।
৪. সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বারভূঁইয়াদের অবস্থার বিবরণ দিন।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৬

**বিশদ উত্তর-প্রশ্ন**

১. বাংলায় কীভাবে আফগান শাসনের সূচনা হয়? বাংলায় শূর আফগান বংশের শাসনকাল বর্ণনা করুন।
২. বাংলায় কররানী আফগানদের শাসনামল বর্ণনা করুন।
৩. দিল্লির সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. বাংলার বারভূঁইয়াদের পরিচয় দিন এবং কিভাবে তাদেরকে দমন করা হয়েছিল তার বর্ণনা দিন।

ইউনিট ৭

# মোগল শাসন আমলে বাংলা

## ভূমিকা

বাংলায় মোগল শাসনের দুটি ধাপ ছিল। একটি সুবাদারী শাসন আর অন্যটি নবাবী শাসন। সম্রাট আকবর বাংলা বিজয় করলেও বাংলা 'সুবা' তাঁর শাসনকালে শক্তভাবে দাঁড়াতে পারেনি। এ সময়ে বারভূঁইয়াদের হাতেই ছিল বাংলার মূল ক্ষমতা। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় বারভূঁইয়াদের দমন করা সম্ভব হয় এবং সমগ্র বাংলায় মোগলদের সুবাদারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ছিল সুবাদারী শাসনের স্বর্ণযুগ। বেশ ক'জন দক্ষ সুবাদারের নেতৃত্বে এ সময় বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। আওরঙ্গজেবের পর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের যুগে মোগল শাসন শক্তিহীন হয়ে যায়। এ সুযোগে বাংলার সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। এ যুগ নবাবী আমল নামে পরিচিত। ১৭১৭ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর ছিল নবাবদের শাসনকাল। এ যুগে কোন কোন নবাবের দক্ষতায় বাংলার শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি বাড়ে। অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিকদের প্রতিপত্তিও সাথে সাথে বাড়তে থাকে। ক্ষমতা নিয়ে প্রাসাদের ভেতর চলতে থাকে ষড়যন্ত্র। এরই পথ ধরে এক সময় অবসান ঘটে মোগল শাসনের। মোগল শাসন যুগের গৌরবময় দিক ছিল তাঁদের সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা। বাংলায় মোগল শাসনের অবসান ঘটলেও তাদের শাসন ব্যবস্থার রেশ থেকে যায়।

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ-


- ➔ পাঠ ১ : বাংলায় সুবাদারী শাসন
- ➔ পাঠ ২ : বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান
- ➔ পাঠ ৩ : নবাবী আমলে বাংলা
- ➔ পাঠ ৪ : নবাব আলীবর্দী খান
- ➔ পাঠ ৫ : নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা

## পাঠ-১ : বাংলায় সুবাদারী শাসন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ মোগল যুগে বাংলায় সুবাদারী শাসনের বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ সুবাদার হিসেবে মীর জুমলার কৃতিত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
☞ সুবাদার শায়েস্তা খানের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

### ১.১ বাংলায় সুবাদারী প্রতিষ্ঠা

মোগল সম্রাট আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে অনেকগুলো প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। এই প্রদেশগুলোকে বলা হতো 'সুবা'। সুবার শাসনকর্তাকে বলা হতো সুবাদার। আকবরের সময় থেকে বাংলায় সুবাদার নিয়োগ করা শুরু হয়। তবে বারভূঁইয়াদের দাপটে বাংলায় মোগল সুবা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে দক্ষতার সাথে বারভূঁইয়াদের দমন করেন সুবাদার ইসলাম খান। তিনি ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর থেকে বাংলার সুবাদারদের মাধ্যমে পুরো বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুবাদার ইসলাম খান ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে, ২১ আগস্ট মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর বেশ ক'জন সুবাদার বাংলার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তবে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার মীর জুমলা ক্ষমতা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত কোন সুবাদারই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেননি। ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের ভাই ইব্রাহীম খান ফতেহ জঙ্গকে। তিনি বাংলায় শান্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সময় বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশ উন্নতি হয়। সম্রাট শাহজাহান ক্ষমতা গ্রহণ করার পর কাসিম খান জুয়িনীকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান (১৬২৮ খ্রি.)। এসময় পর্তুগিজ বণিকদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়। এরা ক্রমে বাংলার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কাসিম খান জুয়িনী শক্ত হাতে পর্তুগিজদের দমন করেন।

১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে কাসিম খান জুয়িনী মারা গেলে নতুন সুবাদার হয়ে আসেন ইসলাম খান মাসহাদী (১৬৩৫-১৬৩৯ খ্রি.)। কিন্তু তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি রাখতে পারেননি। এবার শাহজাহান নতুন সুবাদার করে পাঠান তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুহম্মদ সুজাকে (১৬৩৯ খ্রি.)। তিনি দীর্ঘ কুড়ি বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। সুজার শাসনকালে প্রতিবেশী কোন রাজা বাংলা আক্রমণ করেনি। তাই বাংলায় তখন শান্তি বিরাজ করছিল। এই সময় ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকরা বাংলায় বাণিজ্য করছিল। এদের মধ্যে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী সুবাদারের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা লাভ করে। এতে ইংরেজদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই দিল্লির সিংহাসন লাভের জন্য অগ্রসর হতে থাকেন। এ সময় শাহজাদা আওরঙ্গজেবের সাথে শাহজাদা সুজার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ১৬৫৯ খ্রিস্টব্দে দুই ভাইয়ের যুদ্ধে শাহ সুজা পরাজিত হন।

### ১.২ সুবাদার মীর জুমলা (১৬৬০-১৬৬৩ খ্রি.)

শাহ সুজাকে দমন করার জন্য আওরঙ্গজেবের অন্যতম সেনাপতি মীর জুমলা বাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর পর্যন্ত এসেছিলেন। সম্রাট হয়ে আওরঙ্গজেব মীর জুমলাকে বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব দেন। মাত্র তিন বছরের শাসনকালে তিনি কুচবিহার ও আসাম অভিযানে বেশি সময় ব্যয় করলেও ইতিহাসে একজন সফল সুবাদার হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারের জন্য তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে। দক্ষ সেনাপতি হিসেবে সুবাদার মীর জুমলা আসাম ও কুচবিহার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। মীর জুমলার মৃত্যুর পর প্রথমে দিলীর খান ও পরে দাউদ খান অস্থায়ী সুবাদার রূপে বাংলা শাসন করেন। অবশেষে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর মামা শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান জাহাঙ্গীর নগরে তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শায়েস্তা খান দুইবারে দীর্ঘ ২২ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। মাঝখানে ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট তাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এরপর ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার সুবাদার হন। তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী শাসক।

**সার-সংক্ষেপ**

মোগল আমলে প্রদেশকে বলা হতো সুবা। মোগল সম্রাটগণ সুবার শাসনকর্তা হিসেবে সুবাদারদের নিয়োগ করে পাঠাতেন। বারভূঁইয়াদের দমন করার পর বাংলার সর্বত্র মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় থেকে বেশ কজন সুবাদার বাংলা শাসন করেন। এঁদের মধ্যে ইসলাম খান, মীর জুমলা ও শায়েস্তা খান বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের শাসনকালে বাংলা খুব সমৃদ্ধশালী হয়েছিল।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.১

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন :**

১. মোগল সম্রাট —— তাঁর সাম্রাজ্যকে অনেকগুলো প্রদেশে ভাগ করেছিলেন।
২. এই প্রদেশগুলোকে বলা হতো '——'।
৩. সুবার শাসনকর্তাকে বলা হতো ——।
৪. সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে দক্ষতার সাথে বারভূঁইয়াদের দমন করেন সুবাদার —— ——।
৫. সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন সম্রাজ্ঞী —— —— ভাই ইব্রাহীম খান ফতেহ জঙ্গকে।

**খ. সঠিক উত্তরটি লিখুন**

১. কোন মোগল সুবাদার ঈসা খানের সঙ্গে সন্ধি করেন?
   ক. শাহবাজ খান খ. খিজির খান
   গ. রাজা মানসিংহ ঘ. ইসলাম খান
২. কোন সুবাদার ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন?
   ক. ইসলাম খান খ. কাসিম খান চিশতি
   গ. শাহ সুজা ঘ. মীর জুমলা
৩. কুচবিহার ও আসাম কোন সুবাদারের আমলে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়?
   ক. শাহ সুজা খ. মীর জুমলা
   গ. ইব্রাহীম খান ঘ. আযিমুদ্দিন
৪. বাংলার কোন সুবাদার মগ দস্যুদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম জয় করেন?
   ক. ইসলাম খান মাসহাদী খ. কাসিম খান
   গ. শায়েস্তা খান ঘ. ইব্রাহিম খান
৫. ফরাসি পর্যটক বার্ণিয়ার কোন সুবাদারের আমলে বাংলায় আসেন?
   ক. মহব্বত খান খ. শায়েস্তা খান
   গ. মীর জুমলা ঘ. মুর্শিদ কুলী খান

**গ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. বাংলায় সুবাদারী শাসনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. সুবাদার মীর জুমলার কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

## পাঠ-২ : বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ সুবাদার শায়েস্তা খানের পরিচয় দিতে পারবেন।
☞ শায়েস্তা খানের সংস্কারমূলক পদক্ষেপের বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ শায়েস্তা খানের রণ-অভিযানের বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ শায়েস্তা খানের সাথে ইংরেজদের বিরোধের বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ শায়েস্তা খানের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

### ২.১ শায়েস্তা খানের পরিচয়

বাংলার ইতিহাসের সুবাদার শায়েস্তা খানের নাম সবার পরিচিত। তাঁর আমলে দ্রব্যমূল্যের নিম্নতা বিশেষ করে এক টাকায় আট মন চাউল প্রাপ্তির ইতিহাস বাংলার সোনালী ঐতিহ্যের কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রশাসনিক বিশৃংখলাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ক্ষমতায় এসে শায়েস্তা খান যে যোগ্যতার পরিচয় দেন তাঁর ফলে বাংলার ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। শায়েস্তা খান ছিলেন মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মামা। আওরঙ্গজেব কর্তৃক বাংলার সুবাদারী পেয়ে ১৬৬৪ সালের মার্চ মাসে তিনি রাজমহল হয়ে ঢাকায় পৌঁছেন এবং বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। বার্ধক্যে উপনীত হলেও তিনি কয়েকজন যোগ্য সহকারীর সাহায্যে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।

### ২.২ সংস্কারমূলক কাজ

শায়েস্তা খান ক্ষমতায় আরোহণের পর তাঁর পূর্ববর্তী সুবাদার মীর জুমলার গৃহীত জনকল্যাণ বিরোধী ও স্বৈরচারী নীতির সংস্কার ও সংশোধন করেন।

**আভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা :** শায়েস্তা খান ঢাকায় পৌঁছেই মীর জুমলার আমলে অবৈধ ক্ষমতা ও সুবিধা গ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বরখাস্ত করেন। বাংলার ধ্বংসোন্মুখ শাসন ব্যবস্থা ও মোগল বাহিনী পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

**রাজস্ব সংস্কার :** রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য শায়েস্তা খান কিছু সংস্কার করেন। তিনি আইমাদার ও মদদমাশ ভোগীদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বৃত্তিভোগীদের ভাতা দানের ব্যবস্থা করেন। তিনি বণিক ও ভ্রমণকারীদের উপর যাকাত মওকুফ করেন এবং শিল্পী, ব্যবসায়ী ও আগন্তুকদের উপর ধার্যকৃত শুল্ক রহিত করেন। তিনি মোগল সম্রাটকে বার্ষিক হারে নিয়মিত কর দিতেন।

**'আনকুরা' পদ্ধতি রহিত :** যদি কোন ব্যক্তি অপুত্রক অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে এলাকার জমিদার তার স্ত্রী-কন্যাসহ সকল সম্পত্তি জোর পূর্বক দখল করে নিত। এরূপ ঘৃণিত রীতিকে 'আনকুরা' বা Hooking বলা হতো। শায়েস্তা খান এরূপ ঘৃণিত রীতিকে রহিত করে প্রজাসাধারণের ভালোবাসা অর্জন করেন।

**'ক্ষমতা প্রয়োগ ফি' রহিত :** যদি কোন ব্যক্তি তাঁর পাওনা টাকা আদায় করার জন্য সরকারের সহযোগিতা চাইত, তখন ক্ষমতা প্রয়োগ ফি বাবদ উক্ত টাকা বা মালের চার ভাগের এক অংশ রাষ্ট্রের জন্য রেখে দিত। জনস্বার্থে শায়েস্তা খান এই প্রথাও রহিত করেন।

**জলদস্যুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ :** শায়েস্তা খান ক্ষমতারোহণের পর এক বছরের মধ্যে শক্তিশালী এক নৌবাহিনী গঠন করে মগ জলদস্যুদের আক্রমণ ও দস্যুতা বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি মগ জলদস্যুদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জনগণ ও ব্যবসায়ীদের জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

### ২.৩ শায়েস্তা খানের রণ-অভিযান

বাংলার শাসন ক্ষমতা সুসংহত ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য শায়েস্তা খান বাংলার সীমান্তের কয়েকটা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন-

**কুচবিহার ও জয়ন্তিয়া রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ**

সীমান্তবর্তী রাজ্য কুচবিহারের শাসনকর্তা বিদ্রোহ করলে শায়েস্তা খান তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কুচবিহারের রাজা ভীত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে এবং সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু জয়ন্তিয়ার রাজা পুনরায় বিদ্রোহ করলে শায়েস্তা খান তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। ফলে জয়ন্তিয়া মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

**মুরাং-এ অভিযান**

১৬৭৬ সালের প্রথম দিকে শায়েস্তা খান কুচবিহারের পশ্চিম দিকে মুরাং এর পার্বত্য এলাকায় একটি অভিযান প্রেরণ করেন। মুরাং এর রাজা সহজেই আত্মসমর্পণ করে মোগল সম্রাটকে কর প্রদান করতে রাজি হয়।

**সন্দ্বীপ বিজয়**

শায়েস্তা খানের সময় প্রাক্তন মোগল সেনাপতি দিলওয়ার খান সন্দ্বীপ দখল করে স্বাধীনভাবে সন্দ্বীপ শাসন করছিলেন। ১৬৬৫ সালের নভেম্বর মাসে শায়েস্তা খান তার নৌসেনাপতি ইব্নে হুসাইনের নেতৃত্বে সন্দ্বীপ আক্রমণ করার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধে দিলওয়ার খান পরাজিত হন এবং সন্দ্বীপ মোগল বাহিনীর অধিকারভুক্ত হয়।

**চট্টগ্রাম বিজয়**

শায়েস্তা খানের বিজয়াভিযানের মধ্যে চট্টগ্রাম বিজয় উল্লেখযোগ্য। ১৪৫৯ সালে আরকান রাজ চট্টগ্রামকে বাংলার সুলতানদের নিকট থেকে দখল করে নিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম পুনর্দখলের উদ্দেশ্য শায়েস্তা খান সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনী সন্দ্বীপ দখল করে চট্টগ্রামের দিকে মনোনিবেশ করেন। এ সময় চট্টগ্রামের মগ-রাজা ও স্থানীয় পর্তুগিজদের মধ্যে বিবাদ বাঁধে। চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গীরা তখন নোয়াখালিতে এসে আশ্রয় নেয়। শায়েস্তা খান ফিরিঙ্গী নেতাকে নিজ দলভুক্ত করেন। ১৬৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ফিরিঙ্গীদের ৪০টি রণতরী সহ ইব্নে হুসাইনের নেতৃত্বে বিশাল নৌবাহিনীসহ চট্টগ্রামে আক্রমণ করে। সম্মিলিত বাহিনীর মুকাবিলায় আরাকান বাহিনী পরাজিত হয়। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি বুজুর্গ উমেদ খান বিজয়ীর বেশে চট্টগ্রামে প্রবেশ করেন।

দীর্ঘদিন এ দেশে থাকবার পর তিনি দিল্লিতে ফিরে যাবার জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলে তিনি দিল্লিতে ফিরে যান।

## ২.৪ ইংরেজদের সাথে বিরোধ

দুবছর পর শায়েস্তা খান ১৬৭৯ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য বাংলার সুবাদার হয়ে বাংলায় আগমন করেন। এ সময় তাঁর সাথে ইংরেজদের সংঘাত হয়। মোগল সম্রাট কর্তৃক বাণিজ্যিক সুযোগ লাভ করে ইংরেজরা স্থানীয় কর্মচারীদের সাথে অন্যায় আচরণ শুরু করলে শায়েস্তা খান তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এতে ইংরেজগণ শায়েস্তা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেয়।

১৬৮৬ হতে ১৬৮৭ সাল পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হয়। ইংরেজগণ হিজলী ও বালাশের দুর্গ দখল করে নেয়। পাল্টা আক্রমণে শায়েস্তা খান হিজলী পুনরুদ্ধার করেন। এরপর এক সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে শায়েস্তা খান ইংরেজদেরকে কুঠি নির্মাণ করা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দান করেন।

ইতোমধ্যে বোম্বাই উপকূলে ইংরেজদের সাথে মোগলদের জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার প্রেক্ষাপটে শায়েস্তা খান বাংলার ইংরেজদের বাণিজ্যিক অধিকার প্রত্যাহার করে নেন। বিক্ষুব্ধ ইংরেজগণ মোগলদের বালাশোর দুর্গ দখল করে এবং চট্টগ্রাম দখল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত তারা এ পরিকল্পনা স্থগিত রেখে ১৬৮৯ সালে মাদ্রাজে চলে যায়। ইংরেজদেরকে মাদ্রাজ গমনের আগেই শায়েস্তা খান দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন। কয়েক বছর পর এখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

## ২.৫ শায়েস্তা খানের চরিত্র ও কৃতিত্ব

বাংলায় মোগল সুবাদারদের মধ্যে শায়েস্তা খান একজন কীর্তিমান পুরুষ। বাংলার ইতিহাসে তিনি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তার কৃতিত্বের দিকগুলো হচ্ছে-

**শ্রেষ্ঠ শাসক**

শায়েস্তা খান শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম। তার শাসন আমল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ। মোগল শক্তিকে সুসংহত করার পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

**শ্রেষ্ঠ বিজেতা**

শায়েস্তা খান ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বিজেতা ও দক্ষ সেনাপতি। তাঁর সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল। সীমান্তবর্তী মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের হাত হতে বাংলার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দানে সক্ষম হয়েছিলেন।

**উদার ও প্রজাকল্যাণকামী শাসন**

শায়েস্তা খান ছিলেন প্রজাকল্যাণকামী শাসক। তাঁর সুশাসনে বাংলাদেশ সুখ-শান্তিতে ভরে উঠেছিল। তাঁর রাজস্ব সংস্কারের ফলে বণিক, ব্যবসায়ী ও শিল্পী নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাঁদের মেধা ও যোগ্যতা বিকাশের সুযোগ পেয়েছিল। তাঁর সময়ে দ্রব্যমূল্য এত কম ছিল যে, মাত্র এক টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত। তাঁর সময় কৃষিকাজের পাশাপাশি শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি লাভ হয়।

**স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ**

শায়েস্তা খানের সময়ে এদেশ স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জন করে। তিনি ঢাকা নগরীকে বিচিত্র সৌধমালা ও মনোরম সাজে সজ্জিত করেন। তাঁর আমলে নির্মিত বড় কাটরা, ছোট কাটরা, লালবাগ কেল্লা, পরিবিবির মাজার, হোসনী দালান, সফী খানের মসজিদ তাঁর স্থাপত্য শিল্পের প্রতি অনুরাগের প্রমাণ বহন করেন।

**সার-সংক্ষেপ**

মোগল সুবাদার শায়েস্তা খান এদেশের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তাঁর যোগ্য ও জনকল্যাণমূলক শাসনে দেশের যে সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল, তাঁর মাধ্যমে এ দেশে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাঁর সে সমৃদ্ধি ও সুখ-সৌন্দর্যের ইতিহাস এ দেশবাসীর হৃদয়ে এখনো বাংলার সোনালী ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**এক কথায় উত্তর দিন :**

১. কার সময়ে এক টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যেত?
২. সুবাদার শায়েস্তা খান সম্রাট আওরঙ্গজেবের কি হন?
৩. বাংলার শাসনভার গ্রহণের সময় শায়েস্তা খানের বয়স কত ছিল?
৪. সুবাদার মীর জুমলার আমলে অবৈধ ক্ষমতা ও সুবিধাভোগীদেরকে শায়েস্তা খান কি করেন?
৫. শায়েস্তা খান কাদের উপর যাকাত ও শুল্ক রহিত করেন?
৬. 'আনকুরা' পদ্ধতি কে রহিত করেন?
৭. শায়েস্তা খানের সময়ে কোন সেনাপতি সন্দ্বীপ স্বাধীনভাবে শাসন করছিলেন?
৮. কোন সময়ে শায়েস্তা খানের সাথে ইংরেজদের বিরোধ বাঁধে?
৯. শায়েস্তা খানের নির্মিত কয়েকটি স্থাপত্যের উল্লেখ করুন।

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. সুবাদার শায়েস্তা খানের পরিচয় দিন।
২. শায়েস্তা খানের কয়েকটি সংস্কারমূলক কাজের বর্ণনা দিন।
৩. শায়েস্তা খানের রণ-অভিযানের বিবরণ দিন।
৪. ইংরেজদের সাথে শায়েস্তা খানের বিরোধের বর্ণনা দিন।
৫. শায়েস্তা খানের কৃতিত্ব ও চরিত্র বর্ণনা করুন।

## পাঠ-৩ : নবাবী আমলে বাংলা : নবাব মুর্শিদকুলী খান ও সুজাউদ্দিন খান

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি-**

☞ বাংলায় মোগল শাসনের একটি সময়কে কেন নবাবী আমল বলা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ নবাবী আমলে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ মুর্শিদকুলী খানের সময় বাংলার অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ নবাব সুজা উদ্দিন খানের শাসনামল বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৩.১ বাংলায় নবাবী শাসন প্রতিষ্ঠা

মোগল সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার শেষ সুবাদার ছিলেন মুর্শিদকুলি খান। পরবর্তী মোগল শাসকরা ছিলেন দুর্বল। সিংহাসন নিয়ে একে অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। তাই দূরের প্রদেশগুলোর উপর সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ কমে আসে। অনেক সুবাদার প্রায় স্বাধীন রাজার মতোই শাসন করতে থাকেন। মুর্শিদ কুলী খানও শেষ দিকে তাই করেছিলেন। এ সময় থেকে পরবর্তীকালে আর কখনও মোগল সম্রাটদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বাংলার উপর ছিল না। ফলে দিল্লি থেকে কাউকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করে পাঠানোর সুযোগ ছিল না। এ সময় থেকে সুবাদার পদটি বংশগত হয়ে পড়ে। সুবাদারগণ ক্ষমতা দখল করে সিংহাসনে বসতেন। এজন্য মোগল সম্রাটের কাছ থেকে শুধুমাত্র একটি অনুমোদন নিয়ে নিতেন। তাই আঠারো শতকের বাংলায় মোগল শাসন ইতিহাসে নবাবী আমল রূপে পরিচিতি লাভ করে। নবাবগণ প্রায় স্বাধীন শাসক ছিলেন।

### ৩.২ মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-১৭২৭ খ্রি.)

মুর্শিদ কুলী খান ১৭০০ সালে দীউয়ান নিযুক্ত হয়ে বাংলায় আসেন। এই সময় দিল্লির মোগল সম্রাট ছিলেন আওরঙ্গজেব। দীউয়ানের কাজ ছিল সুবার রাজস্ব আদায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। বাংলায় আসার আগে মুর্শিদ কুলী খান হায়দারাবাদের দীউয়ান ছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর কাজে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন। এজন্যই বাংলার মতো গুরুত্বপূর্ণ সুবায় সম্রাট তাঁকে নিযুক্ত করেন। বাংলার সুবাদার আজিম উশ্‌শানের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় সম্রাটের অনুমতি নিয়ে তিনি দীউয়ানী সদর দফতর ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

সম্রাট ফররুখশিয়ার ১৭১৭ সালে মুর্শিদ কুলী খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। দীউয়ানের দায়িত্বও তাঁর হাতে থাকে। তিনি মুর্শিদাবাদকেই রাজধানী করেন। এই সময় থেকে ঢাকার পরিবর্তে মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী।

রাজস্ব সংস্কারের জন্য মুর্শিদ কুলী খান বিখ্যাত হয়ে আছেন। এতকাল অনেক জমি সরকারি কর্মচারীদের হাতে ছিল। মুর্শিদকুলী খান এসব জমি সরকারের হাতে নিয়ে নেন। তিনি জমির খাজনা আদায়ের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ইজারাদার নিযুক্ত করেন। জমির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সরকারকে দিতে হতো। এসব ইজারাদারদের মধ্য দিয়ে এদেশে নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

মুর্শিদ কুলী খান সুশাসক ছিলেন। তিনি নাম মাত্র সম্রাটের আনুগত্য মেনে চলতেন। তিনি সম্রাটকে বার্ষিক ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাঠাতেন। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খান বাংলার নবাব হন। কিন্তু তাঁকে সরিয়ে তাঁর পিতা সুজাউদ্দিন খান মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেন। এভাবে বাংলার সুবাদারী অনেকটা বংশগত ও স্বাধীন হয়ে পড়ে।

### ৩.৩ নবাব সুজাউদ্দিন খান (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.)

সুজাউদ্দিন খান শক্ত হাতে শাসন পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বিশ্বাসভাজনদের উচ্চপদ দান করেন। তিনি সমর্থন লাভের জন্য জমিদারদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। সুজাউদ্দিন খান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশেরই নবাব ছিলেন।

সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার জন্য সুজাউদ্দিন একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করেন। এর সদস্য ছিলেন আলীবর্দী খান, হাজি আহমদ, জগৎশেঠ এবং আলম চাঁদ। সুজাউদ্দিন খান জনগণের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিকে তিনি বিলাসী হয়ে পড়েন। এই সুযোগে প্রাসাদের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। তাঁরা সুজাউদ্দিন ও তাঁর পুত্র সরফরাজ খানের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করতে চেষ্টা করেন। এ কাজে তাঁরা ব্যর্থ হলে সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে তাঁর ভাই মুহম্মদ তকীর মন বিষিয়ে দেন। কিন্তু সময়মতো সুজাউদ্দিন হস্তক্ষেপ করায় একটি সংকট থেকে নবাবী রক্ষা পায়। সুজাউদ্দিনের সুশাসনে দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বজায় ছিল।

সুজাউদ্দিন খান ১৭৩৯ সালের ১৩ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। এরপর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন সরফরাজ খান। তিনি ছিলেন খুব অযোগ্য শাসক। রাজ্য শাসনের চেয়ে আনন্দ আর বিলাসের মধ্য দিয়ে তিনি জীবন কাটাতে বেশি মনোযোগী

ছিলেন। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সুযোগে বিহারের নায়েবে নাজিম আলীবর্দী খান সরফরাজকে আক্রমণ করেন। সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন।

**সার-সংক্ষেপ**

বাংলা ছিল মোগলদের অন্যতম সুবা। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর দিল্লির দুর্বল শাসনে বাংলার সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। মোগল আমলের এই যুগ নবাবী আমল নামে পরিচিত। নবাবদের শাসনকালের পরিধি ছিল ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৫০ বছর।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৩

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**এক কথায় উত্তর দিন :**

১. মোগল সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার শেষ সুবাদার ছিলেন কে?
২. কখন থেকে বাংলার সুবাদারগণ স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন?
৩. সুবাদার পদটি বংশগত হয়ে পড়ে কেন?
৪. কি জন্য মুর্শিদকুলী খান বিখ্যাত হয়ে আছেন?
৫. মুর্শিদকুলী খান দিল্লির সম্রাটকে কত টাকা বার্ষিক রাজস্ব পাঠাতেন?
৬. সরফরাজ খান কে ছিলেন?
৭. সুজাউদ্দিন খান কোথাকার নবাব ছিলেন?
৮. সুজাউদ্দিনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য কারা ছিলেন।
৯. সুজাউদ্দিনের শাসনে বাংলার অবস্থা কেমন ছিল?
১০. নবাব সরফরাজ কার হাতে পরাজিত ও নিহত হন?

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. বাংলায় নবাবী শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিকথা লিখুন।
২. মুর্শিদ কুলী খান কে ছিলেন? তাঁর কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।
৩. নবাব সুজাউদ্দিন খান সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

## পাঠ-৪ : নবাব আলীবর্দী খান

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ নবাব আলীবর্দী খানের পরিচয় দিতে পারবেন।
☞ বিহারের নায়েব হিসেবে আলীবর্দী খানের সাফল্য বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ বাংলার মসনদ কিভাবে দখল করেন, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
☞ আলীবর্দী খানের বিজয় অভিযান সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।
☞ আলীবর্দী খানের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৪.১ আলীবর্দী খানের পরিচয়

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে নবাব আলীবর্দী খানের শাসনামল এক বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। তুর্কী বংশোদ্ভূত এক ভাগ্যান্বেষী যুবক নিজ যোগ্যতা বলে সামান্য কর্মচারী থেকে সুবাদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে দীর্ঘ ষোল বছর অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। একজন যোদ্ধা ও দক্ষ শাসক হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। তাঁর শাসনামলে বাংলার জনগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিল।

আলীবর্দীর প্রথম নাম ছিল মীর্জা বন্দি বা মীর্জা মুহাম্মদ আলী। তাঁর পিতামহ (আরব বংশোদ্ভূত) সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে মোগল মনসবদার ছিলেন। পিতা মীর্জা মুহম্মদ আজম শাহের অধীনে সামান্য কাজ করতেন। মাতা তুর্কী বংশোদ্ভূত সুজাউদ্দিন খানের আত্মীয়। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে জজুর যুদ্ধে আজম শাহ নিহত হলে মীর্জা মুহাম্মদ আলী উড়িষ্যার সহকারী সুবাদার সুজাউদ্দিনের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। তাদের প্রভাবেই সুজাউদ্দিন বাংলার মসনদ অধিকার করতে সমর্থ হন। এর পুরস্কার স্বরূপ মীর্জা মুহম্মদ আলী রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হন ও 'আলীবর্দী খান' উপাধিতে ভূষিত হন।

### ৪.২ বিহারের নায়েব-নাযিম পদ লাভ

নবাব সুজাউদ্দিন ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিহারের সুবাদারী লাভ করে আলীবর্দী খানকে 'নায়েব-নাযিম' পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর সুপারিশে সম্রাট আলীবর্দীকে পাঁচ হাজারী মনসব প্রদান করেন। এ সময়ে বিহার প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার দারুন অবনতি ঘটে। জমিদাররা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, কর প্রদান বন্ধ করে দেয়। এদেরকে দমন করে আলীবর্দী শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। টিকারীর জমিদার রাজা সুন্দর সিংহ বশ্যতা স্বীকার করে কর প্রদানে স্বীকৃত হন। মুঙ্গের জিলার উপজাতিগুলোকে দমন করেন। এভাবে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি অভাবনীয়ভাবে বেড়ে যায়।

### ৪.৩ বাংলার মসনদ অধিকার

সুজাউদ্দিন খানের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সরফরাজ খান বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। নবাবের উপদেষ্টা ও সভাসদ মীর মুর্তজা, হাজী লুৎফ আলী ও মর্দন আলী খান আলীবর্দী খানের প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে খর্ব করার জন্য পরামর্শ দেন। অন্যদিকে আলীবর্দীর ভাই হাজী আহমদকে অমলচাঁদ, জগৎশেঠ, ফতেহ চাঁদ নবাবের বিরুদ্ধে গোপনে উত্তেজিত করে তোলে। সরফরাজের দুর্বলতা ও শাসন অক্ষমতায় উৎসাহিত হয়ে আলীবর্দী ও তাঁর পরিবার দিল্লি সম্রাটের অনুচরগণকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করেন। এরপর রাজত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সম্রাটের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় ফরমান আদায় করেন। কূটনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আলীবর্দী খান ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে বিহার থেকে বাংলার পথে অগ্রসর হন। মুর্শিদাবাদের ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গিরিয়ার রণক্ষেত্রে সরফরাজ খাঁন আলীবর্দী খানকে বাধা দেন। সরফরাজ খাঁন পরাজিত ও নিহত হলে বিনা বাধায় মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে আলীবর্দী খান বাংলার মসনদ দখল করেন।

### ৪.৪ উড়িষ্যা বিজয়

সুজাউদ্দিনের জামাতা রুস্তম জঙ্গ উড়িষ্যার নায়েব নাযিম ছিলেন। তিনি আলীবর্দী খানের আনুগত্য অস্বীকার করেন। রুস্তম জঙ্গকে শাস্তি দেবার জন্য আলীবর্দী উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হলে বালেশ্বরের নিকট ফুলয়ারী নামক স্থানে ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। রুস্তম জঙ্গ পরাজিত হয়ে হায়দারাবাদের নিযামুল মূলকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আলীবর্দী খান তাঁর জামাতা সৌলত জঙ্গকে নায়েব নাযিম নিযুক্ত করেন। এ সময়ে রুস্তম জঙ্গের জামাতা মীর্জা বাকর মারাঠাদের সাথে নিয়ে

উড়িষ্যা পুনদখল করেন। এ অবস্থায় আলীবর্দী খান (১৭৪১ খ্রি.) পুনরায় উড়িষ্যা অভিযানে অগ্রসর হন। মীর্জা বাকর দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যান। আলীবর্দী সেখানে তিন মাস অবস্থান করে শেখ মাসুমকে নায়েবে-নাযিম নিযুক্ত করে রাজধানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন।

### ৪.৫ মারাঠা আক্রমণ

উড়িষ্যার গোলযোগ শেষ হলে আলীবর্দীকে বাংলায় মারাঠা আক্রমণের দ্বারা এক দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। ১৭৪২-৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তিন বছর মারাঠারা উড়িষ্যার ভিতর দিয়ে পশ্চিম বাংলায় ব্যাপক লুটতরাজ ও হত্যালীলা চালাতে থাকে। নারী ধর্ষণ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিচারে হত্যা, নগরের পর নগর, গ্রাম লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ দ্বারা ভস্মীভূতকরণ মারাঠাদের আক্রমণের বৈশিষ্ট্য ছিল। দীর্ঘকাল মারাঠা ও আলীবর্দীর মধ্যে যুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে নবাব পেশোয়া বালাজীরাওয়ের বন্ধুত্ব গ্রহণ করা সমীচীন মনে করেন। অবশেষে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধির এক বছর পর মারাঠা সৈন্যরা মীর হাবীবকে হত্যা করে রঘুজীর সভাসদ মুসলেউদ্দিনকে নায়েব নাযিম পদে বসায়। এতে আলীবর্দী খান উড়িষ্যার উপর কাল্পনিক কর্তৃত্ব হারান।

### ৪.৬ আফগান বিদ্রোহ

আফগান অধিপতি আহম্মদ শাহ দুররানী ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে পাঞ্জাব আক্রমণ করেন। এ সুযোগে আলীবর্দীর পদচ্যুত ও বিদ্রোহী আফগান সৈন্যদল পাটনা দখল করে। নবাবের বড় ভাই হাজী আহমদ ও তার পুত্র জৈনুদ্দিনকে হত্যা করে নবাবের মেয়ে আমেনা বেগম ও সন্তানদের বন্দি করে। এদের সাথে মারাঠারাও যোগ দেয়। নবাব আলীবর্দী খান এতে মর্মাহত হন। পাটনার ২৬ মাইল পূর্বে গঙ্গার তীরবর্তী কালাদিয়ারা নামক স্থানে এক যুদ্ধে তিনি মারাঠা ও আফগানদের মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে কন্যা আমেনা বেগম ও তাঁর সন্তানদের মুক্ত করেন। এভাবে দীর্ঘ সময় নবাবকে বিদ্রোহী আফগানদের বিরুদ্ধে কাটাতে হয়েছে। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন সেনাপতি মুস্তফা খান।

### ৪.৭ আলীবর্দী ও ইংরেজ বণিক

নবাব আলীবর্দী বাংলার সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করে ইংরেজ বণিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি বিধিবদ্ধ শুল্ক ছাড়া অতিরিক্ত কিছু আদায় করতেন না। ১৭৪৫ সালে নবাব আলীবর্দী এক পরোয়ানা জারি করে ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের রাজ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হতে ও দুর্গ নির্মাণ করতে নিষেধ করেন। তিনি বলতেন, "তোমরা বণিক, তোমাদের দুর্গের কি প্রয়োজন? আমার রক্ষণাধীনে কোন শত্রুর ভয় তোমাদের নেই।" আলীবর্দী সর্বদাই বণিকদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

### ৪.৮ শাসক হিসেবে আলীবর্দী খান

তিনি শুধু একজন সুদক্ষ যোদ্ধা হিসেবেই নয় সুদক্ষ শাসক হিসেবেও কৃতিত্ব অর্জন করেন। মারাঠাদের সাথে সন্ধির পর আলীবর্দী খান বিধ্বস্ত নগর ও গ্রামগুলো পুনর্গঠন করেন। কৃষকদের অর্থ সাহায্য করেন। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে উদারতা অবলম্বন করেন। প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে জমিদারদের সাথে রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহেরে জন্য অনেক সময় প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করতেন। কিন্তু তা শোষণ ও নির্যাতনমূলক ছিল না।

কয়েকটি প্রধান পদ ছাড়া রাজস্ব বিভাগের চাকরি হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল। এদের মধ্যে চিনরায়, বিরুদত্ত, রাজা কিরাত চাঁদ, উঁমিদ রায় দিওয়ান ছিলেন। জানকীরাম ও রাম নারায়ণ নাযিমে দিওয়ান ছিলেন। জগৎশেঠ ও রাজভল্লভ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। আলীবর্দী খান নিজে শিক্ষিত ছিলেন এবং শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এ সময়ে বাংলায় ফরাসি সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ফরাসি সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত ও সমৃদ্ধ হয়। রাজদরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মৌলভী নাছির আলী খান, দাউদ আলী খান, জাকির হোসেন খান, মীর মোহাম্মদ আমীন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

**সার-সংক্ষেপ**

বীর যোদ্ধা, সুনিপুণ সেনাপতি ও দক্ষ শাসক হিসেবে আলীবর্দী খানের কৃতিত্ব বাংলার ইতিহাসে অম্লান হয়ে আছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৪

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**এক কথায় উত্তর দিন :**

১. আলীবর্দী খান কত সালে বাংলার সিংহাসনে বসেন?
২. আলীবর্দী খান কত বছর বাংলা শাসন করেন?
৩. আলীবর্দী খানের প্রথম নাম কি ছিল?
৪. তিনি কখন 'আলীবর্দী খান' উপাধি পান?
৫. কে আলীবর্দী খানকে বিহারের নায়েবে-নাযিম পদে নিযুক্ত করেন?
৬. কিভাবে আলীবর্দী খান বাংলার মসনদ দখল করেন?
৭. ফুলয়ারী নামক স্থানে কাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়?
৮. মারাঠারা বাংলায় কি করত?
৯. আফগান বিদ্রোহ আলীবর্দী খান কিভাবে দমন করেন?
১০. শাসক হিসেবে আলীবর্দী খান কেমন ছিলেন?

**খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. নবাব আলীবর্দী খানের পরিচয় দিন।
২. আলীবর্দী খানের বিহার ও বাংলার মসনদ কিভাবে দখল করেন, তার বর্ণনা দিন।
৩. মারাঠা ও আফগানদের বিদ্রোহ দমনে আলীবর্দী খানের ভূমিকা লিখুন।
৪. আলীবর্দী খানের ইংরেজদের প্রতি কিরূপ ভূমিকা ছিল লিখুন।
৫. শাসক হিসেবে আলীবর্দী খানের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

## পাঠ-৫ : নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

☞ সিরাজ-উদ-দৌলা কিভাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হলেন সে সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

☞ সিরাজ বিরোধী পারিবারিক ষড়যন্ত্র এবং ইংরেজদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

☞ ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের কারণ, ঘটনা প্রবাহ ও ফলাফল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

সিরাজ-উদ-দৌলার প্রকৃত নাম মীর্জা মুহাম্মদ। তিনি ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর্জা মুহাম্মদ হাশিম জয়নউদ্দিন আহমদ খান। আলীবর্দীর তিন কন্যা ছিল এবং তিনি অপুত্রক ছিলেন। তিনি তাঁর দৌহিত্র সিরাজকে নিজ পুত্রের মতো লালন-পালন করেন। তিনি তাঁকে রাজকার্য ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন।

১৭৫৬ সালে নবাব আলীবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছামতো সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার নবাব হন। এতে আলীবর্দীর অন্যতম দৌহিত্র শওকত জং ও কন্যা ঘষেটি বেগম ঈর্ষান্বিত হয় এবং সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। অপর দিকে ইংরেজরা রাজ্য লোভে ষড়যন্ত্রে নেমে পড়ে। পারিবারিক ষড়যন্ত্র নির্মূল করার আগেই সিরাজকে ইংরেজদের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়তে হয়। ইংরেজ বণিকগণ শুরুতেই নতুন নবাবকে অবহেলার চোখে দেখতে থাকে। তাঁকে স্বীকৃতিস্বরূপ উপঢৌকন না পাঠিয়ে তারা প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে। ফরাসি এবং ইংরেজরা নবাবের অনুমতি না নিয়েই বাংলাতে তাদের ঘাঁটিগুলোকে দুর্গে পরিণত করতে শুরু করে। নবাবের নির্দেশে ফরাসিগণ এ কর্ম হতে বিরত থাকে, কিন্তু ইংরেজরা এতে কর্ণপাত করেনি। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস নবাবের রাজকোষের অর্থ আত্মসাৎ করে এবং ইংরেজগণ তাকে আশ্রয় প্রদান করে। তারা কৃষ্ণদাসকে নবাবের নিকট ফিরিয়ে দেয়নি। ইংরেজরা পূর্ব হতেই ষড়যন্ত্রকারী শওকত জং এবং ঘষেটি বেগমকে সাহায্য প্রদানে প্রতিজ্ঞাদ্ধ ছিল।

এ সমস্ত কিছুর পেছনেই ছিল ইংরেজদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সিরাজ ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে কাশিম বাজার দুর্গ অধিকার করেন এবং পরে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম অধিকার করেন। ইংরেজগণ কলকাতা ত্যাগ করে নদীর মোহনায় ফুলতা নামক স্থানে চলে যায়। এ সময় সিরাজ কিছু ইংরেজ সৈন্য বন্দি করে রাখে। সিরাজের চরিত্রকে কলঙ্কিত করার জন্য হলওয়েল নামক জনৈক ইংরেজ 'অন্ধকূপ হত্যা' কাহিনী রচনা করেন। তিনি লিখেন যে, ক্ষুদ্র একটি কক্ষে সিরাজ ১৪৬ জন সৈন্যকে আটক রাখেন। এতে গরম ও তৃষ্ণায় ১২৩ জনের মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনার কোন প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায়নি। নবাব কলকাতা মানিকচাঁদের দায়িত্বে রেখে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। আলীবর্দীর নাম অনুসারে তিনি কলকাতার নাম রাখেন আলী নগর। ইতোমধ্যে পূর্ণিয়ার শওকত জং সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সিরাজের সৈন্য তাকে পরাজিত ও নিহত করে।

কলকাতা পতনের খবর মাদ্রাজে পৌঁছালে সেখানকার কর্তৃপক্ষ কলকাতা পুনরায় দখলের জন্য রবার্ট ক্লাইভ ও নৌসেনাপতি ওয়াটসনকে পাঠায়। মানিকচাঁদ বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ইংরেজরা সহজেই কলকাতা পুনর্দখল করে। তারা হুগলী লুটপাট করে এবং চন্দননগর দখল করেন। নবাব সিরাজ দ্বিতীয়বার কলকাতা আক্রমণ করেন এবং কলকাতা দখল করতে ব্যর্থ হন। এ অবস্থায় সিরাজ ২ জানুয়ারি, ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের সাথে আলী নগরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে ইংরেজগণ অনেক সুবিধা আদায় করে নেয়।

এর মধ্যে মুর্শিদাবাদের দরবারে সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্র পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। জগৎশেঠ সিরাজের সেনাপতি মীর জাফরকে তার স্থলাভিষিক্ত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। দেওয়ান রায় দুর্লভ, উমিচাঁদ ও রাজবল্লভও এ ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। ক্লাইভ মীর জাফরকে নবাব পদে বহাল করলে, মীর জাফর তাকে ১৭৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারীদের কীভাবে পুরস্কৃত করা হবে তাও ঠিক হয়। সিরাজ তাঁর এমন বিপদের সময়েও চক্রান্তকারী মন্ত্রীদের

পরামর্শ নিয়ে ইংরেজদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করতে দৃঢ় সংকল্প হন। ষড়যন্ত্র শেষে রবার্ট ক্লাইভ সামান্য কারণে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ক্লাইভ কলকাতা থেকে এসে ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আম্রকাননে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি পথে কোন বাধার সম্মুখীন হন নাই। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সকালবেলা উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এ সময় সিরাজের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফর ও রায়দুর্লভ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। কেবল মীর মদন, মোহন লাল কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ফরাসিদের সাহায্যে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। জয় যখন সুনিশ্চিত তখন সেনাপতি মীর জাফর যুদ্ধ বন্ধের জন্য ঘোষণা করেন। এতে সিরাজের সৈন্যদলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সুযোগ বুঝে রবার্ট ক্লাইভ নবাবকে আক্রমণ করেন। পরাজিত নবাব তার সৈন্যদল জোগাড় করতে মুর্শিদাবাদ যান কিন্তু ব্যর্থ হয়ে পাটনা অভিমুখে পালিয়ে যান। পথে তিনি বগবান গোলার নিকট ধরা পড়েন। মুর্শিদাবাদে আনা হলে মীর জাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশে মুহাম্মদী বেগ তাঁকে হত্যা করে। ইংরেজ কোম্পানির অনুগ্রহে মীর জাফর বাংলার নবাব হলেন। পলাশীর যুদ্ধ ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহের অন্যতম। প্রথমত, সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় ও মৃত্যুর ফলে বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয়ত, পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয় দাক্ষিণাত্যে তাদেরকে ফরাসিদের বিরুদ্ধে জয়লাভে সাহায্য করে।

**সার-সংক্ষেপ**

কয়েকটি কারণে মসনদে বসার সঙ্গে সঙ্গেই নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইংরেজ কোম্পানির মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। এর পরিণতিতে পলাশীতে ১৭৫৭ সালে দুই পক্ষের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সিরাজ পরাজিত হন। পলাশীর যুদ্ধ উপমহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহের মধ্যে অন্যতম।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.৫

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন :**

১. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পিতান নাম কি ছিল?

ক. সুজাউদ্দিন খ. সুজাউদ্দৌলা

গ. জয়নউদ্দিন ঘ. বাহাউদ্দিন

২. বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী কোথায় ছিল?

ক. কলকাতা খ. মুর্শিদাবাদ

গ. কাশিম বাজার ঘ. সুতানটি

৩. পলাশীর যুদ্ধ কোন সালে ঘটে?

ক. ১৭৫৭ সালে খ. ১৭০৯ সালে

গ. ১৭৫৯ সালে ঘ. ১৭৬৫ সালে

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৭

**বিশদ উত্তর প্রশ্ন**

১. মোগলযুগে বাংলায় সুবাদারী শাসনের বর্ণনা দিন।

২. সুবাদার শায়েস্তা খানের পরিচয় দিন। তাঁর সংস্কারমূলক কাজ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. নবাব মুর্শিদকুলী খানের কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।

৪. নবাব সুজাউদ্দিন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৫. নবাব আলীবর্দী খানের পরিচয় ও তাঁর কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৬. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও পলাশী যুদ্ধের বিবরণ দিন।

ইউনিট
৮

# মুসলিম শাসনামলে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক জীবন

## ভূমিকা

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। তারপর ত্রয়োদশ শতক হতে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুলতানী আমলে বাংলা কখনো দিল্লির অধীন আবার কখনোবা স্বাধীন ছিল। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের সময় হতে বাংলায় স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ইলিয়াস শাহী শাসনামলে সারা বাংলা একত্রিত হয়। মোগল আমলে বাংলা তার স্বাধীনতা হারায় এবং মোগলদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ে নতুন সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক জীবনেও এসময় পরিবর্তন সুস্পষ্ট। এসময় বাংলায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিজস্ব অবয়ব লাভ করে। দৈন্যতা কাটিয়ে ওঠে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে সমৃদ্ধির সুবাতাস প্রবাহিত হয়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে বিপুল অগ্রগতির ফলে জনজীবনে স্বচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আলোচ্য ইউনিটে মুসলিম শাসনামলে (১২০৪-১৭৬৫ খ্রি.) বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

- ➔ পাঠ ১ : সুলতানী আমলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন
- ➔ পাঠ ২ : সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন
- ➔ পাঠ ৩ : মোগল আমালে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন
- ➔ পাঠ ৪ : মোগল আমালে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন

## পাঠ-১ : সুলতানী আমলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- ☞ সুলতানী আমলে বাংলার সমাজ কাঠামো কেমন ছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ সুলতানী আমলে বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

### ১.১ সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীবিভাগ

সুলতানী আমলে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি অবস্থান করত। ফলে দুটো সমাজকে কেন্দ্র করেই সামাজিক রীতিনীতি গড়ে ওঠে। সুলতানী আমলে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হিসেবে সুলতান ছিলেন সমাজ জীবনে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সমাজের নেতা হিসেবে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিতেন। তাঁরা জমকালো প্রাসাদে বাস করতেন। সমাজ জীবনে সুলতানের পরই ছিল উচ্চশ্রেণীর স্থান। উল্লেখ্য যে, সে সময় বাংলার মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন এ তিনটি পৃথক শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। উচ্চশ্রেণী আবার তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। (১) সৈয়দ, উলেমা এবং মাশায়েখ (২) খান, মালিক, উমারা প্রভৃতি এবং (৩) জমিদার, মুকাদ্দাম প্রভৃতি। মধ্য শ্রেণীর মধ্যে ছিল নিম্নপদস্থ কর্মচারী, শিক্ষক, প্রচারক, কবি, সঙ্গীত শিল্পী, স্থপতি প্রভৃতি। কৃষক, তাঁতী এবং বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের নিয়ে সমাজের নিম্নশ্রেণী গঠিত হয়েছিল। সুলতানী আমলে হিন্দু সমাজ ছিল বর্ণভিত্তিক। বিভিন্ন পেশাকে কেন্দ্র করে বাংলার হিন্দু সমাজে বর্ণ প্রথার উদ্ভব হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এ চারটি উল্লেখযোগ্য বর্ণ ছিল। এ চারটি বর্ণের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা হতো না।

### ১.২ পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্য

সুলতানী আমলে অভিজাত ও বিত্তবান মুসলমান নারী-পুরুষেরা মূল্যবান, রুচিসম্পন্ন ও আকর্ষণীয় পোশাক পরত। ইজার (পায়জামা) ও গোল গলাবন্ধসহ লম্বা জামা ছিল পুরুষদের পোশাক। তাদের মাথায় থাকত পাগড়ি এবং পায়ে কারুকার্যময় চামড়ার জুতা ও মোজা। মধ্য শ্রেণীর মুসলমান পুরুষদের পোশাক ছিল পায়জামা, জামা ও পাগড়ি। তারা পায়ে জুতাও ব্যবহার করতেন। নিম্নবিত্তের সাধারণ মুসলমানরা লুঙ্গি, নিমা ও মাথায় টুপি পরত। খাটো কামিজ ও সেলোয়ারের সাথে সূতি কিংবা রেশমি কাপড়ের ওড়না ছিল অভিজাত মুসলিম মহিলাদের পোশাক। তারা দামি শাড়িও পরতেন। সাধারণ নারীদের পোশাক ছিল শাড়ি।

অভিজাত হিন্দুদের পোশাকে মুসলিম অভিজাতদের পোশাকের বেশ প্রভাব ছিল। তারা যদি কানে দুল কিংবা তিলক ব্যবহার না করতেন তবে অভিজাত মুসলমান থেকে তাদের পৃথক করা ছিল কষ্টকর। সাধারণ হিন্দুরা ধুতি ও চাদর ব্যবহার করতেন। কেউ কেউ অঙ্গ রাখি নামক অজানু লম্বিত এক ধরনের জামাও পরতেন। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা শুধু একপ্রস্থ ধুতি পরত। হিন্দু মহিলাদের সাধারণ পোশাক ছিল শাড়ি। সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক সঙ্গতির সাথে সামাঞ্জস্য রেখে তারা শাড়ি ও ওড়না পরিধান করতেন।

সুলতানী আমলে হিন্দু-মুসলিম পুরুষ ও মহিলা সকলেই অলংকার পরতেন। তবে মহিলারাই বেশি অলংকার প্রিয় ছিলেন। তারা মাথায় টায়রা, সিঁথিপাঁটি, বিভিন্ন রকম কানফুল, নাকে নথ, গলায় হার, হাতে কঙ্কন, বালা, চুড়ি, পায়ে নূপুর, পায়ের আঙ্গুলে পাঁখুলি ব্যবহার করতেন। পুরুষরা মণি-মুক্তাসহ বিভিন্ন মূল্যবান পাথরের আংটি পরতেন । পুরুষ ও মহিলা উভয়েই বিভিন্ন রকম প্রসাধনী ও সুগিন্ধ ব্যবহার করতেন। প্রসাধনীতে ফুলের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। হিন্দু মহিলারা কপালে চন্দন তিলক ব্যবহার করতেন।

অভিজাত মুসলমানগণ ভোজন বিলাসী ছিলেন। তারা বিভিন্ন মাছ-মাংসের সাথে আচার গ্রহণ করতেন। ভাত, মাছ ও শাক-সবজি বাঙালি মুসলমানদের নিত্য দিনের খাদ্য ছিল। খিচুড়ি তৎকালীন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় খাদ্য ছিল। হিন্দু সমাজের একটি শ্রেণী ছিল নিরামিষভোজী। অভিজাত ও বিত্তবান হিন্দুদের গৃহে প্রায়ই ষোড়শ ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করা হতো। খাবারের পর পান-সুপারি গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল। মদ্যপানও অভিজাত সমাজে প্রচলিত ছিল।

**১.৩ সামাজিক উৎসব**

বিয়ে-শাদি ছাড়াও বিত্তশালী মুসলমানগণ নামকরণ, খাৎনা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সামাজিক উৎসবের আয়োজন করতেন। এসব উৎসবকে প্রাণবন্ত করে রাখার জন্য গান-বাজনার ব্যবস্থা ছিল। আমন্ত্রিত শিল্পীগণ শ্রোতাদের বিনোদনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। একশ্রেণীর পেশাদার শিল্পী অভিজাতদের গৃহে গান-বাজনা পরিবেশন করতেন। সামাজিক উৎসব উপলক্ষে চৌগান, সাঁতার, নৌকা বাইচ ইত্যাদি খেলাধুলারও আয়োজন করা হতো।

**১.৪ ধর্মীয় উৎসব**

ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, মহানবীর জন্মোৎসব ও মহরম ইত্যাদি ছিল মুসলিম সমাজে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় উৎসব। হিন্দু সম্প্রদায় জাঁকজমকের সাথে দুর্গা পূজা পালন করত। এতদ্ব্যতীত লক্ষ্মী, মনসা, শীতলা পূজাসহ বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা হতো। তারা দোলযাত্রা, রথযাত্রা, হোলি ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসবও পালন করতেন। উল্লেখ্য যে, সুলতানী আমলে বাংলায় ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় ছিল। হিন্দুগণ স্বাধীনভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করত।

**১.৫ নারীদের অবস্থা**

মুসলিম সমাজে নারীদের সামাজিক মর্যাদা থাকলেও হিন্দু সমাজে নারীদের তেমন কোন অধিকার ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। বাল্যবিবাহ, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি সমাজে প্রচলিত ছিল।

**১.৬ দাসপ্রথা**

সুলতানী আমলে বাংলায় দাস ব্যবসা ও দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। বিত্তবান ব্যক্তিরা দাস ও নপুংশক পালন করতেন। প্রধানত আবিসিনিয়া হতেই দাসদের আমদানি করা হতো। দাসদের কোনরূপ সামাজিক মর্যাদা দেয়া হতো না।

**১.৭ সামাজিক কুসংস্কার**

সুলতানী আমলে সমাজ জীবনে নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। জনসাধারণ ইন্দ্রজাল, জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করত। তান্ত্রিক সাধনা এবং ভক্তিবাদসহ নানা অবিচার ও কুসংস্কার হিন্দু সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে পরিণত হয়।

**১.৮ সাংস্কৃতিক বিকাশ**

বাংলার সুলতানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার সংস্কৃতি বিকাশ তরান্বিত হয়। হিন্দু-মুসলিম সমাজের মিশ্রণে বাংলার এক নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। সুলতানদের উদার ও নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের ফলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ফলে বাঙালিরা সমবেতভাবে নিজেদের সভ্যতা ও কৃষ্টির বিকাশে আত্মনিয়োগ করে।

**১.৯ ভাষা ও সাহিত্যে**

ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য সুলতানী আমলের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতিবান সুলতানদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট বিকাশ ঘটে। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ, বারবাক শাহ্, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, নুসরাত শাহ প্রমুখের প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য এক বিশিষ্ট স্থানে উন্নীত হয়। আযম শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ মুহামদ সগীর 'ইউসুফ-জুলেখা' কাব্য রচনা করেন। এটি ছিল বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রণয়মূলক কাব্য। সুলতানী যুগে দৌলত উজির বাহরাম খান 'লায়লী-মজনু' প্রেমোপখ্যান রচনা করেন। এটি ছিল বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ সংযোজন। এ আমলে রাজ পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি যশোরাজ খান, মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, দৌলত কাজী ও আলাওল প্রমুখ। এসব কবি-সাহিত্যিকদের কালজয়ী রচনা বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে । এসময় শুধু বাংলা নয়, আরবি, ফারসি কাব্যের চর্চাও হয়েছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সাথে পারস্যের কবি হাফিজের যোগাযোগ ছিল।

**১.১০ স্থাপত্য ও শিল্প**

সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছিল। এ যুগের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শনের অন্যতম হলো- গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা, কোতওয়ালী দরওয়াজা, ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ, আদিনা মসজিদ, কদম রসুল, ষাটগম্বুজ মসজিদ ইত্যাদি। চমৎকার মাটির পাত্র, আসবাবপত্র, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি তৈরিতেও সুলতানী আমলের বাংলার কারিগররা দক্ষ ছিল। গাছের ছাল থেকে কাগজ তৈরি এবং সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরিতেও এ সময় বাংলায় খ্যাতি অর্জন করেছিল।

**সার-সংক্ষেপ**

সুলতানী আমলে হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি অবস্থানের ফলে বাংলায় এক বিশেষ ধরনের সামাজিক অবস্থা গড়ে ওঠে। পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য এবং সামাজিক রীতিনীতিতে একের উপর অন্যের প্রভাব পড়ে। এসময় বাংলার সাংস্কৃতিক বিকাশ তরান্বিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিজস্ব অবয়ব লাভ করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.১

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. সুলতানী আমলে সমাজে শীর্ষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন-
   ক. উজীর খ. সৈয়দ
   গ. সুলতান ঘ. আমীর উমরাহ

২. বাংলা ভাষায় প্রথম প্রণয়মূলক কাব্য-
   ক. লাইলী-মজনু খ. ইউসুফ-জুলেখা
   গ. শিরি-ফরহাদ ঘ. লোর-চন্দ্রনী

৩. সুলতানী আমলের স্থাপত্য নিদর্শন-
   ক. ষাটগম্বুজ মসজিদ খ. সাতগম্বুজ মসজিদ
   গ. লালবাগ কেল্লা ঘ. পরিবিবির মাজার

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. সুলতানী আমলে বাংলায় হিন্দু সমাজ ছিল ___।
২. ___ ইউসুফ-জুলেখা কাব্য রচনা করেন।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. সুলতানী আমলে হিন্দুদের স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের সুযোগ ছিল না।
২. সুলতানী আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনন্য বিকাশ ঘটে।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. সুলতানী আমলে মুসলিম সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কি ছিল?
২. সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সাথে পারস্যের কোন কবির যোগাযোগ ছিল?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. সুলতানী আমলে বাংলার সামাজিক শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।
২. সুলতানী আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

## পাঠ-২ : সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- ☞ সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ সুলতানী আমলে বাংলার কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিবরণ দিতে পারবেন।

### ২.১ অর্থনৈতিক উন্নতি

মুসলিম শাসন আমলে বাংলায় নিশ্চিতরূপে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। প্রাক-মুসলিম যুগে পাল ও সেন আমলে বাংলায় মুদ্রা অর্থনীতি চালু ছিল না। এসময় বিনিময় মাধ্যম হিসেবে কড়ির প্রচলন ছিল। স্বর্ণমুদ্রা এমনকি রৌপ্যমুদ্রাও ছিল বিরল। মুসলিম শাসনের শুরু থেকে এদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন হয়। এটি মুসলিম আমলে বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চিত প্রমাণ । কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রকাশ পায়।

### ২.২ কৃষিদ্রব্যের প্রাচুর্য

অসংখ্য নদীর কল্যাণে এবং ঋতুমাফিক বৃষ্টিপাত ও প্রাকৃতিক সেচ সুবিধার ফলে বাংলার সমতল ভূমি অত্যন্ত উর্বর ছিল। ভূমির এ উর্বরা শক্তি প্রচুর শস্য, শাক-সবজি এবং ফল-মূল উৎপাদনে সাহায্য করে। উৎপন্ন ফসল ও ফল-মূলের মধ্যে ছিল ধান, তুলা, আখ, পাট, রেশম, হলুদ, মরিচ, দ্রাক্ষা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, আম, কাঁঠাল, কলা, পান-সুপারি, নারকেল ইত্যাদি। এখানে বিভিন্ন রকমের ধান উৎপন্ন হতো। ধান উৎপাদনের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত হতে রপ্তানি করা হতো। খ্রিস্ট্রীয় চতুর্থদশ শতাব্দী হতে বাংলায় পাট চাষের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। পাট থেকে পাটবস্ত্র তৈরি হতো। বাঙালি রমণীরা রকমারী পাটের শাড়ি ও পাটবস্ত্র পরিধান করত বলে সমকালীন সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, কৃষি ফলনের প্রাচুর্য থাকলেও চাষাবাদ ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত। জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কৃষি কাজকেও সম্মানজনক পেশা হিসেবে দেখা হতো। তবে সম্পন্ন কৃষকের সংখ্যা ছিল কম। তাদের অধিকাংশই ছিল ভূমিদাস।

### ২.৩ শিল্পের অগ্রগতি

সেকালের মানের বিচারে সুলতানী বাংলা ছিল অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সময় বাংলায় এসেছিলেন। তিনি এদেশের ধন-ঐশ্বর্যের প্রশংসা করেছেন। ইবনে বতুতা বাংলায় উৎকৃষ্ট শিল্পপণ্য উৎপন্ন হতো বলে লিখেছেন। শিল্পপণ্যের মধ্যে বস্ত্র শিল্পের অগ্রগতি ছিল সবচেয়ে বেশি। এসময় বাংলায় নানা ধরনের সূতিবস্ত্র তৈরি হতো। ইবনে বতুতা বাংলাদেশে সূতি বস্ত্রের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। চৈনিক দূত ও পর্যটকগণও বাংলার সূতি বস্ত্র বয়নের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এখানে অন্তত ছয় প্রকার উন্নতমানের সূতি বস্ত্র তৈরি হতো। 'মসলিন' নামক সূক্ষ্ম সূতি বস্ত্রের বিশ্বজোড়া খ্যাতির কথা জানা যায়। পাটের ও রেশমের বস্ত্র তৈরিতেও বাংলার কৃতিত্ব উল্লেখ্যযোগ্য ছিল। মাহুয়ানের বর্ণনায় বাংলায় রেশম বস্ত্রের উল্লেখ আছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রেশমি ও মসলিন বস্ত্র শিল্প মুসলিম শাসক ও অভিজাত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসার লাভ করেছিল। বাংলার বস্ত্র বিদেশেও রপ্তানি করা হতো।

বাংলায় আখ উৎপাদন ছিল ব্যাপক ও প্রচুর। ফলে এখানে চিনি শিল্পের প্রভূত প্রসার ঘটে। বারবোসা ও বারথোমা প্রমুখ পর্যটক বাংলায় চিনি উৎপাদনের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন রকমের চিনি ও গুড় দেশের চাহিদা মেটানোর পর বিদেশেও রপ্তানি করা হতো।

চৈনিক দূতগণ এসময় বাংলায় আরো কয়েকটি শিল্পের উল্লেখ করেন। এগুলো ছিল- কার্পেট, কাগজ, ইস্পাত, বন্দুক এবং অলংকার শিল্প। সমুদ্রের পানি এবং লবণাক্ত মাটি থেকে লবণ উৎপাদন ছিল মুসলিম বাংলার প্রধান শিল্পগুলোর অন্যতম। উৎপন্ন লবণ সম্ভবত প্রতিবেশী দেশগুলোতে রপ্তানি হতো।

বাংলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ঐতিহ্য ছিল। সুলতানী আমলে নৌযুদ্ধের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপের অভূতপূর্ব উদ্দীপনার ফলে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অগ্রগতি হয়।

### ২.৪ বাণিজ্যের প্রসার

কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচুর উদ্বৃত্তি এবং সমুদ্র যাত্রায় মুসলমানদের নতুন উদ্দীপনার ফলে সুলতানী আমলে বাংলায় বাণিজ্য বহুল পরিসরে সম্প্রসারিত হয়। বারবোসার বর্ণনা মতে, আরব, পারস্য, ভারতবর্ষ ও আবিসিনিয়া হতে বড় বড় বাণিজ্য জাহাজ বাংলায় আসত। এসব জাহাজে আগত বণিক ব্যবসায়ীরা বাংলার বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিয়ে যেত। এসময় বাংলার উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল- সূতি কাপড়, রেশমি বস্ত্র, চাউল, চিনি, বিভিন্ন প্রকার কৃষিজ পণ্য, ফলমূল, লবণ, আফিম ইত্যাদি। এসময় বাংলায় আমদানি পণ্যের তালিকায় ছিল- চীনা মাটির বাসন, বিভিন্ন বিলাস দ্রব্য, আফ্রিকার দাস এবং মধ্য এশিয় ঘোড়া। উল্লেখ্য যে, সমগ্র মুসলিম আমলে বিপুল পরিমাণ রপ্তানি বাণিজ্যের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য খুবই অনুকূল ছিল। আর এই বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্র ধরে বাংলায় বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ, মুক্তা ও মূল্যবান পাথর আমদানি হয়। কেননা বিদেশী বণিকরা এসব পদার্থের মাধ্যমে প্রায়ই বাংলার পণ্যের দাম পরিশোধ করত।

ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যকলাপের জন্য বাংলায় বহু সমুদ্র ও নদী বন্দরের উন্নতি হয়। এসময়ের বিখ্যাত বন্দরের মধ্যে ছিল চট্টগ্রাম, সাতগাঁও, সোনারগাঁও ইত্যাদি। তাছাড়া বাঙালি, তাণ্ডা, গৌড় এবং বাকলা সুলতানী আমলে প্রথম দিকে প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলার অগ্রগতি বিস্ময়কর হলেও এক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত আরব এবং পারসিক বণিকরা। পরবর্তীকালে পর্তুগিজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের প্রাধ্যন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

### সুলভ জীবন যাত্রা

সমসাময়িক বিবরণে বাংলা একটি প্রাচুর্যপূর্ণ ও সুলভ দেশ রূপে চিহ্নিত হয়েছে। ইবনে বতুতা বলেছেন, তিনি বাংলার মতো এত সস্তায় পণ্যদব্য বিক্রি হতে পৃথিবীর আর কোথাও দেখননি। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য কম থাকায় জীবন যাত্রা ছিল সহজ ও সুলভ। তখন বাংলায় তেমন অভাব ছিল না। সাধারণ শ্রেণীর কৃষক-শ্রমিকরাও ভালো খেতে ও স্বচ্ছল জীবন যাপন করতে পারত। ধনী ও বিত্তবান লোকেরা বিলাসী ও ঐশ্বর্যপূর্ণ জীবন যাপন করতেন।

**সার-সংক্ষেপ**

সুলতানী আমলে বাংলায় কৃষিজ ও শিল্প দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির ফলে এদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। বাংলায় এ সময় সুখ-শান্তি বিরাজ করে। সাধারণ লোকদের জীবনেও জটিলতা দেখা দেয়নি। তাদের খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল এবং তাদের জীবন যাত্রা সহজসাধ্য ছিল।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. সুলতানী আমলে উৎপন্ন কৃষিজ পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল-
   ক. ধান খ. গম
   গ. ভূট্টা ঘ. সরিষা

২. বস্ত্র শিল্পের মধ্যে সর্বাধিক উলেখযোগ্য ছিল-
   ক. সূতি বস্ত্র খ. রেশমি বস্ত্র
   গ. পাটবস্ত্র ঘ. মখমল বস্ত্র

৩. সুলতানী আমলে বাংলায় আমদানি পণ্যের তালিকায় ছিল—
   ক. চাউল খ. চীনামাটির বাসন
   গ. পাটজাত দ্রব্য ঘ. চিনি

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. সেকালের মানের বিচারে সুলতানী বাংলা ছিল পৃথিবীর অন্যতম _____ দেশ।
২. সাধারণ শ্রেণীর কৃষক ও শ্রমিকরাও ভালো _____ ও _____ জীবন যাপন করত।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. বাংলার ভূমি ছিল অনুর্বর ও অসমতল।
২. নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সস্তা হওয়ায় জীবন যাত্রার মান ছিল _____ ও _____।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. কোন শতাব্দী হতে বাংলায় পাট চাষের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়?
২. সুলতানী আমলে বাংলার একটি বিখ্যাত সমুদ্র বন্দরের নাম লিখুন।

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. সুলতানী আমলে বাংলার শিল্পের অগ্রতি পর্যালোচনা করুন।
২. সুলতানী আমলে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

## পাঠ-৩ : মোগল আমলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- ☞ মোগল যুগে বাংলার সমাজ কেমন ছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ মোগল যুগে বাংলার ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ☞ মোগল যুগের ধর্মীয় অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।

### ৩.১ সুলতানী আমল থেকে ভিন্নতা

মোগল যুগে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সুলতানী আমল থেকে একটু ভিন্ন ছিল। সুলতানী যুগে বাংলা ছিল অধিকাংশ সময়ই কেন্দ্র হতে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন। ফলে এসময় বাংলার মানুষ নিজেদের মতো করেই নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু মোগল যুগে বাংলা দিল্লির একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এসময় বাংলার সাথে উত্তর ভারতের সরাসির যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ভারতের বাইরে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সাথেও বাংলার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও জীবনধারার সাথে বাংলার মানুষের পরিচয় ঘটে। তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

### ৩.২ সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস

মোগল আমলে সরকার প্রধান হিসেবে সুবাদার বা নবাব ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই তার এ সামাজিক মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সুবাদার বা নবাবও নিজেকে উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষক মনে করতেন এবং তাদের সামাজিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখতেন। নবাব বা সুবাদারের পরেই সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে ছিল অভিজাত সম্প্রদায় ও উচ্চশ্রেণীর স্থান। মোগল আমলে রাষ্ট্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত মুসলমান রাজকর্মচারীদের নিয়ে অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। সুবাদার সব সময় এই অভিজাত সম্প্রদায় দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। নবাবী আমলে অভিজাত সম্প্রদায়ে মুসলমান কর্মচারী ছাড়াও হিন্দুদের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। এসময় অভিজাত শ্রেণীতে হিন্দু-মুসলিম জমিদার ছাড়াও বিত্তবান বণিক ব্যবসায়ীদের স্থান সুনির্দিষ্ট হয়। মোগল যুগে শেখ, সাইয়্যেদ ও আলেমগণ উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা ও প্রচুর বিত্ত না থাকলেও সমাজে তাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। জনগণ তাদেরকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁদের যথেষ্ট প্রভাবের কারণে শাসকগণও তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করতেন।

মোগল যুগে নিম্নশ্রেণীর সরকারি কর্মচারী, উকিল, চিকিৎসক, আইনজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, ধর্ম প্রচারক, শিক্ষক, বেনিয়া-ব্যাংকার প্রভৃতি সমন্বয়ে একটি মধ্যশ্রেণী গড়ে উঠেছিল। বর্তমান সময়ের মতো এ মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুদ্ধিদীপ্ত, স্বচ্ছল ও রাজনীতি সচেতন ছিল না। তবে যোগ্যতা, জ্ঞান ও প্রতিভা বলে তারা সাধারণ মানুষ অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। ছোটখাট ব্যবসায়ী, কৃষক ও শ্রমিকদের সমন্বয়ে মোগল যুগে একটি নিম্নবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল।

### ৩.৩ হিন্দু সমাজের জাতিগত শ্রেণীভেদ

মোগল ও নবাবী আমলে হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। এসময় বাংলার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈশ্যদের প্রাধান্য ছিল। তারা ছিল সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী। তবে হিন্দু সমাজে শূদ্র বা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ছিল সংখ্যায় অধিক। পেশাগত কারণে তারা আবার পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। হিন্দু সমাজে কৌলিন্য প্রথার মারাত্মক প্রভাব ছিল।

### ৩.৪ বাসগৃহ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্য

মোগল যুগে সুবাদার বা নবাবগণ বিলাসবহুল হেরেম ও প্রাচুর্যময় সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। অভিজাতবর্গ এবং পদস্থ সরকারি কর্মচারীরা রাজধানীর বা শহরের প্রশস্ত বাংলো ধরনের বাসগৃহে বসবাস করতেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত লম্বা সাদা জোব্বা পরতেন। হাতে মণিমাণিক্য খচিত অনেগুলো আংটি এবং মাথায় সূক্ষ্ম তুলার কাপড়ের টুপি পরতেন। সাধারণ মুসলমান পুরুষেরা খাটো কোর্তা ও মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করতেন। সকলের পায়েই জুতা থাকত। তবে বিত্তবানদের জুতায় রেশম ও সোনার সুতার কাজ করা থাকত। বিত্তবান বাঙালি হিন্দু পুরুষেরা ধুতি ও চাদর পরিধান করতেন। বিলাসী ব্যক্তিরা কানে স্বর্ণালংকার এবং তসরের কাপড় পরতেন। গরিব লোকেরা

সাধারণত নেংটি ব্যবহার করত। মুসলমান সম্ভ্রান্ত মহিলারা জরিদার মুক্তা বসানো ঝলমলে আকর্ষণীয় পোশাক ও মূল্যবান গহনা পরতেন। বাঙালি সাধারণ মেয়েরা খালি গায়ে শাড়ি পড়তেন। তবে তারাও অলংকারপ্রিয় ছিলেন এবং সাজসজ্জা করতে পছন্দ করতেন। সধবা হিন্দু মেয়েরা শাঁখা, সিঁদুর এবং কাজল ব্যবহার করতেন। আকর্ষণীয় পোশাক ও স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহার করলেও মেয়েরা কঠোর পর্দাপ্রথা মেনে চলত।

### ৩.৫ সামাজিক উৎসব

মোগল যুগে বাংলায় খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও রুচির পরিবর্তন হয়। বাঙালির মাছ-ভাত-তরকারির পাশাপাশি কাবাব, রেজালা, কোর্মা ও অন্যান্য মোঘলাই খাবার এদেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মুসলিম সমাজে নবজাতকের জন্ম এবং নামকরণকে কেন্দ্র করে আকিকা প্রদান ও ভোজ উৎসবের প্রচলন ছিল। তাছাড়া মুসলিম সমাজে পুত্র সন্তানদের খাৎনা, ছেলে-মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে সঙ্গতি অনুযায়ী সামাজিক উৎসব পালনের রীতি প্রচলিত ছিল। মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনা করে কুলখানী ও চেহলামের মতো ধর্মীয় সামাজিক উৎসবাদি পালন করা হতো। হিন্দু সমাজেও নানা উপলক্ষে সামাজিক উৎসবাদি পালিত হতো। মোগল যুগে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল।

### ৩.৬ ধর্মীয় উৎসব

ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজ্হা, মহররম, শবেবরাত, নবী দিবস ইত্যাদি ছিল মুসলিম সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। মুসলিম শাসকগণ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এসব ধর্মীয় উৎসব পালনের ব্যবস্থা করতেন। সাধারণ মানুষ এসব উৎসবাদিতে ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরে একে অন্যের বাড়ি দাওয়াত ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে দৃঢ় রাখতেন। হিন্দু সমাজেও নানা ধর্মীয় উৎসবাদি পালনের রেওয়াজ ছিল ।

### ৩.৭ দাসপ্রথা ও নারীদের অবস্থা

মোগল যুগেও বাংলায় সমাজে দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। দাসদের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। যুবতী দাসীগণ প্রভুদের উপপত্নী হিসেবে ব্যবহৃত হতেন। সমাজে নারীদের অবস্থা খুব ভালো ছিল না। মুসলিম সমাজে নারীদের কিছুটা সম্মানজনক অবস্থা থাকলেও হিন্দু সমাজে তাদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। পুরুষগণ নারীদের তাদের ইচ্ছার দাসী মনে করত। নারীদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। সর্বদা তাদের নিজেদের গৃহকর্মে নিয়োজিত থাকতে হতো। নারীদের সার্বিক দূরাবস্থা থাকলেও হিন্দু-মুসলিম অনেক নারীই নিজ যোগ্যতা ও প্রতিভা বলে নিজেদের স্বাধীন সত্তাকে বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

### ৩.৮ শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ

মোগল যুগে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি সাধিত হয়। শিক্ষানুরাগী নবাব সুবাদার ও পদস্থ কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। এসময় শিক্ষার দ্বার হিন্দু-মুসলিম সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। মসজিদ সংলগ্ন মক্তব ও মাদ্রাসায় মুসলমান বালক-বালিকারা একত্রে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করত। শেখদের খানকাহ ও আলেমদের গৃহ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। মুসলমানদের শিক্ষা ছিল প্রধানত ধর্ম কেন্দ্রিক। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক শিক্ষা মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত থাকলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের অনেকেই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণীর জন্য বিদ্যার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। পাঠশালায় হিন্দু বালক-বালিকারা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করত। পাঠশালায় শিক্ষাকাল ছিল ৬ বছর। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে অক্ষর জ্ঞান ও ব্যাকরণের পাঠ দেয়া হতো। পরে তাদের বাংলা সাহিত্য, গণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান পাঠের সুযোগ দেয়া হতো। উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র টোল বা চতুস্পাঠীতে ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষা, অলংকার, শাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শন পাঠের ব্যবস্থা ছিল।

### ৩.৯ ভাষা ও সাহিত্য

মোগল যুগে শাসকবর্গের ভাষা ছিল ফারসি। তাছাড়া সরকারি কাজে ফারসি ভাষা চালু করার ফলে বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। সরকারি চাকরি লাভের আশায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা ফারসি ভাষা শিখতেন। এসব ফারসি ভাষা জানা কর্মচারীদের 'মুন্সী' বলা হতো। নবাব সুবাহদার ও মুসলিম অভিজাত শ্রেণী ফারসি ভাষা উন্নয়নে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। ফারসি একটি সমৃদ্ধ ভাষা। বাংলা সাহিত্যে এ ভাষার প্রভাব বেশ লক্ষ্য করা যায়। ফারসির প্রভাবে বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়। ফারসি সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও লেখার অনুকরণে বাংলা সাহিত্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ক্রমে বাংলা কবিতায় ফারসি শব্দের ব্যবহার বাড়তে থাকে। ফারসির অনুকরণে বাংলায় গজল ও সূফী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

হিন্দু কবিদের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট হলেও তারাও ফারসি সাহিত্যের প্রভাব এড়াতে পারতেন না। বৈষ্ণব পদাবলীতে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। মোগল যুগে বাংলায় বাউল গানের সৃষ্টি হয়। এসময় কবিগান, মর্সিয়া গানও রচিত হয়।

মোগল যুগে সকল ধর্মের স্বাধীনতা ছিল। ধর্মের ব্যাপারে কোন রকম বাড়াবাড়ি ছিল না। তবে ইসলামের একত্ববাদ সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বাংলার জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এতে বাংলার হিন্দু সমাজেও এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হয়। হিন্দু সমাজে বৈষ্ণবাদের প্রভাবে ভক্তিবাদ ও সাম্যবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ব্রাহ্মাণ্যবাদের গোঁড়ামি দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধারণ হিন্দুরা গোঁড়া হিন্দুদের ধর্মের বদলে মনসা, চণ্ডী, শক্তি ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজায় মনোনিবেশ করে। এসময় পারস্যের সূফীবাদের সাথে বাংলার ভক্তিবাদ মিশে একটি মিশ্র সূফীবাদের সৃষ্টি করে। বাংলায় ফকিরী, দরবেশী, বাউল প্রভৃতি মরমীবাদের উৎপত্তি হয়।

### ৩.১০ স্থাপত্য ও শিল্পকলা

মোগল যুগে স্থাপত্য শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। শিল্প ও স্থাপত্য রসিক বাংলার সুবাদার ও নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় মোগল যুগে বাংলায় অসংখ্য স্থাপত্যকর্ম নির্মিত হয়। মোগল যুগে বাংলার চমৎকার স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে বশে কিছু মসজিদ, কাটরা বা অট্টলিকা, স্মৃতিসৌধ, মাজার, ঈদগাহ এবং দুর্গ। সুবাহদার শাহজাদা আজম বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে একটি বিশাল কাটরা নির্মাণ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর আমলে লালবাগ শাহী মসজিদ নির্মিত হয়। লালবাগ দুর্গের নির্মাণ কাজ তিনি শুরু করেন এবং সুবাহদার শায়েস্ত খান তা সমাপ্ত করেন। তাছাড়া ঢাকার ছোট কাটরা, চকবাজার মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ শায়েস্তা খানের আমলেই নির্মিত হয়। তবে তাঁর আমলে মোগল স্থাপত্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নিদর্শন পরিবিবির মাজার। লালবাগ কেল্লার ভিতরে নির্মিত এ স্থাপত্য নিদর্শনটি সুবাহদার শায়েস্তা খান তাঁর কন্যা পরিবিবির সমাধির উপরে নির্মাণ করেন। বাংলার নবাবদের সময়েও বহু ইমারত নির্মিত হয়। যথা- জিনজিরা প্রাসাদ, চেহেল সেতুন ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, মোগল যুগের ইমারতসমূহ নকশা ও অলংকরণের দিক থেকে একটু ভিন্নতর ছিল। এসময় মসজিদের গম্বুজগুলো ছিল খাঁজকাটা। গম্বুজের চারপাশে ছিল লতা-পাতার কারুকাজ। মসজিদের দেয়াল জুড়ে থাকত লতা-পাতার অলংকরণ।

**সার-সংক্ষেপ**

মোগল শাসনামলে বাংলা দিল্লির একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এসময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এমনকি মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সাথে বাংলার যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে এদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। সামাজিক রীতিনীতি, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে মোগল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এসময় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও উন্নতি সাধিত হয়। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। ধর্মীয় জীবনে পরমত সহিষ্ণুতা ও মরমী সুফীবাদের প্রসার ঘটে। স্থাপত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এসময় বাংলা অগ্রগতি অর্জন করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৩

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. মোগল আমলে ভারতের বাইরে বাংলার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপতি হয়–
   ক. ইউরোপের খ. আফ্রিকার
   গ. মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার ঘ. বার্মার

২. মোগল আমলে মুন্সী বলা হতো–
   ক. ধার্মিক মুসলমানদের খ. শিল্পীদের
   গ. আলেমদের ঘ. ফারসি ভাষা জানা রাজকর্মচারীদের

৩. বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় প্রভাব আছে–
   ক. আরবি সাহিত্যের খ. সংস্কৃত সাহিত্যের

গ. ফারসি সাহিত্যের ঘ. উর্দু সাহিত্যের

৪. পরিবিবির মাজার নির্মাণ করেন–

ক. আজম বেগ খ. শায়েস্তা খান

গ. মীর জুমলা ঘ. আজিমুশ্বান

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. মোগল যুগের বাংলায় ____ বা ___ ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।

২. মোগল ও নবাবী আমলে বাংলার হিন্দু সমাজে ____ প্রথা প্রচলিত ছিল।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. মোগল আমলে নারীদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল।

২. বৈষ্ণব পদাবলীতে ফারসি সাহিত্যে প্রভাব লক্ষণীয়।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. কোন সুবাদার লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করেন?

২. ফারসি ভাষা জানা সরকারি কর্মচারীদের কি বলা হতো?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. মোগল আমলে বাংলার সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে ধারণা দিন।

২. মোগল আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

## পাঠ-৪ : মোগল আমলে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি –**

- ☞ মোগল আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ মোগল আমলে বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

### ৪.১ বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

মোগল যুগে সুবাহ বাংলায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিরাজমান থাকায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার বিপুল সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। এসময় উত্তর ভারত, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সাথে বাংলার ব্যাপক বাণিজ্য সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। তদুপরি ইউরোপীয় বণিকদের আগমন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সুসম্পৃক্ত হওয়ার ফলে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়। এসময় রপ্তানি বাণিজ্যের ব্যাপক বৃদ্ধি হওয়ায় বাংলায় প্রচুর অর্থাগম হয়। ফলে বাংলার কৃষি ও শিল্পের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

### ৪.২ কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্য

বাংলা ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। মোগল যুগে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল কৃষি। বহু নদ-নদী বিধৌত পলিমাটি সমৃদ্ধ পূর্ব-বাংলার বিরাট সমতল ভূমি ছিল কৃষির জন্য খুবই উপযোগী। এখানে পর্যাপ্ত ধান উৎপন্ন হতো। বাংলার উদ্বৃত্ত চাউল উত্তর ও দক্ষিণ ভারত এবং সিংহলে রপ্তানি হতো। বাংলায় উৎপাদিত গম ভারত মহাসগরীয় বিভিন্ন দ্বীপে রপ্তানি হতো। ডাল, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, সরিষাসহ বিভিন্ন প্রকার রবিশস্য এবং আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি ফল-মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। বাংলায় উৎপন্ন মরিচ, হলুদ ও আদা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হতো।

বাংলায় উৎপাদিত আখের খুব সুনাম ছিল। আখের রস হতে উৎপাদিত গুড় ও চিনি দক্ষিণ ভারত, আরব, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হতো। বাংলায় উৎকৃষ্টমানের পাট উৎপন্ন হতো। এ পাট থেকে তৈরি বিভিন্ন পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হতো। বাংলায় বহু যুগ হতে নীল চাষ চালু ছিল। মোগল আমলে বাংলায় উন্নতমানের কার্পাস তুলা উৎপন্ন হতো। বাংলার কার্পাস ক্ষেত্রবিশেষে সুরাট এবং মিশরের কার্পাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। রাজশাহী, মালদাহ এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় রেশম চাষের প্রচলন ছিল।

### ৪.৩ শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্য

মোগল যুগে বাংলার অর্থনীতির আরেক গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল শিল্পজাত দ্রব্য। এসময় বাংলায় কোন বৃহৎ শিল্প গড়ে না উঠলেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্প গড়ে উঠেছিল। এসব ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি ছিল সবচেয়ে বেশি। বস্ত্রের মধ্যে আবার ঢাকার মসলিনের খ্যাতি ছিল শীর্ষস্থানে। মসলিন বস্ত্র ছিল খুবই সূক্ষ্ম ও মিহিন এবং খুবই দামি। রাজপুরুষ ও ধনী অভিজাত মহলই ছিলেন এর মূল ক্রেতা। অভিজাত মহলে এ বস্ত্র খুবই জনপ্রিয় ছিল। বুনন ও মানের দিক থেকে মসলিন কাপড়ের বিভিন্ন নাম ছিল। যথা- মখমল, হাম্মান, জামদানি, তানয়িব, আবরোয়ান, নয়নসুখ, বদনখাস, সরবতি, দোরিয়া, শিরবন্দ ইত্যাদি।

মোগল যুগে রেশম শিল্পেরও উন্নতি হয়েছিল। এ শিল্পের বিকাশে বাংলার সুবাহদার ও নবাবগণ গুরুতপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। দেশীয় তাঁতীরা নানা রকম রেশম বস্ত্র তৈরি করত। কাশিমবাজারে ওলন্দাজদের বিরাট রেশম কারখানা ছিল। সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য স্বল্প মূল্যের মোটা বস্ত্র তৈরির কারখানাও এসময় ছিল।

বস্ত্র শিল্প ছাড়াও মোগল যুগে বাংলায় ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে গালিচা, কাগজ, কাঁসা, পিতল এবং নৌকা প্রভৃতির কারখানা গড়ে উঠেছিল। অলংকার, হাতির দাঁতের শিল্প এবং কাঠের কাজের জন্য বাংলার শিল্পীদের সুনাম ছিল।

### ৪.৪ ব্যবসা-বাণিজ্য

মোগল যুগে বাংলা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং নদীপথে পণ্য পরিবহনের বিশেষ সুবিধা এ সমৃদ্ধি অর্জনের প্রধানতম কারণ। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীতীরে বহু বন্দর গড়ে উঠেছিল। এসব বন্দরের মধ্যে চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও, ঢাকা, সপ্তগ্রাম, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার ও কলিকাতা হতে জলপথে বার্মা, সিংহল, ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সাথে বাণিজ্য পরিচালনা করা হতো। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের

বণিকরা এসময় বাংলার সাথে বাণিজ্য পরিচালনায় সম্পৃক্ত ছিলেন। স্থলপথেও বাংলার সাথে উত্তর ভারত, তুরান ও ইরানের বাণিজ্য চলত। বাংলার বাণিজ্যের বেশিরভাগই ছিল রপ্তানি বাণিজ্য। আর রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল-কার্পাস বস্ত্র, রেশমি কাপড়, সুরা, চাউল, চিনি, ঘি, মাখন, তেল, চন্দন কাঠ, আফিম, মরিচ, আদা, পাটজাত পণ্য, পান-সুপারি, ফল-মূল ইত্যাদি।

রপ্তানি বাণিজ্যের তুলনায় বাংলায় আমদানি বাণিজ্য ছিল খুবই নগণ্য। বাংলার বস্ত্র শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে গুজরাট হতে তুলা এবং চীন হতে কাঁচা রেশম আমদানি করা হতো। ধনী অভিজাত ব্যক্তিরা ইরান থেকে নানা সুগন্ধি ও গালিচা এবং আফ্রিকা হতে দাস আমাদানি করত। এছাড়া বিদেশী বণিকরা বাংলার পণ্য ক্রয়ের জন্য মূল্যবান পাথর, সোনা ও রূপা আমদানি করত।

### ৪.৫ ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও হুন্ডি প্রথা

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সাথে সাথে মোগল যুগে বাংলায় ব্যাংকিং প্রথাও প্রসার লাভ করে। নবাবী আমলে জগৎশেঠ পরিবার ব্যাংকিং ব্যবসার শীর্ষে ছিলেন। শেঠ পরিবার ছাড়াও এসময় বাংলায় বহু মহাজন, শেঠ ও সাহু ছিলেন। তাঁরা হুন্ডির কারবার করতেন। হুন্ডি ছিল বর্তমান যুগের ব্যাংকের চেকের মতো। এ হুন্ডি যে কোন শহরে সংশ্লিষ্ট অফিসে জমা দিলে নগদ টাকা পাওয়া যেত। এমনকি নবাবী আমলে দিল্লিতে খাজনা পরিশোধ এবং বিদেশের সাথে লেদ-দেনেও হুন্ডির ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

### ৪.৬ দ্রব্যমূল্য

মোগল যুগে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যের ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য খুবই সুলভ ছিল। সমসাময়িক ইউরোপীয় বণিক, পর্যটকদের বিবরণীতে বাংলার পণ্যদ্রব্যের সস্তা মূল্য সম্পর্কে জানা যায়। বাংলার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যে কত সস্তা ছিল তার প্রমাণ শায়েস্তা খানের আমলে টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যেত। সুবাহদার মানসিংহের সময় ১৮ কড়িতে (আধ পয়সারও কম) একটি মোটা কাপড় পাওয়া যেত। ১৭২৯ সালে রাজধানী মুর্শিদাবাদে এক টাকায় ৩ মন উৎকৃষ্ট গম এবং এক টাকায় ১০ সের ভালো ঘি পাওয়া যেত।

### ৪.৭ সাধারণ মানুষের অবস্থা

বাংলার জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি কম, সে তুলনায় জমির পরিমাণ বেশি হওয়ায় এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হওয়ায় সাধারণ মানুষ বিশেষ করে কৃষকরা মোটামুটি স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারত। তাছাড়া দ্রব্য মূল্যও ছিল কম। আর সাধারণ মানুষের চাহিদাও ছিল কম। ফলে তাদের জীবন যাত্রাও ছিল সহজ। তবে আজন্মা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাদের জীবনে দুর্দশা নেমে আসত। নগদ অর্থের অভাবে এসময় তারা অসুবিধায় পড়লে মহাজনদের দ্বারস্থ হতো। আর এ সুযোগে সুদখোর মহাজনরা চড়া সুদে ঋণ দিয়ে কৃষকদের সর্বশান্ত করত।

**সার-সংক্ষেপ**

মোগল যুগে বাংলা অর্থনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। এখানকার উর্বর ভূমিতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। দেশের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হতো। এসময় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছিল। বস্ত্র শিল্পের বিশেষ করে মসলিন ও রেশম বস্ত্রের চাহিদা ছিল বিশ্বজুড়ে। মোট কথা কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিপুল উৎপাদন ও রপ্তানি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে বাংলার বিরাট আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটে। এসময় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সুলভ মূল্য জনগণের জীবনমানকে সহজ স্বাভাবিক করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৪

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. মোগল যুগে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল ছিল—
   ক. কৃষি খ. শিল্প
   গ. ব্যবসা-বাণিজ্য ঘ. ব্যাংকিং

২. মোগল যুগে সবচেয়ে খ্যাতিমান শিল্প ছিল—
   ক. কাগজ শিল্প খ. নৌকা তৈরি শিল্প
   গ. মসলিন শিল্পন ঘ. চিনি শিল্প

৩. বাংলায় তুলা আমদানি হতো—
   ক. মিশর থেকে খ. সুরাট থেকে
   গ. গুজরাট থেকে ঘ. ইরাক থেকে

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. বস্ত্রের মধ্যে ঢাকার ___ খ্যাতি ছিল সবচেয়ে বেশি।
২. ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সাথে সাথে মোগল যুগে ___ প্রথারও প্রসার ঘটে।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. মোগল আমলে ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে বস্ত্র শিল্প ছিল প্রধান।
২. মোগল আমলে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বাণিজ্য ছিল বেশি।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. মোগল আমলে কোন দেশ হতে কাঁচা রেশম আমদানি করা হতো?
২. মোগল আমলে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কেমন ছিল?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. মোগল আমলে বাংলার কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বিবরণ দিন।
২. মোগল আমলে বাংলার আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের বর্ণনা দিন।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৮

**বিশদ উত্তর প্রশ্ন**

১. সুলতানী আমলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. সুলতানী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার একটি বিবরণ দিন।
৩. মোগল আমলে বাংলার সমাজ জীবনের পরিচয় দিন।
৪. মোগল আমলে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশ পর্যালোচনা করুন।

ইউনিট ৯

# বাংলায় ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা

## ভূমিকা

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় বাংলায় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করে। তবে পলাশীর বিজয়ে কোম্পানির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় কোম্পানিকে আরো কিছু ধাপ যথা- বক্সার যুদ্ধ, দিউয়ানী লাভ এবং দ্বৈত শাসন ইত্যাদি অতিক্রম করতে হয়। এই ইউনিটের সংশ্লিষ্ট পাঠে বক্সারের যুদ্ধ, কোম্পানির দিউয়ানী লাভ এবং দ্বৈত শাসন ও এর প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ–


➔ পাঠ ১ : বক্সারের যুদ্ধ ও ইংরেজদের দিউয়ানী লাভ

➔ পাঠ ২ : দ্বৈত শাসন ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

## পাঠ-১ : বক্সারের যুদ্ধ ও ইংরেজদের দিউয়ানী লাভ

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ ১৭৬৪ সালের বক্সার যুদ্ধের পটভূমি বা কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব বা ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- ☞ ১৭৬৫ সালে কোম্পানি কিভাবে দিউয়ানী লাভ করে এবং এর ফলাফল কি হয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলা তথা উপমহাদেশের ইতিহাসে বক্সার যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশের রাজনীতিতে অপরাজেয় শক্তির মর্যদা লাভ করে এবং দু'শ বছরের ইংরেজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

### ১.১ মীর জাফরের ক্ষমতাচ্যুতি ও মীর কাশিমের ক্ষমতা লাভ

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সহযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ মীর জাফর বাংলার মসনদ লাভ করেন । তবে নবাবী লাভ করলেও মীর জাফর প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করতে পারেননি। তিনি ছিলেন একজন অযোগ্য ও অকর্মণ্য ব্যক্তি। সিংহাসনে বসে কোম্পানি ও এর কর্মচারীদেরকে প্রচুর অর্থ দিয়েও তিনি তাদের দাবি মেটাতে ব্যর্থ হন। প্রত্যাশিত অর্থ না পেয়ে ইংরেজরা তার উপর অসন্তোষ হয়ে পড়ে। ইংরেজদের প্রবল চাপে অতিষ্ঠ হয়ে মীর জাফরও তাদের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গোপনে চেষ্টা করেন। ফলে কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ১৭৬০ সালে ইংরেজরা মীর জাফরকে পদচ্যুত করে তাঁর জামাতা মীর কাশিমকে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

### ১.২ বক্সারের যুদ্ধের পটভূমি বা কারণ

মীর কাশিম কোম্পানিকে অনেক সুবিধা দানের শর্তে ক্ষমতা লাভ করেন। তবে তিনি মীর জাফরের মতো অকর্মণ্য, অযোগ্য ও হীন চরিত্রের লোক ছিলেন না। তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। ইংরেজদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে থাকার হীন মনোবৃত্তি তার মধ্যে ছিল না। তাই প্রকৃত নবাব হিসেবে দেশ শাসন করার উদ্দেশ্যে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে কোম্পানির সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এ অবনতিশীল সম্পর্ক বক্সারের যুদ্ধের পটভূমি রচনা করে। নিম্নে এসব পদক্ষেপ আলোচনা করা হলো।

**সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ**

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মীর কাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা। নবাবের শাসনকার্যে ইংরেজদের অযাচিত হস্তক্ষেপ তাঁর নিকট অসহনীয় ছিল। তদুপরি তিনি মনে করতেন যে, ইংরেজদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে না পারলে অচিরেই তারা এদেশের ভাগ্য বিধাতা হয়ে দাঁড়াবে। এমতাবস্থায় শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ রোধ এবং ভবিষ্যতে কোম্পানিকে মোকাবিলার জন্য তিনি কতগুলো সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যথা- (ক) মুর্শিদাবাদ হতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তর এবং পরিখা ও দুর্গ দ্বারা এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। (খ) সেনাবাহিনী পুনর্গঠন এবং সামরু ও মার্কার নামক দুজন ইউরোপীয় সৈনিকের সহায়তায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ। (গ) মুঙ্গেরে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং (ঘ) ইংরেজদের প্রীতিভাজন বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণসহ দুনীর্তিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদচ্যুতি, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও নানা প্রকার শাস্তি বিধান। মীর কাশিমের এসব পদক্ষেপ কোম্পানির মধ্যে সন্দেহ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। পরিণামে তা বক্সারের যুদ্ধের অন্যতম কারণ হয়ে দেখা দেয়।

**ইংরেজদের একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা**

১৭১৭ সালে মোগল সম্রাট ফররুখ শিয়ার কর্তৃক প্রদত্ত ফরমান বলে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বিনা শুল্কে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। এজন্য 'দস্তক' নামক ছাড়পত্রের ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এসময় কোম্পানির কর্মচারীরা দস্তকের ব্যাপক অপব্যবহার শুরু করে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ছাড়াও দস্তকের অপব্যবহারের মাধ্যমে তারা আন্তঃবাণিজ্য এমনকি কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বিনাশুল্কে পরিচালনা শুরু করে। এতে সরকার বিপুল

রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। তদুপরি দেশীয় ও অন্যান্য বণিকরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নবাব দস্তকের অব্যবহার সম্পর্কে কোম্পানির কাছে প্রতিকার দাবি করলেও তারা এতে কোন কর্ণপাত করেনি। এমতাবস্থায় নবাব ইংরেজ ও দেশীয় ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীদের উপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক তুলে দেন। এতে নবাব আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলেও দেশীয় বণিকরা অসম বাণিজ্য প্রতিযোগিতার হাত হতে রক্ষা পায়। নবাবের এ ব্যবস্থা ইংরেজদের স্বার্থে আঘাত লাগায় তারা নবাবের সাথে প্রকাশ্য সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

**বক্সারের যুদ্ধ**

ইংরেজ অধ্যক্ষ এলিস কর্তৃক পাটনা দখলকে কেন্দ্র করে মীর কাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। মীর কাশিম পাটনা পুনর্দখল এবং সেখান থেকে এলিসকে বিতাড়িত করলে ক্ষুদ্ধ কলিকাতা কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৭৬৩ সালের ২৪ জুলাই ইংরেজরা গিরিয়া, কটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে মীর কাশিমের বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। নবাব মীর কাশিম প্রথমে পাটনা এবং পরে অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা তাঁকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সহায়তা করতে সম্মত হন। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমও তাদের সাথে যোগ দেন। ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর বিহারের বক্সার নামক স্থানে সম্মিলিত বাহিনীর সাথে মেজর মনরোর নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনীর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

**বক্সার যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব**

বক্সারের যুদ্ধ উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ঐতিহাসিকদের মতে, ব্রিটিশ শক্তির উৎপত্তি হিসেবে উপমহাদেশে পলাশী যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত বক্সার ছিল একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুনিশ্চিত হয়। এতদিন পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানি ছিল ক্ষমতার ভাগাভাগি ও সুযোগ-সুবিধার জন্য শাসকের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তাদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল অনিশ্চিত। বক্সারের যুদ্ধের পর ইংরেজদের ক্ষমতা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য এবং তারা রাজকীয় ক্ষমতার কাছাকাছি এসে পৌঁছায়। নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ডে পালিয়ে গেলে অযোধ্যায়ও ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মীর কাশিমের পলায়ন ও আত্মগোপন এবং দ্বিতীয় শাহ্ আলমের ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণের ফলে উপমহাদেশে ইংরেজ কর্তৃত্ব দ্রুত বিস্তার লাভ করে। তবে এ যুদ্ধের একটি তাৎক্ষণিক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ছিল ইংরেজদের দিউয়ানী লাভ।

**১.৩ ইংরেজদের দিউয়ানী লাভ**

১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বারের মতো গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। দায়িত্ব নিয়েই তিনি বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। সুজাউদ্দৌলাহ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা এবং কারা ও এলাহাবাদ নামক দুটি জেলা ইংরেজদের হাতে তুলে দেন। দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সাথে সম্পাদিত চুক্তির নাম 'এলাহাবাদ চুক্তি'। ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট সম্পাদিত এ চুক্তির মাধ্যমে ইংরেজরা কারা ও এলাহাবাদ জেলা দুটি এবং বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা সম্রাট শাহ আলমকে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। বিনিময়ে সম্রাট ইংরেজদের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানী বা রাজস্ব শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন। অতঃপর ক্লাইভ বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলার নাম মাত্র নবাব নজমুদ্দৌলাকেও ক্ষমতাহীন করে ফেলেন।

**দিউয়ানী লাভের ফলাফল ও গুরুত্ব**

১৭৬৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিউয়ানী লাভ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি ছিল কোম্পানির জন্য এক বিরাট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজয়। এর ফলে আইনত ও কার্যত কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার পূর্ণ কতৃত্বের অধিকারী হয়ে পড়ে। নবাব এমনকি সম্রাটরাও কোম্পানির হাতের পুতুল হয়ে যায়। এ দিউয়ানী লাভের ফলে কোম্পানি অর্থনৈতিক দেওলিয়াত্বের হাত হতে রক্ষা পায়। এদেশের রাজস্ব আয় হতেই কোম্পানি তাদের বাণিজ্য পুজি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। কোম্পানির কর্মচারীরাও বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য করার সুযোগ পায়। ফলে কোম্পানির ও কর্মচারীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলেও এদেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এদেশ থেকে কোম্পানির ব্যাপকভাবে সম্পদ পাচারের ফলে ইংল্যান্ডে শিল্প ও কৃষি বিপ্লব সাধিত হয়।

**সার-সংক্ষেপ**

১৭৬০ সালে মীরজাফরকে উৎখাত করে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি গোপন চুক্তি মাফিক শর্তসাপেক্ষে মীর কাশিমকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। মীর কাশিম ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং স্বাধীনচেতা নবাব। স্বীয় স্বার্থ ও জাতির মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি কতগুলো পদক্ষেপ নেন। তাঁর এসব পদক্ষেপ ইংরেজদের স্বার্থের প্রতিকূল হওয়ায় অচিরেই ইংরেজদের সাথে তাঁর প্রকাশ্য সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সংঘর্ষের শেষ পরিণতি ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সহায়তায় মীর কাশিম ইংরেজদের মোকাবিলা করেন। কিন্তু সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে ১৭৬৫ সালে মোগল সম্রাট এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেউয়ানী সনদ প্রদান করেন। ইংরেজদের এই দেউয়ানী লাভ উপমহাদেশে তাদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের পথকে সুনিশ্চিত করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.১

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. বক্সার অবস্থিত –
   ক. মুর্শিদাবাদে খ. উড়িষ্যায়
   গ. বিহারে ঘ. রাজস্থানে

২. বক্সার যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতির নাম–
   ক. লর্ড ক্লাইভ খ. মেজর মনরো
   গ. কর্নেল স্কট ঘ. ভ্যান্সিটার্ট

৩. যে চুক্তি বলে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দিউয়ানী লাভ করে, তার নাম–
   ক. কলিকাতা চুক্তি খ. আলীনগরের সন্ধী
   গ. দিল্লি চুক্তি ঘ. এলাহাবাদ চুক্তি

৪. ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানী লাভ করে–
   ক. ১৭৬৩ সালে খ. ১৭৬৪ সালে
   গ. ১৭৬৫ সালে ঘ. ১৭৬৬ সালে

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ১৭৬০ সালে ইংরেজরা ___ ক্ষমতাচ্যুত করে মীর কাশিমকে নবাব করেন।
২. দিউয়ানী লাভ ছিল কোম্পানির জন্য এক বিরাট ____ ও ___ বিজয়।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. ইংরেজরা মীর কাশিমকে পদচ্যুত করে পুনরায় মীর জাফরকে নবাব পদে অধিষ্ঠিত করেন।
২. ১৭৬৪ সালে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানী লাভ করে।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. বক্সার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অযোধ্যার নবাবের নাম কি?
২. এলাহাবাদ চুক্তি সম্পাদনকারী ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেলের নাম কি?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন**

১. বক্সারের যুদ্ধের কারণগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. দিউয়ানী বলতে কি বুঝায়?
৪. ইংরেজদের দিউয়ানী লাভের ফলাফল আলোচনা করুন।

## পাঠ-২ : দ্বৈত শাসন ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- ☞ দ্বৈত শাসন কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ দ্বৈত শাসনের ফলাফল আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও দিউয়ানী শাসনের অবসান সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

### ২.১ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা

মোগল শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রাদেশিক শাসনকার্য দুভাগে বিভক্ত ছিল- (ক) নিযামত শাসন (খ) দিউয়ানী শাসন। নবাবী আমলে বাংলার নবাবগণ ছিলনে একাধারে নাযিম ও দিউয়ান। নাযিম হিসেবে তারা প্রশাসন, বিচার ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন। অন্যদিকে দিউয়ান হিসেবে তারা রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা করতেন। বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এখানে নতুন দ্বৈত শাসন নীতি প্রবর্তন করে। নিযামত ও দিউয়ানী এই দ্বিবিধ শাসন কার্যের দায়-দায়িত্ব ভাগাভাগিকে দ্বৈত শাসন বলে। ১৭৬৫ সালে এলাহাবাদ চুক্তির পর ক্লাইভ এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী দিউয়ান হিসেবে কোম্পানির রাজস্ব প্রশাসন ও দেশ রক্ষার ভার থাকে কোম্পানির হাতে, অন্যদিকে নিযামত বা প্রশাসন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত হয় নবাবের হাতে।

### ২.২ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় ক্লাইভের নীতি

১৭৬৫ সালের চুক্তিতে কোম্পানি দিউয়ানী লাভ করলেও চতুর ক্লাইভ দিউয়ানী শাসন পরিচালনার ভার সরাসরি কোম্পানির হাতে দেন নি। এ ব্যাপারে তাদের কিছু বাস্তব অসুবিধা ছিল। যথা-

১. সরাসরি দিউয়ানী শাসন পরিচালনার জন্য কোম্পানির প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোকবল ছিল না।
২. কোম্পানি কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও আইন-কানুন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব ছিল।
৩. কোম্পানির সরাসরি রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনায় এদেশে বাণিজ্যরত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির সাথে সংঘাত অনিবার্য হতো। কেননা বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের ব্যাপার ছিল দিউয়ানীর অন্তর্গত। বিদেশী কোম্পানিগুলো নবাবকে শুল্ক দিতে রাজি ছিল। ইংরেজ কোম্পানিকে নয়। এমতাবস্থায় চতুর ক্লাইভ দিউয়ানী পরিচালনার সমস্ত ভার অর্পণ করেন নবাব তথা দেশীয় আমলাতন্ত্রের উপর। কোম্পানির হাতে রাখা হয় কেন্দ্রীয়ভাবে তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা।

### ২.৩ কোম্পানির প্রতিনিধি দিউয়ান নিয়োগ

এসময় বাংলার নবাব নাজিমুদ্দৌলা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় ক্লাইভ সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খানকে 'নায়েব নাযিম' উপাধি দিয়ে তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত করেন। বাংলার দিউয়ানীর সমস্ত দায়িত্ব রেজা খানকে দেওয়া হয়। আর বিহারের জন্য নিয়োগ করা হয় সিতাব রায়কে। এরা ছিলেন কোম্পানির 'প্রতিনিধি দিউয়ান' বা 'নায়েব দিউয়ান'। এদের কর্মস্থল ছিল যথাক্রমে মুর্শিদাবাদ ও পাটনা। প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত রাজস্ব কোম্পানিকে প্রদান করার শর্তে এদের নিয়োগ করা হয়। কোম্পানির পক্ষ হতে সার্বিক ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য মুর্শিদাবাদ দরবারে একজন ইংজের প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

### ২.৪ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ফলাফল

ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা এদেশের জনগণের জন্য ছিল এক বিরাট অভিশাপ । এ ব্যবস্থায় শাসন দায়িত্ব নবাবের হাতে রইল অথচ অর্থনৈতিক কোন ক্ষমতা ও অধিকার তাঁর রইল না। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় কোন দায়-দায়িত্ব কোম্পানির রইল না, কিন্তু প্রশাসনের মূল ক্ষমতা অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষমতা থেকে গেল কোম্পানির হাতে। তদুপরি নায়েব নাযিম নিয়োগের ক্ষমতা কোম্পানির হাতে থাকায় শাসন পরিচালনাও তাদের ইচ্ছাধীন হয়ে যায়। এভাবে নবাব ক্ষমতাহীন হয়ে যান এবং প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়।

এই ব্যবস্থায় দিউয়ানী পরিচালনার ভার ছিল রেজাখানের হাতে। তবে রাজস্ব হার বাড়ানো-কমানোর দায়িত্ব থেকে গেল কোম্পানির হাতে। কোম্পানির ইচ্ছামত উচ্চহারে রাজস্ব নির্ধারণ, কোম্পানি কর্মচারীদের দুর্নীতি ও লুঠপাট, কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা, ইংল্যান্ডে সম্পদ পাচার, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ফলে

দেশের দুরাবস্থা দিন দিন বাড়তে থাকে । দেশের অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে । বাংলার শান্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধি ধ্বংস হয়ে যায়। তথাপি ক্রমবর্ধমান হারে রাজস্ব আদায়ের জন্য কোম্পানি কর্তৃক রেজা খানের উপর প্রবল চাপ প্রয়োগের ফলে তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে রাজস্ব আদায়কারী আমলাদের অত্যাচারের ভয়ে বহু রায়ত পেশা পরিবর্তন করে বা অন্যত্র পালিয়ে যায়। এ সময় এক প্রলয়ংকারী দুর্ভিক্ষ বাংলার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

### ২.৫ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

দিউয়ানী ও দ্বৈত শাসনের পরিণাম ছিল বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ধ্বংসলীলা। এ দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। দ্বৈত শাসনের কুফলে বাংলার জনজীবন যখন চরম বিপর্যয়ের মুখে তখন পরপর দুবছর খরা ও অনাবৃষ্টির ফলে ১১৭৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। এসময় খাদ্যের অভাবে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খাদ্য কেনার জন্য মানুষ সন্তান বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করত। জীবিত মানুষ গাছের পাতা, ঘাস এমন কি মরা মানুষের গোশত খেয়ে জীবন ধারণ করত। বাংলার জনগণের এরূপ দুর্দশা লাঘবে কোম্পানি কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় নি। অধিকন্তু কোম্পানির দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটায়। এসময় মজুদদারী করে তারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে স্বদেশে পাচার করে। দুর্ভিক্ষের কারণে জনগণকে খাজনার দায় থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। তদুপরি পরের বছর শতকরা ১০ টাকা খাজনা বৃদ্ধি করা হয়। ফলে জনগণের দুর্ভোগ চরম সীমায় উন্নীত হয়।

### ২.৬ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরোক্ষ ফল দ্বৈত শাসনের অবসান। কোম্পানির দায়িত্বহীন ক্ষমতা ও দ্বৈত শাসনের ফলে এ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এ দুর্ভিক্ষের ফলে কোম্পানির রাজস্ব আয় কমে যায়। বাণিজ্যেও মন্দা দেখা দেয়। সর্বোপরি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও মারাত্মক অবনতি ঘটে। এমতাবস্থায় ইংল্যান্ডের কোম্পানি কর্তৃপক্ষ দ্বৈত শাসন অবসানের সিদ্ধান্ত নেন। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে শাসনভার কোম্পানির স্বহস্তে গ্রহণ করেন। নবাবকে প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হয়। রাজস্ব দপ্তরও মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। এভাবে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

**সার-সংক্ষেপ**

পলাশীর যুদ্ধ জয়ের মধ্যদিয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশে আধিপত্য বিস্তারের যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল দিউয়ানী লাভ ও দ্বৈত শাসন প্রবর্তনেরে মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি দিউয়ানী বা রাজস্ব শাসন ও দেশ রক্ষার ভার নিজ হাতে নেয়। অন্য দিকে নিযামত প্রশাসন ও বিচারের দায়িত্ব নবাবের হাতে অর্পণ করে। এ ব্যবস্থা দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থায় কোম্পানি দায়িত্বহীন ক্ষমতা লাভ করে এবং নবাব পায় ক্ষমতাহীন দায়িত্ব। এ ব্যবস্থা বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। অদুপরি অনাবৃষ্টি ও খরার ফলে ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়- ইতিহাসে এটি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। দুর্ভিক্ষ ব্যাপক প্রাণহানীর প্রেক্ষিতে ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসন বাতিল করা হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. দ্বৈত শাসন প্রর্বতন করা হয়-

ক. ১৭৬৪ সালে খ. ১৭৬৫ সালে

গ. ১৭৬৬ সালে ঘ. ১৭৬৭ সালে

২. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল-

ক. ১১৭৬ বঙ্গাব্দে খ. ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে

গ. ১২৭৬ বঙ্গাব্দে ঘ. ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে

৩. কোম্পানির পরিচালক সভার নির্দেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা অবসান ঘটান-

ক. ভেন্সী টার্ট খ. ওয়ারেন হেস্টিংস

গ. লর্ড কর্নওয়ালিস ঘ. উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. নবাবী আমলে নবাবগণ ছিলেন একাধারে ____ ও ____।

২. ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার মোট জসংখ্যার ____ প্রাণ হারায়।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. লর্ড ক্লাইভ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

২. দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় নবাব পেয়েছিলেন দায়িত্বহীন ক্ষমতা।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. লর্ড ক্লাইভ কাকে বাংলার নবাবের অভিভাবক বা নায়েব নাযিম নিয়োগ করেছিলেন?

২. ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব দপ্তর মুর্শিদাবাদ থেকে কোথায় স্থানান্তরিত করেন?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন**

১. দ্বৈত শাসন বলতে কি বুঝায়?

২. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্পর্কে আলোচনা করুন।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৯

**বিশদ উত্তর-প্রশ্ন**

১. বক্সারের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন।

২. দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বলতে কি বুঝায়? দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রভাব আলোচনা করুন।

ইউনিট ১০

# কোম্পানি শাসনামল ও ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন (১৭৭২-১৮৫৮ খ্রি.)

## ভূমিকা

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে উপমহাদেশে ইংরেজ কর্তৃত্বের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৭৬৫ সালে দিউয়ানী লাভের মধ্য দিয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসনভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে কোম্পানি শাসনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে উপমহাদেশে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রকৃত রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক শাসনের ভিত্তি রচিত হয়। এরপর একদিকে যেমন ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা দিন দিন ক্রমেই বাড়তে থাকে, তারা ভারতে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে নানা তৎপরতা অব্যাহত রাখে। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিরোধ সংগ্রামও বাড়তে থাকে। কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যাবহিত পরেই এর বিরুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন পরিচালিত হয়। বাংলার জনজীবনে ইসলামের মৌল অনুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং কোম্পানির দোসর জমিদার ও নীলকরদের হাত থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য যুগপৎভাবে ফরায়েজি আন্দোলন ও তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া আন্দোলন পরিচালিত হয়। তবে এসব আন্দোলন ছিল স্থানীয় ও আকস্মিক। কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সর্বভারতীয় পর্যায়ে পরিচালিত আন্দোলন হলো ১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রাম। এটিকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। যদিও এ সংগ্রাম সফল হয়নি। তথাপিও এর মাধ্যমে ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজকীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

- পাঠ ১ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)
- পাঠ ২ : ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০)
- পাঠ ৩ : ফরায়েজি আন্দোলন
- পাঠ ৪ : তিতুমীরের আন্দোলন
- পাঠ ৫ : ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কোম্পানি শাসনের অবসান

## পাঠ-১ : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- ☞ ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক ইতিহাসে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। কেননা এর মাধ্যমে বঙ্গ-ভারতে ব্রিটিশদের প্রকৃত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শাসনের ভিত্তি রচিত হয়।

### ১.১ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি

ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। তাই এদেশ থেকে মুনাফা লুণ্ঠন এবং পুঁজি সংগ্রহ করা ছিল কোম্পানির মূল লক্ষ্য। ভারতের প্রধান আয়ের উৎস ছিল ভূমি এবং অর্থনীতি ছিল ভূমি কেন্দ্রিক। এমতাবস্থায় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রথম দিকে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল এদেশের ভূমি রাজস্ব প্রশাসন সংগঠিত করা। নানা কারণে কোম্পানি কর্তৃক প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন (১৭৬৫-৭২) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এসময় এদেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এমতাবস্থায় লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসকে কোম্পানির গভর্নর জেনারেল করে পাঠানো হয়। তিনি বাংলায় দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটান এবং বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য জমিদারদের সাথে 'পাঁচসালা ভূমি বন্দোবস্ত' করেন। তবে নানা কারণে এ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ না হলে তিনি ১৭৭৭ সালে 'একসালা বন্দোবস্ত' করেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হওয়ায় ১৭৮৪ সালের ভারত শাসন আইনে কলকাতার কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে একটি স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এ নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশকে গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। তবে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সরকারি বিশেষজ্ঞ মহলে মতানৈক্য থাকায় কর্নওয়ালিশ তাৎক্ষণিকভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে পারেন নি। ১৭৯০ সালে তিনি 'দশসালা বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করেন। তিনি কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর (কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স) অনুমতি পাওয়া গেলে এ ব্যবস্থাকে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' করার আশ্বাস দেন। অবশেষে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর চূড়ান্ত অনুমোদন ক্রমে কর্নওয়াশি ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ 'দশসালা বন্দোবস্ত'কে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বলে ঘোষণা করেন।

### ১.২ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রর্বতনের কারণ বা উদ্দেশ্য

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কিছু আশু কারণ বা উদ্দেশ্য ছিল। যথা- (ক) সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বল্প খরচে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা। (খ) জমির উপর জমিদারদের চিরস্থায়ী মালিকানা প্রদান। কেননা এর ফলে স্বাভাবিকভাবে জমিদারগণ ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করবেন। আবাদি জমির সংখ্যা বাড়বে। একই সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। (গ) এ ব্যবস্থার মাধ্যমে এমন একটি জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করা- যারা শত বাধার মধ্যেও ইংরেজ অনুগত থাকবে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের রাজনৈতিক ভিত্তি হবে।

### ১.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্য

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল কোম্পানি, সরকার ও জমিদারদের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি। এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারকে জমির একমাত্র মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
২. জমিদারদের স্বাধীনভাবে জমি হস্তান্তর, দান বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনের ক্ষমতা দেওয়া হয়।
৩. রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।
৪. কোন অজুহাতে রাজস্ব বাকি রাখা যাবে না। জমির রাজস্ব কিস্তি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে পরিশোধ না করতে পারলে, জমি নিলাম করে রাজস্ব আদায় করা হবে। এই নিয়ম 'সূর্যাস্ত আইন' নামে পরিচিত।
৫. এই ব্যবস্থায় কৃষককে জমিদারের ইচ্ছাধীন প্রজায় পরিণত করা হয় এবং
৬. ভূমি নিয়ন্ত্রণের সর্বশেষ হিসাব রাখার জন্য রাজস্ব ভূমির একটি 'পাঁচসালা' রেজিস্ট্রার রাখার বিধান করা হয়।

### ১.৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল

বঙ্গ-ভারতের ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকগণ এর ফলাফলকে সুফল ও কুফল এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

#### ক. সুফল

**প্রথমত,** জমির উপর স্থায়ী মালিকানা লাভ করায় জমিদারগণ জমির উন্নয়নে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। এতে জমির উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষি অর্থনীতি চাঙ্গা হয়।

**দ্বিতীয়ত,** জমি থেকে সরকারের নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় নিশ্চিত হয়। ফলে কোম্পানির বাজেট প্রণয়ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সুবিধা হয়।

**তৃতীয়ত,** এই ব্যবস্থায় ইংরেজ অনুগত একটি জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এ শ্রেণী এদেশে ব্রিটিশ শাসনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**চতুর্থত,** নবসৃষ্ট বিত্তবান জমিদারদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থ ব্যয়ের ফলে গ্রামীণ সমাজ জীবনে গতিশীলতা আসে। এভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রাম-বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটায়।

#### খ. কুফল

**প্রথমত,** কোন জরিপের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হওয়ায় অনেক জমিদারিতে মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য করা হয়। ফলে অনেক জমিদার নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে 'সূর্যাস্ত আইনে' জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। তখন এগুলো ক্রয় করে নেয় পুঁজিপতি, বেনিয়া মুৎসুদ্দী মহাজন শ্রেণী।

**দ্বিতীয়ত,** নতুন জমিদারদের অনেকেই ছিলেন অনভিজ্ঞ। এরা ছিলেন শহরবাসী। ভূমির সাথে এদের সংযোগ না থাকায় ভূমিতে মধ্যসত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। মুনাফা লোভী এ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী কৃষকদের নানা রকম নিপীড়ন ও নির্যাতন করতেন।

**তৃতীয়ত,** এই ব্যবস্থায় কৃষক ভূমিতে তার মালিকানা হারায়। তারা জমিদারদের ইচ্ছাধীন প্রজায় পরিণত হয়। বর্ধিত হারে খাজনা আদায়ের জন্য জমিদাররা কৃষকদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন চালায়।

**চতুর্থত,** চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ বন্ধ করে দেয়। কেননা অনায়াসে সম্পদ ও মর্যাদা লাভের আশায় পুঁজিপতি শ্রেণী ভূমিতে মূলধন বিনিয়োগে আগ্রহী হয়। অতিরিক্ত করারোপ এবং সরকারের নিরুৎসাহিত করার ফলে শিল্প ও বাণিজ্য খাতে পুঁজি বিনিয়োগ হ্রাস পায়। ফলে শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।

### ১.৫ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মুসলমান সম্প্রদায়

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশের মুসলমান সম্প্রদায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বিনষ্ট হয়। মুসলিম আভিজাত্যের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। কেননা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজস্ব প্রশাসন হতে মুসলমানদের বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু মুসলিম আমলে রাজস্ব প্রশাসনের উচ্চ পদগুলো ছিল মুসলমান অভিজাতদের একচেটিয়া দখলে। নতুন ব্যবস্থায় মুসলিম অভিজাতগণ ভূমির সাথে তাদের সাবেক সম্বন্ধ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ফলে তারা মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন।

**সার-সংক্ষেপ**

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস 'পাঁচসালা বন্দোবস্ত' এবং 'একসালা বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করেন। কিন্তু এ দুটি বন্দোবস্ত রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়নি। এমতাবস্থায় গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ নানা বিচার-বিশ্লেষণ করে ১৭৯৩ সালে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক নতুন প্রথার প্রবর্তন করেন- যা ইতিহাসে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত। এটি ছিল ইংরেজদের একটি সাম্রাজ্যবাদী বিধিব্যবস্থা। এর মাধ্যমে ইংরেজরা এদেশে তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তারা অনেক সফলতা লাভ করলেও এ ব্যবস্থার ফলে সাধারণ কৃষক এমনকি অনেক সম্ভ্রান্ত বনেদি জমিদার সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে নগদ টাকার মালিক ও পুঁজিপতি মহাজনরা রাতারাতি জমিদারে পরিণত হয়। নব সৃষ্ট এ জমিদার শ্রেণী ইংরেজ শাসনের জন্য একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপনে সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করে। ১৯৫০ সালে এ ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.১

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন—
   ক. লর্ড ক্লাইভ
   খ. ওয়ারেন হেস্টিংস
   গ. লর্ড কর্নওয়ালিশ
   ঘ. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক

২. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়-
   ক. ১৭৮৯ সালে
   খ. ১৭৯০ সালে
   গ. ১৭৯১ সালে
   ঘ. ১৭৯৩ সালে

৩. বাংলায় ইংরেজ অনুগত জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি হয়-
   ক. দ্বৈত শাসনের ফলে
   খ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে
   গ. পাঁচসালা বন্দোবস্তের ফলে
   ঘ. একসালা বন্দোবস্তের ফলে

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. _____ পাঁচসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে।
২. ১৭৯৩ সালে _____ বন্দোবস্তকে _____ বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন।
২. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের জমির উপর স্থায়ী মালিকানা দেওয়া হয়।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. কোন গভর্নর জেনারেল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন?
২. নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হলে কোন আইনের মাধ্যমে জমিদারি নিলাম করা হতো?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত -উত্তর প্রশ্ন**

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব বর্ণনা করুন।

## পাঠ-২ : ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০)

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি -**

- ফকির-সন্ন্যাসীদের পরিচয় এবং তাদের বিদ্রোহের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পরিণতি আলোচনা করতে পারবেন।

ব্রিটিশ কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রমে বাংলার প্রতিটি ক্ষেত্রে কোম্পানির হস্তক্ষেপ ও নতুন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের সনাতন অধিকার ও সুবিধা বিনষ্ট করে। ফলে কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই বাংলায় স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলন ও বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০) ছিল এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

### ২.১ ফকির-সন্ন্যাসীদের পরিচয়

ফকির-সন্ন্যাসীরা বাংলারই অধিবাসী। এরা ছিলেন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত নারী-পুরুষ নির্বিশেষ একটি দল। এদের অধিকাংশই ছিল অবিবাহিত এবং সংসারত্যাগী। তাদের অনেকেই বিবস্ত্র অবস্থায় চলাফেরা করতেন। এরা সাধনায় সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে সারা বছর দেশের একস্থান হতে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতেন এবং সুযোগমত বিভিন্ন স্থানে আস্তানা গড়ে তুলতেন। উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে উভয় গোষ্ঠীর যাত্রা শুরু হয়। ফকিররা ছিলেন মাদারিয়া সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত। আর সন্ন্যাসীগণ ছিলেন বেদান্তের মায়াবাদে বিশ্বাসী। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তাদের অনেকেরই আধ্যাত্মিক জগৎ হতে বিচ্যুতি ঘটে। তারা পার্থিব ভোগ বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে।

### ২.২ বিদ্রোহের কারণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিবেশে বাংলায় ফকির-সন্ন্যাসীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ফকির-সন্ন্যাসীরা ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ শুরু করে। এর কারণ—

ক. কোম্পানি সরকার ফকির-সন্ন্যাসীদের স্বাধীন চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করে। এতে তাদের তীর্থস্থান ভ্রমণ ও ধর্মানুষ্ঠানে অবাধ যাতায়াতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। ফলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

খ. ফকির-সন্ন্যাসীরা গ্রামবাসীদের কাছ হতে ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। সরকার এই ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বে-আইনী ঘোষণা করে তাদের জীবিকার পথ রুদ্ধ করে দেয় এবং

গ. সরকার ফকির-সন্ন্যাসীদের ডাকাত-দস্যু হিসেবে আখ্যায়িত করে জমিদারদের সাহায্যে তাদের দমনের চেষ্টা করেণ। এমতাবস্থায় নিজেদের স্বার্থের বিরোধী কোম্পানি সরকারকে উৎখাত করার জন্য ফকির-সন্ন্যাসীরা সশস্ত্র বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়।

### ২.৩ ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ

ফকির মজনু শাহ বুরহানা ছিলেন ফকির আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ও নেতা। অন্যদিকে সন্ন্যাসীদের নেতৃত্ব দেন ভবানী পাঠক। এদের নেতৃত্ব ১৭৬০ সালে বর্ধমান হতে এ সশস্ত্র বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় এবং ১৮০০ সালের মধ্যে ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বগুড়া, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মালদহসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। তবে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের তীব্রতা ছিল উত্তর বঙ্গে। ১৭৭১ সালে ফকির মজনুশাহ সমগ্র উত্তর বঙ্গে বড় রকম ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতা শুরু করেন। উল্লেখ্য যে, ফকির-সন্ন্যাসীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল কোম্পানির কুঠি, জমিদারদের কাছারি, নায়েব-গোমস্তাদের বাড়ি, কোম্পানির সহযোগী দেশীয় বণিকদের নৌকা, কোম্পানির রসদ সরবরাহকারী যানবাহন ইত্যাদি। এসব আক্রমণে তারা বর্শা, তরবারি ও গাদা বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্রের ব্যবহার করতেন। তাদের রণকৌশল ছিল অতর্কিত আক্রমণ ও শত্রুর ক্ষতি সাধন করে নিরাপদে পলায়ন। এ রণকৌশল ব্যবহার করে ফকির-সন্ন্যাসীরা কোম্পানির কুঠি লুঠ এবং অনেক ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে।

### ২.৪ বিদ্রোহ দমনে কোম্পানির পদক্ষেপ

ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ দমনের জন্য লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কোম্পানির সৈন্যদের সাথে মজনু শাহের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীদের কয়েক দফা সংর্ঘষ হয়। তবে কখনও তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা সম্ভব হয় নি। ১৭৮৭ সালে মজনু শাহ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মুসা শাহ, চেরাগ আলী শাহ, সোবাহনা শাহ, মাদার বকস্ এবং করিম শাহ্ প্রমুখ ফকিরদের নেতৃত্ব দেন। এরা সবাই ছিলেন মজনু শাহের আত্মীয়। ১৭৮৭ সালে ইংরেজদের সাথে এক যুদ্ধে সন্ন্যাসী নেতা ভবানী পাঠকও নিহত হন। তার মৃত্যুতে প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৮০০ সাল নাগাদ বিদ্রোহীরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়।

### ২.৫ বিদ্রোহের ব্যর্থতা ও এর কারণ

ব্রিটিশ কোম্পানি শাসন বিরোধী ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ব্যর্থতার কতগুলো কারণ ছিল। যথা–

ক. ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও সুদৃঢ় নেতৃত্বের অভাব । মজনু শাহের মৃত্যুর পর ফকিরদের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল আন্দোলনকে ক্রমশ দুর্বল করে তোলে।

খ. ফকির-সন্ন্যাসীরা ছিল ভ্রাম্যমাণ। স্থানীয় লোকদের সাথে তাদের পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল কম। তাছাড়া মুষ্টি সংগ্রহের জন্য অনেক সময় তারা স্থানীয় জনগণের উপর বল প্রয়োগ করতেন। তাই এ বিদ্রোহে তারা স্থানীয় জনগণের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়।

গ. কোম্পানির সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি, তাদের উন্নত রণকৌশল, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সামরিক প্রযুক্তির কাছে ফকির-সন্ন্যাসীদের পরাজয় ছিল অনিবার্য।

**সার-সংক্ষেপ**

বাংলার প্রতিটি ক্ষেত্রে কোম্পানির হস্তক্ষেপ ও নতুন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ফকির-সন্ন্যাসীরা তাদের সনাতন অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এ অবস্থায় নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই তারা ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এর পেছনে দেশপ্রেম বা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ-চিন্তা ছিল না। নানা প্রতিকূল কারণে এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়। বাংলার সমগ্র অঞ্চলে এ বিদ্রোহের প্রসার ঘটেনি। তবে এর ব্যাপ্তি ছিল উল্লেখযোগ্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন:**

১. বাংলায় ফকির আন্দোলনের প্রধান নেতা ও সংগঠক ছিলেন—
   ক. তিতুমীর
   খ. মজনুশাহ বুরহানা
   গ. হাজী শরীফউল্লাহ
   ঘ. মীর এনায়েত আলী

২. সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন-
   ক. রাণী ভবানী
   খ. দেবী চৌধুরাণী
   গ. ভবাণী পাঠক
   গ. মঙ্গল পাণ্ডে

৩. ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের চূড়ান্ত অবসান ঘটে—
   ক. ১৭৮২ সালে
   খ. ১৭৮০ সালে
   গ. ১৮০০ সালে
   ঘ. ১৭৯৩ সালে

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ফকিররা ছিলেন ____ সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত।
২. সন্ন্যাসীরা ছিলেন বেদান্তের ___ বিশ্বাসী।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. ১৭৬০ সালে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূচনা হয়।
২. দেবী চৌধুরাণী ছিলেন সন্ন্যাসীদের প্রধান নেতা।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. কোন সময়ের মধ্যে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল?
২. ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণকারী গভর্নর জেনারেলের নাম কি?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. বাংলায় ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কারণ কি?
২. কি কি কারণে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল?

## পাঠ-৩ : ফরায়েজি আন্দোলন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ ফরায়েজি আন্দোলন কি, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ ফরায়েজি আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ☞ ফরায়েজি আন্দোলনে হাজী শরিয়ত উল্লাহ ও দুদু মিয়ার ভূমিকার বর্ণনা দিতে পারবেন।

**৩.১** ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা দখলের ফলে বাংলার মুসলমানদের অর্থনৈতিক প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা বিনষ্ট হয় এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিপর্যয় নেমে আসে। শিক্ষার অভাব ও কু-শিক্ষার প্রভাবে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে নানা অনাচার, কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জাতির এ চরম দুর্দিনে মুসলিম চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় মুসলমানদের নৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে সব সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়, তন্মধ্যে 'ফরায়েজি আন্দোলন' অন্যতম। ফরায়েজি আন্দোলনের প্রবক্তা হাজী শরিয়ত উল্লাহ। তার মৃত্যুর পর দুদু মিয়া এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

### ৩.২ হাজী শরিয়ত উল্লাহর পরিচয়

হাজী শরিয়ত উল্লাহ ১৭৮১ সালে বর্তমান মাদারীপুর জেলার শ্যামাইল গ্রামের এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল জলিল তালুকদার। অল্প বয়সে বাবা-মায়ের মৃত্যুতে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। ১৩ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে যান এবং মওলানা বশরত আলীর সান্নিধ্য ও আশ্রয়ে থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি ফুরফুরায় যান এবং দুবছর সেখানে আরবি-ফারসি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদে কিছুদিন চাচার কাছে অবস্থান করেন। ১৭৯৯ সালে উস্তাদ বাশারত আলীর সাথে তিনি মক্কা শরীফে যান এবং ১৮১৮ সাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। সুদীর্ঘ সময় মক্কায় অবস্থান কালে তিনি আরবি সাহিত্য এবং ইসলামী ধর্ম ও আইন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ সময় তিনি আরবের 'ওয়াহাবী আন্দোলনের' সংস্পর্শে আসেন এবং উক্ত আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।

### ৩.৩ হাজী শরিয়ত উল্লাহর সংস্কার আন্দোলন

বাংলার মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে তখন চরম অধঃপতনের কাল। মক্কা থেকে দেশে ফিরে আসার পর বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক অধঃপতনের প্রতি শরিয়ত উল্লাহর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় মুসলিম সমাজকে অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। এজন্য তিনি এক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তার এ আন্দোলন 'ফরায়েজি আন্দোলন' নামে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের গণমানসে এ আন্দোলনের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

### ৩.৪ ফরায়েজি শব্দের অর্থ

'ফরায়েজি' শব্দটি আরবি 'ফরজ' শব্দ হতে উৎপন্ন। 'ফরজ' শব্দের অর্থ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এ সময় বাংলার মুসলমান সমাজ ইসলামের মৌলিক শিক্ষার প্রতি উদাসীন এবং কোরআন সুন্নাহর পরিপন্থী বহুবিধ স্থানীয় লোকাচার ও পর্ব-উৎসব পালনে উৎসাহী ও অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল। তিনি মুসলমানদের এসব পরিহার করে 'ফরজ' বা অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। ইসলামের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য কার্যকর করার এ আন্দোলন 'ফরায়েজি' আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে।

### ৩.৫ ফরায়েজি মতবাদ

হাজী শরিয়ত উল্লাহ ইসলাম পরিপন্থী সব বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইসলামের ফরজ বা অবশ্য করণীয় কর্তব্য পালনের জন্য মুসলমান সমাজকে আহ্বান করেন। ইসলামের নফল বা অতিরিক্ত কর্তব্য পালনের জন্য ফরজ কাজগুলো যাতে ব্যাহত না হয় তিনি সে দিকে সতর্ক থাকার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেন। তিনি একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করাসহ ইসলামের পাঁচটি মূলনীতি অনুসরণের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেন। মুসলিম সমাজে প্রচলিত পীরের প্রতি অতি শ্রদ্ধা, মাজারে কবর সেজদা ইত্যাদিকে 'শিরক' বা মহাপাপ বলে অভিহিত করেন। তিনি জন্ম, মৃত্যু ও

বিবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠান, মিলাদ, ফাতেহা, ওরস এবং মহরমের মাতম ও তাজিয়া নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন। এছাড়া তিনি ন্যায়-বিচার, সামাজিক সাম্য এবং মুসলমানদের মধ্যে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মুসলিম সমাজে সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য ও বর্ণগত কুসংস্কার বিলোপ সাধনের চেষ্টা করেন। তিনি ব্রিটিশ শাসিত ভারতকে 'দারুল হরব' বা 'শত্রু রাষ্ট্র' ঘোষণা করেন এবং দুই ঈদ ও জুম্মার নামাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

### ৩.৬ ফরায়েজি আন্দোলনের বিস্তার

হাজী শরিয়ত উল্লাহর আন্দোলন পূর্ব বাংলার কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। তারা দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই এ আন্দোলন ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, আসাম ও ত্রিপুরা জেলায় প্রসার লাভ করে।

### ৩.৭ রক্ষণশীল মুসলমান ও হিন্দু জমিদারদের সাথে বিরোধ

মুসলমি সমাজে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রচারের ফলে ফরায়েজিদের সাথে রক্ষণশীল গোঁড়া মুসলমানদের বিরোধ বাধে। অনেকেই শরিয়ত উল্লাহর বিরোধিতা এবং নানাভাবে তাকে বাধা দান করেন। ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকার রামনগরে ফরায়েজিদের সাথে রক্ষণশীলদের বিরোধ বাধে এবং শেষ পর্যন্ত তা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় রূপ নেয়। হিন্দু জমিদার শ্রেণী এ সুযোগ গ্রহণ করে ফরায়েজিদের নির্মূলের চেষ্টা করেন। হাজী শরিয়ত উল্লাহ ছিলন তাদের স্বার্থের পথে প্রতিবন্ধক। উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে হিন্দু জমিদার শ্রেণী এ সময় পূর্জা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করতেন। শরিয়ত উল্লাহ মুসলমানদের এসব অবৈধ কর প্রদান না করার জন্য উপদেশ দেন। হিন্দু জমিদারদের গরু জবাই নিষিদ্ধ করাকে অমান্য করার জন্যও তিনি শিষ্যদের আহ্বান জানান। তিনি জমিদার জোতদার ও নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্ছার হবার জন্য তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় বিক্ষুব্ধ হিন্দু জমিদারগণ ফরায়েজিদের বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে বহু মামলা-মকদ্দমা করেন। নীলকরদের সহায়তায় তারা ফরায়েজি আন্দোলন দমনের চেষ্টা করেন। এ অবস্থায় হাজী শরিয়ত উল্লাহ জীবনের অবশিষ্ট সময় বিরোধ এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৮৪০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ফরায়েজি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র দুদু মিয়া।

### ৩.৮ ফরায়েজি আন্দোলন ও দুদু মিয়া

দুদু মিয়ার প্রকৃত নাম মুহসিন উদ্দিন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ ফরায়েজি আন্দোলনের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। দুদু মিয়া পিতার মতো সুপ্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন না, তবে তিনি ছিলেন অপূর্ব সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফরায়েজি আন্দোলনকে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন হতে জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে রায়ত ও চাষীদের বলিষ্ঠ সংগ্রামে পরিণত করেন।

### ৩.৯ সাংগঠনিক তৎপরতা ও খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

দুটি লক্ষ্য সামনে রেখে দুদু মিয়া ফরায়েজিদের সংগঠিত করেন। যথা—

১. হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার হতে ফরায়েজি কৃষকদের রক্ষা করা। এজন্য তিনি একটি প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। মোল্লা জালাল উদ্দিনকে এ বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। ফরায়েজিদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃসংঘও প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিপদে-আপদে তাদের সহযোগিতা করার জন্য একটি তহবিল গঠন করা হয়।

২. দুদু মিয়ার দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য তিনি সনাতনী গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করে সাম্য ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে শালিসির মাধ্যমে সব ধরনের অভিযোগের নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করেন। ফলে ফরায়েজি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সরকারি কোর্ট-কাছারির মামলা-মকদ্দমা এক প্রকার বন্ধ হয়ে যায়।

দুদু মিয়া ফরায়েজিদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি খিলাফত ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ফরায়েজি খিলাফত ব্যবস্থায় ওস্তাদ দুদু মিয়া ছিলেন সর্বোচ্চ মর্যাদায়। তিনি তাঁর অধীনে উপরস্থ 'খলিফা' 'তত্ত্বাবধায়ক খলিফা' এবং 'গাঁও খলিফা' উপাধির তিন শ্রেণীর খলিফা নিয়োগ করেন। ফরায়েজি অধ্যুষিত এলাকার ৩০০ থেকে ৫০০ পরিবারের একটি এলাকায় একজন 'গাঁও খলিফা' নিয়োগ করা হতো। দশ বা ততোধিক 'গাঁও খলিফা' শাসিত অঞ্চল নিয়ে একটি সার্কেল গঠন করা

হয়। সার্কেলের প্রধান ছিলেন 'তত্ত্বাবধায়ক খলিফা'। আর 'উপরস্থ খলিফা'গণ ছিলেন ওস্তাদ দুদু মিয়ার উপদেষ্টা এবং তাঁরা প্রধান কার্যালয় বাহাদুরপুরে ওস্তাদের সাথে অবস্থান করতেন। এভাবে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমে দুদু মিয়া ফরায়েজিদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ কার্যকর করেন।

### ৩.১০ জমিদার ও মহাজনদের সাথে সংঘর্ষ

দুদু মিয়া তাঁর পিতার নমনীয় ও মধ্যপন্থা ত্যাগ করে সক্রিয়ভাবে ফরায়েজি আদর্শ কার্যকর করার ব্যবস্থা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, জমির মালিক আল্লাহ। কাজেই কারো খাজনা আদায়ের অধিকার নেই। তিনি কৃষকদের জমিদার ও মহাজনদের দেয় সব ধরনের বৈধ ও অবৈধ কর প্রদানে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। এতে দলে দলে কৃষক-প্রজা তার দলভুক্ত হয়। অন্যদিকে জমিদার ও মহাজন শ্রেণী বিক্ষুব্ধ হয়। তারা দুদু মিয়ার আন্দোলন দমন করতে নীলকরদের সাথে হাত মেলায়। ফলে তাদের সাথে দুদু মিয়ার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। কানাইপুরের জমিদার, ফরিদপুরের ঘোষ জমিদার এবং পাঁচচরের নীলকুঠির গোমস্তা কালিপ্রসাদের সাথে দুদু মিয়ার সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। তার বিরুদ্ধে অসংখ্য ফৌজদারি মামলা করা হয়। তাঁর অনুসারী শত শত লোককে কারাবরণ ও জুলুম সহ্য করতে হয়।

### ৩.১১ দুদু মিয়ার মৃত্যু

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় সরকার দুদু মিয়াকে রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে অন্তরীণ করে রাখে। দুবছর পর তিনি মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু ফরিদপুর পুলিশ তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে। ১৮৬০ সালে তিনি মুক্তি পান। তবে দীর্ঘ কারাবরণ ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। ১৮৬২ সালে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাব এবং রক্ষণশীলদের বিরোধিতার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে ফরায়েজি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

### ৩.১২ ফরায়েজি আন্দোলনের গুরুত্ব

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে ফরায়েজি আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলমানদের মধ্যে নৈতিক চেতনা ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রতকরণে এ আন্দোলন বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। অন্যায় ও অনৈতিক কার্য পরিহার করে খাঁটি ইসলামী জীবন যাপন ও শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন বাংলার মুসলমান সমাজে প্রেরণা যোগায়।

### সার-সংক্ষেপ

কোম্পানি শাসনামলে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে যে চরম অধঃপতন ঘটে, তার পটভূমিতে হাজী শরিয়ত উল্লাহর নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন শুরু হয়। সূচনাতে এটি ছিল একটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন। ইসলামের মৌলিক বিধান অনুসরণ ও অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠান পরিহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণই ছিল আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। তবে শরিয়ত উল্লাহর মৃত্যুর পর দুদু মিয়ার নেতৃত্বে এ আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এসময় এটি একটি সক্রিয় 'প্রজা আন্দোলনে' রূপ নেয়। অবশ্য দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব এবং অন্যান্য কারণে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৩

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ফরায়েজি আন্দোলনের প্রবর্তক—
   ক. মোঃ আবদুল ওয়াহাব
   খ. সায়্যিদ আহমদ বেরলভী
   গ. তিতুমীর
   ঘ. হাজী শরিয়ত উল্লাহ

২. হাজী শরিয়ত উল্লাহর জন্মস্থান —
   ক. মাদারীপুর জেলায়
   খ. ঢাকা জেলায়
   গ. রংপুর জেলায়
   ঘ. ময়মনসিংহ জেলায়

৩. দুদু মিয়ার ফতোয়া অনুযায়ী জমির মালিক—
   ক. জমিদার
   খ. ব্রিটিশ সরকার
   গ. আল্লাহ
   ঘ. কৃষক নিজে

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. শরিয়ত উল্লাহ ব্রিটিশ শাসিত ভারতকে _____ বলে ঘোষণা করেন।
২. _____ সালে দুদু মিয়া মৃত্যুবরণ করেন।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. শরিয়ত উল্লাহ প্রবর্তিত ফরায়েজি আন্দোলন ছিল মূলত একটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন।
২. মাওলানা বাশারত আলী ছিলেন দুদু মিয়ার লাঠিয়াল বাহিনীর অধিনায়ক।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. ফরায়েজি আন্দোলন বাংলার কোন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল?
২. দুদু মিয়ার প্রকৃত নাম কি?
৩. দুদু মিয়ার মতে জমির প্রকৃত মালিক কে?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কি বুঝায়?
২. হাজী শরিয়ত উল্লাহ্‌র সময় ফরায়েজি আন্দোলনের স্বরূপ কি ছিল?
৩. দুদু মিয়া কিভাবে খিলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন?

## পাঠ-৪ : তিতুমীরের আন্দোলন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- ☞ তিতুমীরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ এ আন্দোলনের প্রকৃতি বা চরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ☞ আন্দোলনের একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।

### ৪.১ তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া আন্দোলন

পূর্ব বাংলায় যখন ফরায়েজি আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল, প্রায় একই সময় পশ্চিম বাংলায়ও আরেকটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের নাম 'তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া'। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তিতুমীর। ১৮২৭ সালে এ আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৮৩১ সালে তিতুমীরের শাহাদাৎ বরণের মধ্যদিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

### ৪.২ তিতুমীরের পরিচয়

তিতুমীরের প্রকৃত নাম সায়্যিদ মীর নিসার আলী। পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার চাঁদপুরের গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৭৮২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর হাসান আলী। বাল্যকালে হাদিস তথা ইসলামী ধর্ম শাস্ত্র, আইন শাস্ত্র, দর্শন, তাসাউফ ও মানবিক বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন সুপুরুষ ও ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী। পড়াশোনার পাশাপাশি গ্রামের ব্যায়ামাগারে কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে একজন কুস্তিগীর হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। লাঠি খেলা এবং তরবারি চালনায়ও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিতুমীর ১৮২২ সালে হজ পালনের জন্য মক্কা শরীফ যান। সেখানে তিনি বিখ্যাত ইসলামী ধর্ম সংস্কারক ও বিপ্লবী নেতা সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর কাছে দীক্ষা নেন। সায়্যিদ আহমদের নির্দেশে তিতুমীর ১৮২৭ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং হায়দরপুরে বসতি স্থাপন করে 'তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া' আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন।

### ৪.৩ তিতুমীরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য

তিতুমীরের আন্দোলনটি শুরু হয়েছিল ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন হিসেবে। পরে এটি প্রজা আন্দোলনে রূপ নেয়। এ আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল দুটি। যথা–

ক. মুসলিম সমাজ হতে শিরক ও বেদাতসহ প্রচলিত কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতি-নীতি নির্মূল করা

খ. বাংলার মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের অনুশাসন অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা।

অবশ্য পরবর্তীতে বাংলার প্রজাকুলের ওপর স্থানীয় জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধ এবং ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে বাংলাকে মুক্ত করা এ আন্দোলনের লক্ষে পরিণত হয়।

### ৪.৪ তিতুমীরের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন

এ সময় বাংলার মুসলিম সমাজ নানা রকম কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি অনুসরণ করত। এমতাবস্থায় তিতুমীর বাংলার মুসলমানদের যে সব নিয়ম-নীতি মেনে চলার নির্দেশ দেন তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো–

ক. একমাত্র আল্লাহকে উপাস্য হিসেবে মান্য করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করা।

খ. কোন পীরের কাছে মাথা নত না করা, মাজার তৈরি এবং তাতে কোন কিছু মানত না করা।

গ. স্থানীয় অনৈসলামিক রীতি-প্রথা, অভ্যাস, আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার পরিহার করা এবং

ঘ. ফাতেহা, ওরস, মিলাদ, কিয়াম ও মহররম উদযাপন ইত্যাদি বেদাতী কার্যকলাপ পরিহার করা।

তিনি মুসলমানদের কাছা বা গোছ খুলে তহবন্দের মতো ধুতি পরতে এবং ইসলামের সুন্নত মোতাবেক দাড়ি রাখতে নির্দেশ দেন। এভাবে তিতুমীর মুসলমানদের বিজাতীয় প্রভাব, কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতি-নীতির কবল থেকে মুক্ত করে ইসলাম ধর্মের আদি বিশুদ্ধতায় ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলা থেকে তাঁর সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় এবং ক্রমে তা অন্যান্য স্থানে বিস্তার লাভ করে। অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকশ মুসলমান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

### ৪.৫ জমিদার ও ইংরেজদের সাথে সংঘাত

প্রথমে তিতুমীরের আন্দোলন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময় এতে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। এসময় রক্ষণশীল মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর অল্প-স্বল্প বিরোধ হয়। তবে চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলার বহু কৃষক ও তাঁতী তিতুমীরের আন্দোলনে যোগ দিলে তা গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। তিতুমীরের নেতৃত্বে মুসলমান প্রজাদের সংঘবদ্ধ হওয়ায় স্থানীয় হিন্দু জমিদারগণ আতঙ্কিত বোধ করেন। তারা তিতুমীরের অনুসারী প্রজাদের অযথা হয়রানি ও উৎপীড়ন শুরু করেন। মুসলমান রায়তদের উপর আড়াই টাকা হারে 'দাড়ি ট্যাক্স' আরোপ করা হয়। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও রাণাঘাট এলাকার সাতজন বড় বড় জমিদার একজোট হয়ে তিতুমীরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহীতা, মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু ধর্ম ও এর অনুসারীদের ক্ষতি সাধন ইত্যাদি অভিযোগ এনে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা শুরু করেন। ফলে তিতুমীরের সাথে এসব জমিদারদের সংঘর্ষ বাধে। এ প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা এবং কৃষকদের নিরাপত্তা দানের জন্য তিতুমীর একটি 'মুজাহিদ বাহিনী' গঠন করেন। তাঁর শিষ্য ও ভাগ্নে গোলাম মাসুমকে এ বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করা হয়। তিতুমীরের তৎপরতা ও শক্তি বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে গোবরাডাঙ্গার জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তারাগোনিয়ার রাজ নারায়ণ, নাগপুরের গৌরী প্রসাদ চৌধুরী সম্মিলিত জোট তৈরি করেন। তাঁরা তিতুমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরেজদের সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেন। গোবরাডাঙ্গার জমিদারের প্ররোচনায় মোল্লাহাটির ইংরেজ কুঠিয়াল ডেভিস তিতুমীরের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। তিতুমীরের বাহিনী নীলকুঠি আক্রমণ করে তা লুণ্ঠন এবং কুঠি প্রধানকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তিতুমীরের সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষে লাউঘাটার জমিদার দেবনাথ রায় নিহত হন। এমতাবস্থায় ভীত সন্ত্রস্ত্র জমিদার ও নীলকরগণ তিতুমীরের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান।

### ৪.৬ তিতুমীরের বাশের কেল্লা

তিতুমীর ১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসে নারকেলবাড়িয়ায় এক দুর্ভেদ্য বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে পাঁচ সহস্র মুজাহিদ মোতায়েন করা হয়। প্রয়োজনীয় সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর তিতুমীর নিজেকে 'বাদশাহ' ঘোষণা করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানান। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও ফকিরপুর জেলায় তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি তিনি তাকি ও গোবরাডাঙ্গার জমিদারদের নিকট কর দাবি করলে তারা ইংরেজদের শরণাপন্ন হন।

### ৪.৭ ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষে তিতুমীরের মৃত্যু

জমিদারদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ইংরেজ সরকার তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের দমনের জন্য বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজেন্ডারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠায়। কিন্তু তিতুমীরের মুজাহিদ বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৫ জন ইংরেজ সৈন্য নিহত ও বহু আহত হয়। কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনীও তিতুমীরের অনুসারীদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বড় লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ১৮৩১ সালের ১৭ নভেম্বর মেজর স্কটের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন। তিতুমীর তাঁর অনুসারীদের নিয়ে সাহসের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। কিন্তু ইংরেজদের কামানের গোলার আঘাতে তাঁর বাঁশের কেল্লা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। ৫০ জন অনুসারীসহ তিতুমীর নিজে যুদ্ধে শহীদ হন। মুজাহিদ বাহিনী প্রধান গোলাম মাসুম সহ ২৫০ জনকে বন্দি করা হয়। পরে এক প্রহসনমূলক বিচারে গোলাম মাসুমকে ফাঁসি এবং অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

### ৪.৮ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি

মুখ্যত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে 'তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া' আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। তিতুমীরের নেতৃত্বে এবং আন্দোলনটি শেষ পর্যন্ত জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার এবং ইংরেজ শাসন বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নিয়েছিল। তিতুমীরের শাহাদাৎবরণ এবং গোলাম মাসুমের ফাঁসির মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

**সার-সংক্ষেপ**

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলিম সমাজ যখন নানা রকম কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতি-নীতির অনুসরণে আচ্ছন্ন তখন পশ্চিমবঙ্গে তিতুমীর 'তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া' আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার হলেও পরবর্তীতে এটি একটি প্রজা আন্দোলনে রূপ নেয়। স্বার্থ-দ্বন্দ্বের কারণে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীদের সাথে হিন্দু জমিদার, নীলকর ও ইংরেজদের সশস্ত্র সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের সম্মিলিত শক্তির কাছে তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীরা পরাস্ত হন এবং আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। তার এ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এটি প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। এখানেই এ আন্দোলনের বড় গুরুত্ব।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৪

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের নাম—
   ক. জেহাদ আন্দোলন
   খ. ফরায়েজি আন্দোলন
   গ. ওয়াহাবী আন্দোলন
   ঘ. তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া আন্দোলন

২. তিতুমীরের আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—
   ক. ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার
   খ. রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ
   গ. অর্থনৈতিক সংস্কার
   ঘ. জনকল্যাণ সাধন

৩. তিতুমীর শাহাদাৎবরণ করেন—
   ক. ১৮৩০ সালে
   খ. ১৮৩১ সালে
   গ. ১৮৩২ সালে
   ঘ. ১৮৩৩ সালে

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুণ**

১. তিতুমীর পশ্চিম বঙ্গের ____ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।
২. ১৮৩১ সালে তিতুমীর ____ একটি দুর্ভেদ্য বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. মক্কায় তিতুমীর সায়্যিদ আহমদ বেরলভীর নিকট দীক্ষা নেন।
২. তিতুমীর মুসলমানদের পীর প্রথা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. তিতুমীরের পিতার নাম কি?
২. মুজাহিদ বাহিনীর অধিনায়ক কে ছিলেন?
৩. তিতুমীরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণকারী বড়লাটের নাম কি?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. তিতুমীরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২. সংক্ষেপে জমিদার ও ইংরেজদের সাথে তিতুমীরের সংঘর্ষের বিবরণ দিন।

## পাঠ-৫ : ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কোম্পানি শাসনের অবসান

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি ¾**

- ☞ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ এই সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণগুলো আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক যুগান্তকারী ঘটনা। নানা কারণে এ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। তবে এর ফলে ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। উপমহাদেশের শাসনভার ব্রিটিশ রাজ ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়। ফলে ভারতের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

### ৫.১ স্বরূপ ও প্রকৃতি

১৮৫৭ সালে সংঘটিত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও সমকালীন ইংরেজ কর্মচারীদের মতে, এটি ছিল সিপাহী বিদ্রোহ। কোন কোন ভারতীয় ঐতিহাসিকও এ মত পোষণ করেন। কেননা তাদের মতে, এর পিছনে কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য বা পরিকল্পনা ছিল না। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এতে যোগ দেয়নি। কোন কোন ব্রিটিশ এবং বিশেষ করে অধিকাংশ ভারতীয় ঐতিহাসিক ও লেখকদের মতে, এটি ছিল ব্রিটিশ শাসন অবসানকল্পে ভারতীয়দের প্রথম জাতীয় সংগ্রাম বা 'স্বাধীনতা লড়াই'। এ লড়াই শুধু সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ব্যাপক গণমানুষ এর প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ করে।

### ৫.২ স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহ

১৮৫৭ সালের সংগ্রামের নানাবিধ কারণ ছিল। এসব কারণকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ এ দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। পরোক্ষ কারণসমূহের মধ্যে ছিল- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক অসন্তোষ। নিম্নে ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণসমূহ আলোচনা করা হলো।

#### ক. রাজনৈতিক কারণ

গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। 'স্বত্ব বিলোপ নীতি' প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর কয়েকটি হিন্দু ও মুসলিম রাজ্য দখল, নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করা, মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে অপমান, মোগল সম্রাটের উপাধি হরণ ইত্যাদি হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রাজ্যচ্যুত রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের জন্য বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

#### খ. অর্থনৈতিক কারণ

পলাশী যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানির ভারত থেকে সোনা, রূপাসহ নগদ অর্থ ও মূল্যবান সম্পদ ব্রিটেনে পাচারের ফলে ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাজেয়াপ্তি, সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রচলন, দেশীয় রাজ্য গ্রাস এবং নতুন চাকরি আইনের ফলে বহু লোক বেকার কর্মহীন ও আর্থিকভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। অবাধে ব্রিটিশ পণ্য আমদানির ফলে দেশীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে পড়ে। বৈষম্যমূলক শুল্ক ও কর আরোপের ফলে দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য হুমকীর সম্মুখীন হয় এবং এর সাথে সংশ্লিষ্টদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। ভারতীয়দের এরূপ অর্থনৈতিক বিপর্যয় কোম্পানি শাসন বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

#### গ. সামাজিক কারণ

ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের উন্নাসিক মনোভাব, অনৈতিক আচার-আচরণ উভয়ের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টি করে। সে কারণে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ আইন, শিশু হত্যা নিবারণ, নারী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি সামাজিক সংস্কার ভারতীয়দের ব্রিটিশদের প্রতি সন্দেহপরায়ণ করে তোলে। ফলে তারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়।

**ঘ. ধর্মীয় কারণ**

ভারতীয়দের ধর্ম সম্পর্কে খ্রিস্টান মিশনারীদের অশালীন মন্তব্য, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, ব্যারাকের সিপাহী এবং জেলখানার কয়েদিসহ সর্বত্র খ্রিস্ট ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও ভারতীয়দের ধর্মান্তরকরণ তৎপরতা, ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নতুন আইন ধর্মভীরু ভারতীয়দের বিচলিত করে তোলে। ফলে তারা ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

**ঙ. সামরিক কারণ**

সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল সামরিক অসন্তোষ। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সিপাহীরা ছিল সংখ্যাগুরু। কিন্তু বেতন-ভাতা ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে তারা ব্রিটিশদের তুলনায় ছিল সুবিধা বঞ্চিত। তদুপরি ব্রিটিশ অফিসারদের উদ্ধত, অশালীন ও অপমানজনক আচরণ ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি করে। ভারতীয় সৈন্যদের কপালে তিলক লেপন, দাড়ি রাখা এবং পাগড়ি পরা নিষিদ্ধকরণ এবং সমুদ্র পাড়ি দিতে বাধ্যকরণের ফলে তাদের ধর্ম বিশ্বাসেও মারাত্মক আঘাত হানে। তারা ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

**চ. প্রত্যক্ষ কারণ**

উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে যখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত তখন চর্বি মিশ্রিত কার্তুজ প্রবর্তনের ঘটনা বারুদে অগ্নী স্ফুলিঙ্গের কাজ করে। ১৮৫৬ সালে সেনাবাহিনীতে 'এনফিল্ড রাইফেল' প্রচলন করা হয়। এতে ব্যবহৃত কার্তুজ দাঁতে কেটে ভরতে হতো। গুজব রটে যে, এ কার্তুজে শুকর ও গরুর চর্বি মেশানো আছে। এটি ধর্মনাশের একটি পরিকল্পিত ও সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র বলে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে দারুন বিক্ষোভের সূচনা করে। ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নী জ্বলে ওঠে।

**৫.৩ বিদ্রোহের ঘটনা**

১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরের সেনানিবাসে 'মঙ্গল পান্ডে' নামক একজন সিপাহী প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে। ক্রমে এ বিদ্রোহ মিরাট, দিল্লি, বেরলী, ফতেহপুর, কানপুর, বুন্দেল খণ্ড, রোহিলা খণ্ড, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, কলকাতা, বিহার, চট্টগ্রাম, ঢাকা, যশোর এবং দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা মোগল সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহকে ভারতের বাদশাহ ও বিদ্রোহের নেতা ঘোষণা করে। মারাঠা নেতা নানা সাহেব, ঝাঁসির রাণি লক্ষীবাঈ, মৌলভী লিয়াকত আলী, মৌলভী আহম্মদ উল্লাহ প্রমুখ বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। সিপাহীরা জেলখানা ভেঙ্গে কয়েদিদের মুক্তি, খাজাঞ্চিখানা লুঠ এবং সর্বত্র ব্রিটিশদের আক্রমণ করে। উল্লেখ্য যে, ১৮৫৭ সালের সংগ্রাম প্রথমত সিপাহী বিদ্রোহ রূপে শুরু হলেও পরে তা ব্যাপকতা লাভ করে। বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় বেসামরিক জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতির কারণে তা গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

**৫.৪ ইংরেজদের সংগ্রাম দমন**

গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং সিপাহী ও জনতার ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম দমনের প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হেনরী লরেন্স, হিভলক, কালন ক্যাম্পবেল প্রমুখ সেনাপতিদের সাহায্যে অত্যন্ত কঠোর হাতে বিদ্রোহ দমন করা হয়। পরাজিত বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতা মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেয়া হয়। মারাঠা নেতা নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় নেন। ঝাঁসির রাণি যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন। বিদ্রোহীদের অনেককে কারাদণ্ড এবং অনেক ফাঁসি দেওয়া হয়। এভাবে ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে।

**৫.৫ ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণ**

ব্যাপকতা ও সময়ের দিক বিবেচনায় ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে নানাবিধ কারণে শেষ পর্যন্ত এটি সফল হয়নি। এর ব্যর্থতার কারণগুলো ছিল :

১. সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত পরিকল্পনার অভাব;
২. দক্ষ, সুযোগ্য এবং একক নেতৃত্বের অভাব;
৩. সাংগঠনিক দুর্বলতা;
৪. সিপাহীদের যুদ্ধাস্ত্র ও প্রয়োজনীয় রসদের অভাব;
৫. ইংরেজদের উন্নত সামরিক কৌশল ও যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার;

৬. ব্রিটিশদের ডাক ও তার ব্যবস্থাসহ উন্নত যোগাযোগ সুবিধা;
৭. ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, অধিকাংশ দেশীয় নৃপতি, জমিদার, পুঁজিপতি শ্রেণী, ভারতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা শিখ ও গুর্খা বাহিনী এবং কিছু সংখ্যক রাজপুত যোদ্ধার ইংরেজদের সহযোগিতা দান, এবং
৮. সর্বোপরি প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই সিপাহীদের বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ ইত্যাদি।

**৫.৬ ফলাফল বা প্রভাব**

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি যুগান্তকারী ঘটনা। নানা কারণে এ সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও এর ফলাফল ছিল তাৎক্ষণিক ও সুদূর প্রসারী। যথা–

১. এর ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষের শাসনভার ব্রিটিশ রাজ ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়। রাজার প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের গভর্নর জেনারেলের উপাধি হয় 'ভাইসরয়'।
২. এর ফলে ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে এক রাজকীয় ঘোষণায় মহারাণি ভিক্টোরিয়া ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার, স্বত্ব বিলোপনীতি বাতিল এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়দের যোগ্যতা অনুসারে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের আশ্বাস দেন।
৩. ভবিষ্যতে সেনা বিদ্রোহ রোধের জন্য সেনাবাহিনীতে ইউরোপীয় সৈন্য সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং সেনাবাহিনীতে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিভেদ বজায় রাখার কৌশল অবলম্বন করা হয়।
৪. মোগল সম্রাটের আইনগত অধিকার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হয়।
৫. বিদ্রোহের জন্য মুসলমানদের দায়ী করে তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত করা হয় এবং
৬. এর ফলে ভারতীয়দের মধ্যে দেশত্ববোধ ও জাতীয় চেতনার সৃষ্টি হয়।

**সার-সংক্ষেপ**

ভারতের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক ক্ষেত্রে কোম্পানি সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুসৃত নীতি ভারতের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল এ অসন্তোষ ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। নানাবিধ কারণে এ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। তবে এর ফলে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। উপমহাদেশের শাসনভার ব্রিটিশ রাজ ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়। এটি ভারতের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৫

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল—
   ক. সামাজিক অসন্তোষ
   খ. স্বত্ব বিলোপ নীতি বাতিল
   গ. খ্রিস্ট ধর্মের ব্যাপক প্রচার
   ঘ. এনফিল্ড রাইফেল প্রবর্তন

২. সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন মোগল সম্রাট—
   ক. দ্বিতীয় আলমগীর
   খ. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ
   গ. দ্বিতীয় শাহ আলম
   ঘ. বখ্‌ত খান

৩. ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ রাজের হাতে অর্পিত হয়—
   ক. ১৮৫৭ সালে
   খ. ১৮৬০ সালে
   গ. ১৮৫৮ সালে
   ঘ. ১৮৬২ সালে

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ১৮৫৬ সালে সেনাবাহিনীতে _____ রাইফেল প্রবর্তন করা হয়।
২. ১৮৫৮ সালে _____ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. ব্যারাকপুর সেনানিবাসে মঙ্গলপান্ডে নামক একজন সিপাহী প্রথম প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।
২. সম্রাট বাহাদুর শাহকে নেপালে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ কারণ কি?
২. কোন আইনানুসারে ভারতে ব্রিটিশ রাজ শাসন প্রতিষ্ঠত হয়।

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বরূপ ও প্রকৃতি আলোচনা করুন।
২. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ আলোচনা করুন।
৩. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম কেন ব্যর্থ হয়েছিল।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ১০

**বিশদ উত্তর প্রশ্ন**

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি? এর ফলাফল আলোচনা করুন।
২. বাংলায় ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের একটি বিবরণ দিন।
৩. ফরায়েজি আন্দোলন কি? ফরায়েজি আন্দোলনে হাজী শরিয়ত উল্লাহ্‌র ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।
৪. ফরায়েজি আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে দুদু মিয়ার কর্মকাণ্ড আলোচনা করুন।
৫. উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি উল্লেখপূর্বক তিতুমীরের আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৬. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন।

ইউনিট
১১

# সংস্কার আন্দোলন ও পুনর্জাগরণ

## ভূমিকা

পলাশীর যুদ্ধের পর বঙ্গ-ভারতের রাজনৈতিক ও সাধারণ জনজীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। এদেশের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই নেমে আসে অবক্ষয়। এসময় বাংলার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। তবে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, ইউরোপের সৃষ্টিশীল চিন্তাধারার আমদানি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, স্থানীয় শাসন প্রর্বতন ইত্যাদির ফলে আস্তে আস্তে অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। এসময় পাশ্চাত্য ভাবধারায় উজ্জীবিত কতিপয় মনীষীর প্রচেষ্টায় বঙ্গ-ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুনর্জাগরণের ঢেউ জাগে। ভারতীয়দের মধ্যে নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শ সৃষ্টিতে যারা অনন্য ভূমিকা পালন করেন, তন্মধ্যে রাজা রামমোহান রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ–


➔ পাঠ ১ : রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

➔ পাঠ ২ : মুসলিম নবজাগরণ ও নওয়াব আবদুল লতিফ

➔ পাঠ ৩ : মুসলিম নবজাগরণ ও সৈয়দ আমীর আলী

➔ পাঠ ৪ : স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলন

## পাঠ-১ : রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- ☞ রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কারমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- ☞ শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

## ১.১ রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২/৭৪-১৮৩৩ খ্রি.)

**রামমোহন রায়ের পরিচয়, শিক্ষা ও কর্ম জীবন**

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন বাংলা ও ভারতের নব জাগরণের অগ্রদূত। তাঁর জন্ম ১৭৭২ মন্বান্তরে ১৭৭৪ সালে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে। তাঁর পিতা রামকান্ত রায় একজন মোগল রাজকর্মচারী ছিলেন। রামমোহন রায় ছিলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি প্রথমে ভারতের গতানুগতিক সনাতনী শিক্ষা লাভ করেন। জ্ঞান চর্চার সূত্র ধরে তিনি হিন্দি ও মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও বেশ কয়েকটি ভাষা যেমন- আরবি, ফারসি, সংস্কৃতি, গ্রিক, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষায় অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। রামমোহন রায়ের কর্মজীবন শুরু হয় রংপুরের কালেক্টর দপ্তরের সেরেস্তাদার হিসেবে। পরে তিনি দেওয়ান পদে পনোন্নতি লাভ করেন। কালেক্টর অফিসে চাকরির সুবাদে রামমোহনের পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। অল্পকালের মধ্যেই তিনি একজন সমাজ সচেতন মুক্তবুদ্ধিবাদী চিন্তাবিদ হিসেবে বিদ্বৎ সমাজে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮১৪ সালের মাঝামাঝি রামমোহন কলকাতায় বসতি স্থাপন করেন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৩০ সালে খেতাব সর্বস্ব মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দেন এবং তাঁর পক্ষে ওকালতি করার জন্য ইংল্যান্ডে পাঠান। ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি পরলোকগমণ করেন।

**১.২ রামমোহন রায়ের ধর্মীয় সংস্কার**

রামমোহনের সমসাময়িক কালে বাংলার ধর্মীয় জীবন সংস্কারে পূর্ণ ছিল। সমাজে অশিক্ষিত ও দুর্নীতিপরায়ণ পুরোহিত শ্রেণীর আধিপত্য ছিল প্রবল। এ অবস্থায় তিনি অনুভব করেন যে, এদেশের মানুষকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মুক্ত করার জন্য ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংস্কার প্রয়োজন । এজন্য তিনি 'তুহফাতুল মুয়াহিদ্দিন নামে' একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি তীব্র ভাষায় হিন্দু ধর্মের মূর্তি পূজা, ধর্মভেদ প্রথার কঠোরতা এবং অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের নিন্দা করেন এবং এক ঈশ্বরের আরাধনার কথা বলেন। ১৮১৫ সালে রামমোহন কলকাতায় 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার শিক্ষিত অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেই এ সভার সদস্য হন। এর সদস্যগণ তৎকালীন বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করতেন। ১৮২৮ সালে রামমোহন 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। বস্তুত এটি ছিল হিন্দু ধর্মের একটি নতুন শাখা। 'ব্রাহ্ম সমাজ' ছিল একেশ্বরবাদী। বস্তুত রামমোহন ছিলেন একজন উদারবাদী ধর্ম সংস্কারক। সনাতন সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করার লক্ষে তিনি বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তিতে নিজস্ব উদারবাদী ধর্মমত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

**১.৩ রামমোহনের সামাজিক সংস্কার**

সমাজ সংস্কারক হিসেবে রামমোহন রায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ভারতীয় সমাজ জীবন হতে বর্ণ প্রথা, বাল্য-বিবাহ, বহু বিবাহ, সহমরণ ও সতীদাহের মতো কুসংস্কারগুলোকে উচ্ছেদকরণে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। তিনি সম্পত্তির উপর নারীর সমান অধিকার দাবি করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টাকে সনাতনপন্থী রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তারা রামমোহনের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর তীব্র সমালোচনা শুরু করেন।

**১.৪ শিক্ষা প্রসার**

শিক্ষা প্রসারেও রামমোহন রায় বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। এদেশীয় লোকদের নিজ স্বার্থেই ইংরেজি শিক্ষা অর্জন প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন সংস্কৃত পণ্ডিত। তথাপি ১৮২৩ সালে তিনি প্রস্তাবিত সরকারি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। ১৮২২ সালে তিনি কলকাতায় 'এ্যাংলো-হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ইংরেজি ভাষা, আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। ১৮২৫ সালে তিনি বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, দর্শন ও বেদান্ত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যই এ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

### ১.৫ রাজনৈতিক চিন্তাধারা

রামমোহন ব্রিটিশ রাজের অনুগত সমর্থক ছিলেন। তবে তিনি সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে কুণ্ঠিত হননি। ১৮২৩ সালে ভারতীয় প্রেসের উপর সরকারি বিধি-নিষেধ আরোপের বিরোধিতা করেন এবং তিনি ও তাঁর কতিপয় বন্ধু মিলে প্রিভি কাউন্সিলে স্মারকলিপি পাঠিয়ে বলিষ্ঠভাবে এর প্রতিবাদ করেন। ১৮২৬ সালে ভারতীয় জুরি আইনের বৈষম্যমূলক কিছু ধারার বিরুদ্ধে এবং বাংলা-বিহার উড়িষ্যার জমিদারদের স্বার্থ বিরোধী রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানান। রামমোহনের উদ্যোগে সরকারি নীতির বিরুদ্ধে জনগণের এসব প্রতিবাদের মধ্যেই জাতীয় চেতনাবোধের প্রাথমিক প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয়।

### ১.৬ রামমোহনের সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব

রামমোহন রায় তাঁর সংস্কারমূলক ও উদারবাদী ধ্যান-ধারণাসমূহ প্রচারের জন্য বাংলায় সংবাদ কৌমুদী ও ফারসি ভাষায়, 'মিরাত-উল-আখবার' নামে দুটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তার সংস্কার আন্দোলনের ফলে প্রধানত শহর কেন্দ্রিক শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে তাদের বেরিয়ে আসার পথ তৈরি হয়। বাংলার হিন্দু সমাজে নবজাগরণের জোয়ার আসে।

## ১.৭ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.)

### পরিচিতি ও কর্মজীবন

বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উনিশ শতকের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ও সমাজকর্মী বলে খ্যাত ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীর সিংহ গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে। গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি কলকাতায় যান এবং ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত সেখানকার সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। কাব্য, অলঙ্কার শাস্ত্র, বেদান্ত, স্মৃতি, জ্যোতিষ ও যুক্তিবিদ্যায় তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৩৯ সালে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু হয়। ১৮৫০ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং পরের বছর একই কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৮৫৫ সালে সরকার তাঁকে হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়ার বিশেষ স্কুল পরিদর্শকের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করে। ১৮৮০ সালে তিনি CIE উপাধি লাভ করেন। ১৮৯১ সালের ২৫ জুলাই তিনি পরলোকগমণ করেন।

### ১.৮ শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা

বাংলায় শিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এক্ষেত্রে বিশেষ বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসেবে তিনি তার ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেন। যদিও তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের পণ্ডিত ছিলেন তথাপি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শিক্ষা চালু করেন। তিনি বাংলার মাধ্যমে সংস্কৃতকে আরও সহজ করার উপায় বের করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজকে সকল বর্ণ ও শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সরকারি ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সহায়তায় বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর নিজ উদ্যোগ ও অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তাঁর মহৎ কীর্তি কলকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা। ১৮৬৪ সালে তিনি নিজ অর্থ ব্যয় এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

### ১.৯ সামাজিক সংস্কার প্রয়াস

বিদ্যাসাগর ছিলেন মূলত একজন সমাজ সংস্কারক। উদার ও সংস্কারমনা বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজে প্রচলিত, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ, সতীদাহ প্রথা সহ সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহতকারী অন্যান্য অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন পরিচালনা করেন। তাঁর আন্দোলনের স্বপক্ষে তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র ও প্রাচীন গ্রন্থ থেকে অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে এর যৌক্তিকতা প্রমাণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইনসম্মত করণে ১৮৫৬ সালে একটি আইন পাস করা হয়। ১৮৭২ সালে বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ রহিতকরণে 'সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট' প্রণয়নেও তাঁর প্রভূত অবদান রয়েছে।

**সার-সংক্ষেপ**

উনবিংশ শতাব্দীতে অধঃপতিত বাঙালির সমাজ জীবনে নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ। তিনি কুসংস্কারের বেড়াজাল হতে বাংলার মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক জীবনকে মুক্ত করেন। তার প্রচেষ্টায় বাংলায় নবজাগরণের সূচনা হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি। তিনি ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও জনহিতৈষী। বাংলার শিক্ষা ও সামাজিক নবজাগরণের ক্ষেত্রে তার অসামান্য অবদান রয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.১

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা—
   ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
   গ. রাজ রামমোহন রায়  ঘ. হেমচন্দ্র রায়

২. মিরাত-উল-আখবার একটি—
   ক. ধর্মগ্রন্থ  খ. ফারসি ভাষার সংবাদপত্র
   গ. দর্শন গ্রন্থ  ঘ. উপন্যাস

৩. ঈশ্বরচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করে—
   ক. ব্রিটিশ সরকার  খ. কলকাতা সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষ
   গ. মোগল সম্রাট  ঘ. সাধারণ মানুষ

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় কলকাতায় ____ নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিদ্যাসাগরের মহৎ কীর্তি কলকাতা ____ প্রতিষ্ঠা।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. ব্রিটিশ সরকার রামমোহন রায়কে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।
২. বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন আইনসম্মত করা হয়।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. কে রামমোহন রায়কে 'রাজা' উপাধি দেন?
২. 'তুহফাতুল মুয়াহিদিন গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান আলোচনা করুন।
২. শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

## পাঠ-২ : মুসলিম নবজাগরণ ও নওয়াব আবদুল লতিফ

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ নওয়াব আবদুল লতিফের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণে নওয়াব আবদুল লতিফের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

## ২.১ নওয়াব আবদুর লতিফের অভ্যুত্থান

ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য এক চরম হতাশার কাল। এ সময় মুসলমানগণ একদিকে যেমন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর উপেক্ষা ও বৈরী আচরণের শিকার হয়, তেমনি তাঁরাও ইংরেজদের প্রতি অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। তদুপরি মুসলমানগণ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে উদাসীন থাকার ফলে তারা একদিকে যেমন চাকরিসহ সকল সরকারি সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হতে থাকে, অন্যদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে পড়ে। এরূপ অধঃপতিত অবস্থা ও দুর্দিনে যে সব মনীষীর আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ আসে নওয়াব আবদুল লতিফ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন মুসলমানদের জাগরণের অন্যতম স্থপতি।

## ২.২ পরিচয়, শিক্ষা ও কর্ম জীবন

নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকীর মাহমদু। তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। কর্ম জীবনের শুরুতে তিনি কিছুদিন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৮৪৮ সালে তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় এ্যাংলো-এ্যারাবিক বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৪৯ সালে 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট' পদে যোগ দেন এবং ১৮৭৭ সালে 'প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট' হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৮৮৪ সালে বিশেষ পেনশন সুবিধাসহ সরকারি চাকরি হতে অবসর নেন। স্ব-ধর্মীয়দের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ, সরকারি প্রশাসনিক কাজে তাঁর নিষ্ঠা ও দক্ষতা এবং জনহিতকর কার্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৬২ সালে তাঁকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত করা হয়। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম এ গৌরবের অধিকারী। ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য এবং মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সরকার ১৮৭৭ সালে তাঁকে 'খান বাহাদুর', ১৮৮০ সালে 'নওয়াব', ১৮৮৩ সালে সি.আই.ই. এবং ১৮৮৭ সালে উচ্চতর সম্মানের প্রতীক 'নওয়াব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করে।

ছবি

## ২.৩ নীলকরদের হাত থেকে কৃষকদের মুক্তি

বাংলার কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়ন নওয়াব আবদুল লতিফের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সাতক্ষীরায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে সেখানকার দরিদ্র চাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচার তাকে মর্মাহত করে। তিনি এ বিষয়টি সরকারকে অবহিত করেন এবং সরকারের কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেন। ১৮৬০ সালে সরকার কর্তৃক 'নীল কমিশন গঠনের পেছনে তাঁর ভূমিকা ছিল। এ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নীল চাষে কৃষকদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ফলে বাংলার কৃষকরা নীলকরদের অত্যাচারের হাত হতে রেহাই পায়।

## ২.৪ মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ আনুগত্য সৃষ্টি

নওয়াব আবদুল লতিফ নিজে ইংরেজ অনুগত ছিলেন এবং নিজেদের স্বার্থে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ আনুগত্য সৃষ্টি প্রয়োজন বলে মনে করতেন। উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের জেহাদ আন্দোলন এবং ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইত্যাদি কারণে ইংরেজরা মুসলমানদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস করত। তারা মুসলমানদের সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখে। নওয়াব আবদুল লতিফ উপলব্ধি করেছিলেন যে, এ অবস্থা চলতে থাকলে মুসলমানদের ধ্বংস অনিবার্য। এ অবস্থায়

মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ আনুগত্য সৃষ্টি করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি জৌনপুরের মাওলানা কেরামত আলীর মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ ভারত 'দারুল হরব' নয়। সুতরাং মুসলমানদের উচিত ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব পরিহার করে তাদের সাথে সহযোগিতা করা। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব হ্রাস পায়। উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।

### ২.৫ ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে আবদুল লতিফের ভূমিকা

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিশেষ করে আধুনিক পাশ্চাত্য তথা ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে নওয়াব আবদুল লতিফের অবদান অসামান্য। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন যে, বাংলার মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কেননা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে মুসলমানদের অনীহা ও উদাসীনতা সর্বক্ষেত্রে তাদের পশ্চাদপদতার মূল কারণ। এমতাবস্থায় মুসলমানদের মন থেকে এ আত্মঘাতী কুসংস্কার দূর করার জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করেন। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে জনমত সৃষ্টির লক্ষে নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৫৩ সালে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। 'মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুফল' শিরোনামের এ রচনা প্রতিযোগিতায় মুসলমানদের মধ্যে দারুন সাড়া জাগায়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হতে রচনা পাঠানো হয়। আবদুল লতিফ শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য পুরস্কার প্রদান করেন।

নওয়াব আবদুল লতফি কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। তাঁর প্রচেষ্টায় মাদ্রাসায় ইংরেজি-ফারসি বিভাগ খোলা হয় এবং উর্দু ও বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। নওয়াব আবদুল লতিফের দাবি ও চেষ্টায় হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। ফলে এখানে মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়।

### ২.৬ মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা

নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' বা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে জনমত তৈরি এবং তাদেরকে পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করাই ছিল এ সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও তাদের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করার ক্ষেত্রে এ সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। তবে এর মাধ্যমে মুসলমানদের ন্যায়সংগত দাবি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরে তা পূরণের চেষ্টা করা হতো।

### ২.৭ মুহসীন ফান্ডের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

শিক্ষা ব্রতী দানবীর হুগলীর হাজী মোঃ মুহসীন জনকল্যাণ এবং বিশেষ করে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাঁর সকল সম্পদ ওয়াকফ করে দেন। মুহসীনের দানকৃত অর্থে 'মুহসীন ফান্ড' গঠন করে এর দ্বারা হুগলীতে কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বেতন থাকায় দরিদ্র মুসলমান ছাত্ররা এখানে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। নওয়াব আবদুল লতিফের আন্তরিক চেষ্টার ফলে সরকার ১৮৭৩ সালে হুগলী কলেজকে সরকারি কলেজে পরিণত করে মুহসীন ফান্ডের টাকায় মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। নওয়াব আবদুল লতিফ আধুনিক শিক্ষার অনুরাগী হলেও মুসলমানদের সনাতন ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নি। এজন্যই মুহসীন ফান্ডের টাকায় কলকাতা মাদ্রাসার উন্নয়ন এবং ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। এভাবে তিনি দাতার উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নে ভূমিকা রাখেন।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণে নওয়াব আবদুল লতিফের অবদান অনন্য সাধারণ। তিনি ব্যক্তিগত চেষ্টা ও সমিতির মাধ্যমে উনিশ শতকে মুসলমানদের ঘোর সংকটকালে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে তাদের সঠিক পথের সন্ধান দেন। ফলে মুসলিম সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে। ১৮৯৩ সালের ১০ জুলাই নওয়াব আবদুল লতিফ মৃত্যুবরণ করেন।

**সার-সংক্ষেপ**

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের মুসলিম সমাজ ছিল দুর্দশাগ্রস্ত। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল পশ্চাদপদ। এরূপ শোচনীয় পরিস্থিতিতে দুর্দশা-কবলিত মুসলিম সমাজকে সহযোগিতা করতে যে সব মনীষী এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে নওয়াব আবদুল লতিফ ছিলেন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও তার প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ এবং ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করার নীতিতে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক নবচেতনা ও জাগরণের।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. নওয়াব আবদুল লতিফের জন্ম—
   ক. ঢাকায় খ. বরিশালে
   গ. ফরিদপুরে ঘ. ময়মনসিংহে

২. মুসলমানদের মধ্যে প্রথম আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন—
   ক. নওয়াব আবদুল লতিফ খ. সৈয়দ আমীর আলী
   গ. হাজী শরিয়ত উল্লাহ ঘ. সৈয়দ আহমাদ খান

৩. মোহামডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা হয়—
   ক. ১৮৫৪ সালে খ. ১৮৫৮ সালে
   গ. ১৮৬২ সালে ঘ. ১৮৬৩ সালে

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৪৯ সালে _____ পদে যোগ দেন।
২. নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৬২ সালে _____ পরিষদের সদস্য মনোনীত হন।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. নওয়াব আবদুল লতিফ মুসলমানদের সনাতন ধর্মীয় শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন।
২. নওয়াব আবদুল লতিফ ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠাতা কে?
২. হিন্দু কলেজের পরিবর্তিত নাম কি?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন**

১. নওয়াব আবদুল লতিফের শিক্ষা ও কর্মজীবনের পরিচয় দিন।
২. মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে আবদুল লতীফের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

## পাঠ-৩ : মুসলিম নবজাগরণ ও সৈয়দ আমীর আলী

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ সৈয়দ আমীর আলীর পরিচিতি ও কর্মজীবন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ মুসলিম নবজাগরণে সৈয়দ আমীর আলীর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন একজন প্রখ্যাত আইনজীবী এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক খ্যাতিমান লেখক। ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণের তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত।

### ৩.১ পরিচিতি ও কর্মজীবন

সৈয়দ আমীর আলী ১৮৪৯ সালে হুগলীর এক সম্ভ্রান্ত শিয়া মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ সাদাত আলী। বাল্যকাল থেকে আমীর আলী অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। ১৮৬৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ এবং ১৮৬৮ সালে বি.এল.ডিগ্রি লাভ করেন। ইংল্যান্ডের ইনার-টেম্পল হতে ব্যারিস্টারি পাস করেন। ১৮৭৩ সালে দেশে ফিরে এসে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। কর্মজীবনে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইনের অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে টেগোর অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৯০ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭৮-৮৩ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য এবং ১৮৮৩-৮৫ সাল পর্যন্ত গভর্নরের আইন সভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯২৮ সালে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

ছবি

### ৩.২ রাজনৈতিক চিন্তাধারা

সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন একজন দূরদর্শী চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক । বঙ্গ-ভারতের মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার পটভূমিতে তাদের জাগরণের জন্য নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আহমদ খানের মতো তিনিও মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ও ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে একই সাথে তিনি মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রয়োজনীয়তাও বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত না হলে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে। তবে তিনি আন্দোলন বা বিপ্লবের পথে রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বাসী ছিলেন না। এ ব্যাপারে তিনি নিয়মতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক পন্থায় দাবি আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন।

### ৩.৩ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠন

১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলকাতায় ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৮৮৩ সালে কেন্দ্রীয় সংগঠনের নামকরণ করা হয় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'। এটি ছিল ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। আমীর আলী ২৫ বছর এ সংগঠনের কর্মসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এ সংগঠনের প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল–

১. মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার ও তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা।
২. মুসলমানদের নৈতিক উন্নতি সাধন।
৩. মুসলমানদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের নিকট পেশ করা এবং
৪. ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মৈত্রী ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

### ৩.৪ এসোসিয়েশনের কার্যাবলি

শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য সৈয়দ আমীর আলী তাঁর এসোসিয়েশনের মাধ্যমে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। ১৮৮১ সালে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মহসীন ফান্ডের টাকায় কলকাতায় একটি কলেজ ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের দাবি করা হয়। ১৮৮২ সালে শিক্ষা সংস্কারের জন্য হান্টার কমিশন গঠিত হয়। আমীর আলী কমিশনের নিকট মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ছাত্র বেতন হ্রাস, মুসলিম এলাকায় মুসলিম শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগ এবং আরবি-ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থার প্রস্তাব দেন। তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় উচ্চমানের ইংরেজি শিক্ষার দাবি জানান। ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের কাছে প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে আমীর আলী মুসলমানদের চাকরির বিশেষ ব্যবস্থা, বিচার বিভাগে মুসলমানদের নিয়োগ এবং বিহারের আদালতে উর্দু ভাষা প্রচলনের দাবি জানান।

### ৩.৫ ১৮৮৫ সালের প্রস্তাব

সৈয়দ আমীর আলী ও তাঁর এসোসিয়েশনের দাবি এবং হান্টার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বড়লাট ডাফরিন ১৮৮৫ সালে একটি প্রস্তাব পাস করেন। এতে মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দান, উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি এবং মুসলমান শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের দাবি যথাসম্ভব প্রতিকারের কথা বলা হয়। এজন্য আমীর আলী এ প্রস্তাবকে 'মহাসনদ' বলে অভিহিত করেন। এ প্রস্তাবের ফলশ্রুতি কলকাতা মাদ্রাসায় কলেজ মানের ইংরেজি চালু এবং কারিগরি ও মেডিক্যাল শিক্ষায় মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। আমীর আলীর চেষ্টায় মুসলমানদের জন্য করাচিতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

### ৩.৬ মুসলিম রেঁনেসার অগ্রদূত

সৈয়দ আমীর ছিলেন মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রদূত। ইসলামী ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের অধিকারী আমীর আলী ছিলেন একজন সুলেখক। তিনি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে- (১) দি স্পিরিট অব ইসলাম এবং (২) এ সর্ট হিস্টরি অব দি স্যারাসিন। এ গ্রন্থ দুটি পণ্ডিত হিসেবে আমীর আলীকে অমরত্ব দান করেছে। আমীর আলী তাঁর লেখায় ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দান করেছেন। মুসলমানদের গৌরবময় অতীতের প্রতি বারংবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে মুসলিম সমাজকে আত্মসচেতন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ চেষ্টায় হতাশাগ্রস্ত মুসলিম সমাজে প্রাণের সঞ্চার ঘটে।

### ৩.৭ লন্ডন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

১৯০৬ সালে ভারতের মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমীর আলী ১৯০৮ সালে লন্ডনে মুসলিম লীগের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৯ সালে 'মর্লি-মিন্টোর সংস্কারের' প্রক্কালে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতের মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথার দারি জানান। ভারত সচিব মর্লির সাথে সাক্ষাত করে তিনি তাঁর দাবির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। ১৯০৯ সালে সংস্কার আইনে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তা প্রথমবারের মতো স্বীকৃতি লাভ করে।

দুর্দশাগ্রস্ত বাংলার মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণে যেসব মনীষী অসামান্য অবদান রাখেন সৈয়দ আমীর আলী তাদের মধ্যে অন্যতম। পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি তিনি মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণেরও পক্ষপাতি ছিলেন। এজন্য তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। তিনি সর্বোতভাবে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেন। তবে তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৩

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. সৈয়দ আমীর আলীর জন্ম—
   ক. ১৮৪৯ সালে হুগলীতে
   খ. ১৮৪৯ সালে বিহারে
   গ. ১৮৪৯ সালে কতকাতায়
   ঘ. ১৮৫০ সালে হুগলীতে

২. মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন—
   ক. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি
   খ. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন
   গ. মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স
   ঘ. মুসলিম লীগ

৩. লন্ডন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়—
   ক. ১৯০৬ সালে
   খ. ১৯০৭ সালে
   গ. ১৯০৮ সালে
   ঘ. ১৯০৯ সালে

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. সৈয়দ আমীর আলী ____ ইনার টেম্পল হতে ____ পাস করেন।
২. আমীর আলী ____ সালে ____ মৃত্যুবরণ করেন।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের রাজনীতির সাথে যুক্ত হওয়ার বিরোধী ছিলেন।
২. সৈয়দ আমীর আলী তাঁর রচনায় ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি?
২. দি স্পীরিট অব ইসলাম গ্রন্থের লেখক কে?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. সৈয়দ আমীর আলীর কর্মজীবনের বিবরণ দিন।
২. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের পরিচয় ও এর উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।
৩. শিক্ষাক্ষেত্রে সৈয়দ আমীর আলীর অবদান আলোচনা করুন।

## পাঠ-৪ : স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি ¾**

- ☞ স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কর্মজীবনের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ ভারতের মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য তাঁর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ আলীগড় আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

### ৪.১ সৈয়দ আহমদ খানের পরিচয় ও কর্মজীবন

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ শাসকদের বৈরী আচরণে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। তারা চরম হতাশা ও দুর্দশার আবর্তে নিপতিত হয়। মুসলমানদের সেই দুর্যোগ মুহূর্তে তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে সৈয়দ আহমদ খানের আর্বিভাব। সৈয়দ আহমদ খানের জন্ম ১৮১৭ সালে দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারে। শিক্ষা জীবন শেষে ১৮৩৭ সালে কোম্পানির একজন সেরেস্তাদার হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয় এবং পরে তিনি সাব জজ পদে উন্নীত হন। তিনি 'ইম্পারিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল' 'হান্টার কমিশন' এবং 'ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের' সদস্য ছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি তাঁর কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার কর্তৃক 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ছবি

### ৪.২ মুসলমানদের প্রতি সরকারের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা

শুরু থেকেই ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের বিদ্বেষমূলক মনোভাব ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর তা আরো বৃদ্ধি পায়। সিপাহী বিদ্রোহের জন্য ইংরেজ সরকার মুসলমানদের এককভাবে দায়ী করে তাদের বিরুদ্ধে নানা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করে। ভারতীয় মুসলমানদের দুর্দশা সৈয়দ আহমদ খানকে ব্যথিত করে। এমতাবস্থায় সৈয়দ আহমদ খান ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকারের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি 'ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের কারণ' এবং 'ভারতের রাজভক্ত মুসলমান' নামক দুটি বই রচনা করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের জন্য মুসলমানরা দায়ী ছিল না। বরং বিদ্রোহকালে অধিকাংশ মুসলমান ইংরেজদের পক্ষে ছিল। তাঁর যৌক্তিক আলোচনায় মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। উল্লেখ্য যে, সৈয়দ আহমদ খান নিজে ইংরেজ অনুগত ছিলেন। তিনি ভারতের মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য তাদেরকেও ইংরেজ অনুগত হওয়ার এবং তাদের সহযোগিতা করার উপদেশ দেন।

### ৪.৩ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার

সৈয়দ আহমদ খান উপলব্ধি করেছিলেন যে, ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ছাড়াও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনীহা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি ভারতীয় মুসলমানদের দুদর্শা ও শোচনীয় অবস্থার অন্যতম কারণ। এমতাবস্থায় তিনি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রসারে উদ্যোগী হন। ১৮৬৪ সালে তিনি গাজীপুরে একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানরা যেন সহজেই পাঠ করতে পারে এজন্য তিনি ইংরেজিতে রচিত বহু মূল্যবান বই উর্দুতে অনুবাদ ও বিতরণের

ব্যবস্থা করেন। এজন্য তিনি একটি বিজ্ঞান সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সৈয়দ আহমদ খান ইংল্যান্ডে যান এবং ১৮৭০ সালে দেশে ফিরে এসে 'তাহযিবুল আখলাক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের নৈতিকতা ও আচার-ব্যবহারের উন্নতি এবং তাদের মধ্যকার সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করেন। সৈয়দ আহমদ খান 'ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' নামে অন্য একটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠা করেন।

### ৪.৪ আলীগড় আন্দোলন

১৮৭৫ সালে সৈয়দ আহমদ খান আলীগড়ে 'মোহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭ সালে এটি কলেজে উন্নীত হয়। এ কলেজ প্রতিষ্ঠার পর আলীগড় ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সৈয়দ আহমদ খান এ আলীগড় কলেজকে কেন্দ্র করে অধঃপতিত অবস্থা থেকে মুসলমানদের পুনরুদ্ধার ও তাদের পুনর্জাগরণের জন্য একটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। ইতিহাসে এটিই 'আলীগড় আন্দোলন' নামে প্রসিদ্ধ। এ আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনা জাগ্রত করে। পরবর্তীকালে আলীগড় কলেজ ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল।

### ৪.৫ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

সৈয়দ আহমদ খান নিষ্ঠাবান ধার্মিক ছিলেন। তিনি মনে করতেন ধর্ম মানব সমাজের অগ্রগতীতে সাহায্য করে। তিনি সকল প্রকার গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি যুক্তিবাদী চিন্তা ও আধুনিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। এজন্য তিনি কোরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন।

### ৪.৬ রাজনৈতিক চিন্তাধারা

সৈয়দ আহমদ খান প্রথমে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু কতিপয় ঘটনার প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি মুসলমানদের এতে যোগদানে নিষেধ করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্রেট্রিয়াটিক এসোসিয়েশন' নামে একটি কংগ্রেস বিরোধী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এসময় ভারতে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের বিস্তার এবং বিভিন্ন সহিংসতার ঘটনায় ভারতীয় মুসলমানদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তিনি আলীগড়ে 'মোহামেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করেন।

**সার-সংক্ষেপ**

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় মুসলমানদের চরম সংকট কালে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আর্বিভাব। তিনি ছিলেন চরম হতাশা ও দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম ত্রাণকর্তা, পুনর্জাগরণের দিশারী। তিনি পশ্চাদপদ ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়কে নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে আলোর পথের সন্ধান দেন, তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করেন। তার আলীগড় আন্দোলন মুসলিম সমাজে আত্মবিশ্বাস ও নবচেতনার জন্ম দেয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৪

### ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. সৈয়দ আহমদ খানের জন্ম—
   ক. কলকাতায়
   খ. বোম্বে
   গ. দিল্লিতে
   ঘ. বেনারসে

২. 'ভারতের রাজভক্ত মুসলমান' বইটির লেখক—
   ক. সৈয়দ আমীর আলী
   খ. উইলিয়াম হান্টার
   গ. স্যার আবদুর রহিম
   ঘ. স্যার সৈয়দ আহমদ খান

৩. 'তাহযীবুল আখলাক' হচ্ছে—
   ক. দর্শন গ্রন্থ
   খ. সংবাদপত্র
   গ. ধর্মীয় গ্রন্থ
   ঘ. সাহিত্য গ্রন্থ

### খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. ১৮৩৭ সালে কোম্পানির _____ হিসেবে সৈয়দ আহমদ খানের কর্মজীবন শুরু হয়।
২. সৈয়দ আহমদ খান ____ 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন।

### গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. সৈয়দ আহমদ খান নিজে ছিলেন ইংরেজ বিরোধী এবং মুসলমানদেরও ইংরেজ বিরোধীতার জন্য উপদেশ দেন।
২. ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান পেট্রিয়াটিক এসোসিয়েশন ছিল একটি কংগ্রেস বিরোধী সমিতি।

### ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৮৮ সালে ব্রিটিশ সরকার সৈয়দ আহমদ খানকে কি উপাধি দিয়েছিল?
২. আলীগড় আন্দোলনের প্রবক্তার নাম কি?

### ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আলীগড় আন্দোলনের পরিচয় দিন।
২. মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে সৈয়দ আহমদ খানের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১১

**বিশদ উত্তর প্রশ্ন**

১. রাজা রামমোহন রায় কে ছিলেন? বাংলার নবজাগরণে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করুন।

২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিচয় দিন। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে তাঁর ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

৩. বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নওয়াব আবদুল লতিফের বিভিন্ন পদক্ষেপ আলোচনা করুন।

৪. বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক অগ্রগতি ও শিক্ষার উন্নতির জন্য আমীর আলীর অবদান আলোচনা করুন।

৫. আলীগড় আন্দোলনের পরিচয় দিন। ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতির জন্য সৈয়দ আহমদ খানের অবদান মূল্যায়ন করুন।

ইউনিট ১২

# বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯০৫-১৯১১)

## ভূমিকা

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি নানা কারণে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের মধ্যে এ চেতনা সুষ্ঠুরূপ ধারণ করে। কংগ্রেস ছিল একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের জন্য এ দলের দ্বার উন্মুক্ত থাকলেও মুসলমানগণ প্রথম থেকেই কংগ্রেসের সাথে সংশ্রব এড়িয়ে চলে। এর কারণ প্রথমত, এ সময় ভারতে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের উন্মেষ এবং বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী দয়ানন্দ, বলগংগাধর তিলক প্রমুখের হিন্দু বিদ্বেষী প্রচারণা ও কর্মকাণ্ডে মুসলমানরা ক্ষুব্ধ এবং শংকিত ছিল। দ্বিতীয়ত, জাতীয় কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখার মুসলিম নেতৃবৃন্দের নীতি। এসময় স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। মুসলিম নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থায় তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখা এবং চাকরি ও শিক্ষার অধিকারসহ সর্বত্র আলাদাভাবে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টার ফলে তাদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র চেতনা ও বোধের জন্ম হয়। লর্ড কার্জন কর্তৃক ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করা হয়। বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ব বঙ্গ ও আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও বর্ণ হিন্দুদের আন্দোলন এবং ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ মুসলমানদের স্বাতন্ত্র চেতনাবোধকে আরো শাণিত করে। এই স্বাতন্ত্রবোধের ফসল ১৯০৬ সালের মুসলিম লীগ গঠন এবং মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের জোর দাবি।

আলোচ্য ইউনিটে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা এবং ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ ইত্যাদি বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে।

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

- ➔ পাঠ ১ : বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)
- ➔ পাঠ ২ : মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (১৯০৬)
- ➔ পাঠ ৩ : বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ

## পাঠ-১ : বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- ☞ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পটভূমি ও কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ বঙ্গভঙ্গের ফলে এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভারতের ইতিহাসের গতিধারাকে প্রভাবিত করেছিল।

### ১.১ বঙ্গভঙ্গের পটভূমি বা কারণ

**প্রশাসনিক কারণ**

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের পশ্চাতে প্রশাসনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গভঙ্গকে একটি প্রশাসনিক কার্য সাধনের উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ১৯০৩ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর মোট আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। একজন গভর্নরের পক্ষে এ বিশাল আয়তনের প্রদেশ সুষ্ঠুভাবে শাসন করা সম্ভব ছিল না। উল্লেখ্য বাংলার এ বিশাল আয়তনের জন্য প্রশাসনিক অসুবিধা বিবেচনা করে একে বিভক্ত করার সরকারি প্রচেষ্টা ১৮৫৪ সালে থেকে শুরু হয়। ১৮৭৪ সালে বাংলা থেকে আসাম, সিলেট ও কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ইউনিট গঠন করা হয়। একজন চীফ কমিশনারের অধীনে এ ইউনিটের শাসনভার ন্যস্ত করা হয়। ১৮৯৬ ও ১৮৯৮ সালে পুনরায় বাংলা প্রদেশে সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করা হলেও তখন তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হয়ে প্রশাসনিক প্রয়োজনে পুনরায় বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

**সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ**

নতুন প্রদেশ গঠনের পশ্চাতে শক্তিশালী প্রশাসনিক যুক্তি ছাড়াও সরকারের পক্ষ থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কথা বলা হয়। বস্তুত ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কাজ ছিল মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। ব্রিটিশ শাসনের গোড়া থেকেই পূর্ব বাংলা ও আসাম অঞ্চল প্রশাসনিক অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়েছিল। এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। বরং অবস্থা ক্রমাগত অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে এ অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও মারাত্মক অবনতি হয়েছিল। এমতাবস্থায় লর্ড কার্জন প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও পূর্ববঙ্গ ও আসামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বঙ্গভঙ্গ প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন।

**রাজনৈতিক কারণ**

অনেকের মতে বঙ্গ বিভাগ লর্ড কার্জনের সুপরিকল্পিত ভেদ নীতির বহিঃপ্রকাশ। এর পিছনে কার্জনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন বাঙালি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীরাই ভারতে জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্মদাতা। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে বাঙালি নেতৃত্বের প্রাধান্যের বিষয়টিও লক্ষ্য করেন। এমতাবস্থায় বাঙালির নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক প্রভাবকে খর্ব করার জন্য ভেদ নীতি হিসেবে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কেননা তিনি মনে করেছিলেন এতে একদিকে মুসলমানরা খুশি হবেন এবং সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে এ বিভাগ বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। এতে তাদের একতা নস্যাৎ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল হয়ে যাবে।

### ১.২ বঙ্গভঙ্গ কার্যকর

১৯০৩ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা প্রবল গণ অসন্তোষের সৃষ্টি করে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল বাঙালি এ পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। বিভিন্ন মহল থেকে এর বিরুদ্ধে সরকারের কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। এমতাবস্থায় ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড কার্জন পূর্ব বঙ্গ সফরে আসেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণে তিনি নতুন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বেশি সুযোগ-সুবিধা লাভের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। ফলে পূর্ব বঙ্গের

মুসলমানদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। নবাব সলিমুল্লাহসহ মুসলিম নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জানান। এমতাবস্থায় কার্জন ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাটি অনুমোদনের জন্য ভারত সচিবের কাছে পাঠান। ১৯ জুলাই পরিকল্পনাটি সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়।

### ১.৩ বঙ্গভঙ্গ ও নতুন প্রদেশ সৃষ্টি

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে দুটি প্রদেশ করা হয়। পূর্ব বঙ্গের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের সাথে জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদাহ ও আসামকে যুক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। নতুন প্রদেশের আয়তন দাঁড়ায় ১০৬,৫৪০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ। এর মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ছিল মুসলমান। নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকা এবং অনুসঙ্গী সদর দপ্তর চট্টগ্রামে। অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে আরেকটি প্রদেশ হয়। এর নামকরণ করা হয় বাংলা প্রদেশ। বাংলা প্রদেশের রাজধানী করা হয় কলকাতা।

### ১.৪ মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রতি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। শুরুতে মুসলমান সম্প্রদায় বিভক্তির বিরোধীতা করলেও পরবর্তীতে নবাব সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে তারা বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলো নতুন প্রদেশ গঠনে সন্তোষ প্রকাশ করে। শিক্ষা-দীক্ষা সহ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নানা রকম সুযোগ-সুবিধার আশায় পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে। এমনকি কলকাতার কিছু সংখ্যক মুসলমানও এ প্রদেশ সৃষ্টিকে স্বাগত জানায়। অবশ্য একদল শিক্ষিত উদারপন্থী মুসলমান এর বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন জানায়।

### ১.৫ হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া

বঙ্গভঙ্গ বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। পেশাগত ও শ্রেণী স্বার্থে হিন্দু জমিদার, পুঁজিপতি শ্রেণী, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগ দেয়। অবশ্য নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা এ আন্দোলনে শরিক হয়নি। তথাপি এ আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়। এক পর্যায়ে এর সাথে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ যুক্ত হলে সরকার নতি স্বীকার করে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

**সার-সংক্ষেপ**

বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে বঙ্গভঙ্গ ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রধানত প্রশাসনিক প্রয়োজন এবং সেই সাথে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বিশাল আয়তনের বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। নতুন প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তারা কার্জনের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। অন্যদিকে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধিতা করে। কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে একটি তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.১

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করেন—

ক. লর্ড ডালহৌসি
খ. লর্ড হার্ডিঞ্জ
গ. লর্ড মিন্টো
ঘ. লর্ড কার্জন

২. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ছিল—

ক. চট্টগ্রাম
খ. ঢাকা
গ. রাজশাহী
ঘ. ত্রিপুরা

৩. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়—

ক. মুসলিম লীগ
খ. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
গ. মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি
ঘ. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মেহামেডান এসোসিয়েশন

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে _____ পূর্ববঙ্গ সফরে আসেন।
২. ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত _____ বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ছিল কলকাতা।
২. নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়নি।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. কবে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়?
২. বাংলা প্রদেশের রাজধানী কোথায় ছিল?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করুন।
২. বঙ্গভঙ্গের প্রতি মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন ।

## পাঠ-২ : মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা (১৯০৬)

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি ¾**

- ☞ ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

### ২.১ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি

মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯০৬ সালে এ সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেননা এটি ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা ভারতীয় মুসলমানদের একটি হতদরিদ্র ও পশ্চাদপদ জাতিতে পরিণত করে। অন্যদিকে ইংরেজদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করে হিন্দুরা একটি শক্তিশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করে। দলটি সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের কথা বললেও এটি ছিল হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণকারী একটি প্রতিষ্ঠান। এজন্য সৈয়দ আহমদ খান, নওয়াব আবদুল লতিফ প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দিতে নিষেধ করেন। তারা মুসলমানদের রাজনীতি পরিহার করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ ও ইংরেজ আনুগত্যের মাধ্যমে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাদের প্রভাবে শিক্ষিত মুসলমানরা প্রথম দিকে রাজনীতি বিমুখ থাকলেও পরে কতিপয় ঘটনার প্রেক্ষিতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে মনযোগ দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবন, সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের তৎপরতা, গো-জবাই নিবারণ সমিতি ও হিন্দু মেলা গঠন, শিবাজী উৎসব উদ্‌যাপন ইত্যাদি ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত চেতনাকে আহত করে। ফলে তাদের মধ্যেও স্বতন্ত্র চেতনার উন্মেষ ঘটে। এসময় যুক্ত প্রদেশে সরকারি কাজে উর্দুর পরিবর্তে হিন্দির প্রচলনের সিদ্ধান্ত মুসলমানদেরকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলে ১৯০১ সালের মধ্যেই মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষাকল্পে নিজেদের একটি জাতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯০৩ সালে উত্তর প্রদেশের হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে মুসলমানদের স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার হয়।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে নতুন প্রদেশ গঠন করা হলে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের মুসলমানরা একে স্বাগত জানায়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় কংগ্রেস সরকারের এ উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে। হিন্দুদের বিশেষ করে কংগ্রেসের এ ভূমিকা ভারতীয় মুসলমানদের দারুণভাবে মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ করে। তারা বুঝতে পারে যে, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন ব্যতীত তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ অসম্ভব। এসময় ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কথা ব্যক্ত করে। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ৩৫ সদস্যের একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল সিমলায় বড়লাট মিন্টোর সাথে দেখা করে তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন। ইতিহাসে এটি 'সিমলা ডেপুটেশন' নামে খ্যাত। বড় লাট মুসলমানদের দাবিগুলো সম্পর্কে সদয় বিবেচনার আশ্বাস দেন। এ ঘটনা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে নবউদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার করে। তারা ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌র প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলমানদের একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যাপারে একমত হন।

### ২.২ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের' বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকার শাহবাগে ভারতের মুসলিম প্রতিনিধিগণ একত্রিত হন। সম্মেলন শেষে ৩০ ডিসেম্বর নওয়াব সলিমুল্লাহ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেসী' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটির উপর বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনার পর 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। নবগঠিত দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক নির্বাচিত হন নবাব মহসীন উল মুলক ও নবাব ভিখারুল মুলক। মুসলিম লীগের একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য ৬০ সদস্যের একটি কার্য-নির্বাহী সংসদ গঠন করা হয়। ১৯০৮ সালে এর গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা হয়। লক্ষ্মৌতে এর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রাথমিকভাবে মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ :

### ২.৩ মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যবোধ গড়ে তোলা এবং সরকারের কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের মনে ভুল ধারণা জন্মালে তা দূর করা।

খ. ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ-সংরক্ষণ করা এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সরকারের কাছে তুলে ধরা।

গ. উপরোক্ত লক্ষের ক্ষতি না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সদ্ভাব রক্ষা করা।

### ২.৪ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ছিল একটি মোড় পরিবর্তকারী ঘটনা। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মুক্ত করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে এক চরম ক্রান্তিকালে ভারতীয় মুসলমানগণ ব্রিটিশদের সাথে আপোষকামীতার পথ ধরে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে লীগ গতিশীল ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। এমন কি এতে মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায় তথা নাইট, নবাব, জোতদার, জমিদারদের প্রাধান্য থাকায় এটি গণসংগঠন হতে পারেনি। তবে কয়েক বছরের মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রগতিশীল তরুণরা মুসলিম লীগের রাজনীতিতে এগিয়ে আসেন। তাদের নেতৃত্ব ভারতীয় মুসলমানগণ নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে মুসলিম লীগের পতাকা তলে সমবেত হয় এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে স্বতন্ত্র জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথক আবাসভূমি হিসেবে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

**সার-সংক্ষেপ**

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচার এবং হিন্দু ও কংগ্রেসের মুসলিম স্বার্থ বিরোধী তৎপরতা ইত্যাদির ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্রবোধ জেগে ওঠে। এমতাবস্থায় নিজেদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা এরই পরিণতি মাত্র। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা কালক্রমে এটি মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনে পরিণত হয় এবং মুসলমানদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়াসহ ১৯৪৭ সালে পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়–

ক. ১৯০৫ সালে খ. ১৯০৬ সালে

গ. ১৯০৭ সালে ঘ. ১৯০৮ সালে

২. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন–

ক. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ. খাজা নাজিম উদ্দিন

গ. নবাব সলিমুল্লাহ্ ঘ. আগা খান

৩. সিমলা ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন–

ক. নবাব সলিমুল্লাহ খ. আগা খান

গ. এ.কে. ফজলুল হক ঘ. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ১৯০৫ সালের _____ মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে তরান্বিত করে।

২. _____ অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেসী নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব দেন।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দিতে বলেন।

২. আগা খান সিমলা ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের জন্য নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের কি নাম প্রস্তাব করেছিলেন?

২. ১৯০৬ সালে মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের বার্ষিক সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. সংক্ষেপে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন।

২. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য মূল্যায়ন করুন।

## পাঠ-৩ : বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কারা ও কেন অংশ নেয় তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ বঙ্গভঙ্গ রদের প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাখ্য করতে পারবেন।
- ☞ বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া ও ফালাফল সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

পূর্ববর্তী পাঠে আলোচনা করা হয়েছে যে, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রতি সাধারণভাবে মুসলমান সম্প্রদায় সমর্থন জানায়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করে তারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে।

### ৩.১ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় উচ্চ বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়। বর্ণ হিন্দু জমিদার শ্রেণী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ছিল এ আন্দোলনের অগ্রভাগে। নিছক স্বার্থবোধ ও ধর্মভিত্তিক সংকীর্ণ জাতীয় চেতনা থেকেই মূলত তারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে এরা ছিলেন সবচেয়ে সুবিধা ভোগী। নতুন প্রদেশ সৃষ্টি এবং সেখানে মুসলমানদের প্রাধান্য তাদের এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা সৃষ্টি করে। নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় শিল্প-কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় এসব শ্রেণী তাদের পেশাগত ও আর্থিক ক্ষতির আশংকা করে। এমতাবস্থায় তারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ ও প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে । বক্তৃতা মঞ্চ ও পত্র-পত্রিকায় বঙ্গ বিভক্তিকে ভারত মাতার অঙ্গচ্ছেদ জাতীয়তা বিরোধী কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করে অবিলম্বে তা রদের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানায়।

### ৩.২ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেস

হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে। সরকারের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য কংগ্রেস বিদেশী পণ্য বর্জনের ডাক দেয়। বিদেশী পণ্য আমদানি ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সরকারি অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করা হয়। দেশীয় শিল্প-কারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষ করে সাংবাদিক-আইনজীবী ও কবি-সাহিত্যিকরা এ আন্দোলনকে জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মতিলাল ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্র লাল প্রমুখের রচিত দেশ বন্দনামূলক কবিতা ও গান আন্দোলনকারীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। কংগ্রেসের সভা ও মিছিলে 'বন্দেমাতারাম' ধ্বনিত হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রথম বর্ষ পূর্তিতে কংগ্রেস ও হিন্দুরা শোক দিবস হিসেবে পালন করে।

### ৩.৩ গুপ্ত সমিতি গঠন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে। তবে কংগ্রেসের কিছু উগ্র ও চরমপন্থী নেতার প্ররোচনায় আন্দোলনকারীদের একাংশ সন্ত্রাসী ও উগ্রপন্থী কার্যকলাপ শুরু করে। ঢাকা ও কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। ব্যারিস্টার প্রথমনাথ মিত্র ঢাকায় 'অনুশীলন সমিতি' গঠন করেন। পুলিন বিহারী দাসকে এটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এসময় কলকাতায় 'যুগান্তর' নামে একটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। অরবিন্দ ঘোষ, বারিন্দ্র ঘোষ ও ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ ছিলেন এ সমিতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য নেতা । সারা বাংলায় এসব গুপ্ত সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শতশত যুবক ও ছাত্র এসব সমিতিতে যোগ দেয়। গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে ইংরেজ মহলে আতঙ্ক তৈরি করে গুপ্ত সমিতি কার্যসিদ্ধির চেষ্টা চালায়। এ জন্য অনেকে জীবন উৎসর্গ করে । ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ছিলেন এদের অন্যতম।

### ৩.৪ ইংজের সরকারের নতি স্বীকার ও হিন্দুদের সাথে আপোষ

প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে দৃঢ় ও অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন। ভারত সচিব মর্লে বঙ্গ বিভাগকে একটি মীমাংসিত বিষয় বলে ঘোষণা করেন এবং কংগ্রেস কর্তৃক তা বাতিলের দাবি নাকচ করে দেন। এমনকি দমন

নীতির মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রশমনের চেষ্টা করে। ভাইসরয় মিন্টোও বঙ্গ বিভক্তি বাতিল না করার ব্যাপারে মুসলমানদের আশ্বস্থ করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা, স্বদেশী আন্দোলনের উগ্রতা এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও হত্যাকাণ্ড ব্রিটিশ সরকারকে ক্রমশ ভাবিয়ে তোলে। ঔপনিবেশিক স্বার্থ এবং সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা নতি স্বীকার এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের সাথে আপোষের পথ বেছে নেয়।

**৩.৫ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা**

১৯১০ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের নতুন ভাইসরয় হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ্য করে বঙ্গভঙ্গ রদের বিষয়ে গোপন তৎপরতা শুরু করেন। ব্রিটেনের সম্রাট পঞ্চম জর্জ এবং ভারত সচিব লর্ড ক্রু প্রমুখ বঙ্গভঙ্গ রদের পক্ষে মত দেন। ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণি মেরী ভারত সফরে আসেন। তাদের সফর উপলক্ষে ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে এক ঐতিহাসিক দরবারের আয়োজন করা হয়। সেখানে সম্রাট পঞ্চম জর্জ আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন। ফলে কার্জনের বাংলা বিভক্তির ব্যবস্থা বাতিল হয়। ঢাকা চট্টগ্রাম, রাজশাহী, প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমানের পাঁচটি বাংলা ভাষাভাষী বিভাগ নিয়ে বাংলা প্রদেশ পূনর্গঠন করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা হতে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়।

**৩.৬ বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল**

বঙ্গভঙ্গ রদ করায় উচ্চবর্ণের হিন্দু ও কংগ্রেস নেতারা উল্লাসিত হয়। তারা সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। অন্যদিকে স্বাভাবিক কারণেই মুসলমানরা এতে ভীষণভাবে মর্মাহত হয়। মুসলমানরা সরকারের এ একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে। তারা সরকারের এ সিদ্ধান্তকে হঠকারীতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা বলে আখ্যায়িত করেন। ইংরেজ সরকারের প্রতি তাদের আস্থা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ফলে অনেক মুসলমান ইংরেজদের প্রতি তাদের আনুগত্যের নীতি ত্যাগ করে। মুসলিম লীগের নীতিতেও এর প্রভাব পড়ে। অন্য সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে ভারতের স্বরাজ অর্জনের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণায় নবাব সলিমুল্লাহ অত্যন্ত মর্মাহত হন। এরপর তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অবসর নেন। অবশ্য ১৯১২ সালে লর্ড হার্জিঞ্জ ঢাকা সফরে এলে তিনি মুসলমানদের হতাশা এবং বিভিন্ন দাবিদাওয়া সম্পর্কে বড়লাটকে অবহিত করেন। তাঁর দাবির প্রেক্ষিতে বড়লাট ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস দেন। সে মোতাবেক ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

**সার-সংক্ষেপ**

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ বর্ণহিন্দু ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিদেশী পণ্য বর্জনের স্বদেশী আন্দোলন জোরদার হয়। আন্দোলনকারীদের একাংশ সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা ও গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসনের ভিত্তিকে প্রকম্পিত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত সরকার আন্দোলনের মুখে নতি স্বীকার করে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। এতে বর্ণ হিন্দু ও কংগ্রেস উল্লাসিত হয়। অন্যদিকে মুসলমানরা মর্মাহত হয়। তারা সরকারি সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে। সরকারের প্রতি তাদের আস্থা হ্রাস পায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১২.৩

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি অনুশীলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—
   ক. পুলিন বিহারী দাস খ. ব্যারিস্টার প্রমথ নাথ মিত্র
   গ. সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী ঘ. বারিন্দ্র ঘোষ

২. বঙ্গভঙ্গকে একটি 'মীমাংসিত বিষয়' বলে ঘোষণা করেন—
   ক. লর্ড মর্লে খ. লর্ড মিন্টো
   গ. লর্ড কার্জন ঘ. লর্ড ক্রু

৩. ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়—
   ক. কলকাতায় খ. মাদ্রাজে
   গ. দিল্লিতে ঘ. বোম্বেতে

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. কলকাতায় ____ নামে একটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়।
২. ১৯১০ সালে ____ ভারতের নতুন আইসরয় হিসেবে দায়িত্ব গ্রহর করেন।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়।
২. লর্ড মিন্টো বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. বঙ্গভঙ্গ রদের সময় কে ভারত সচিব ছিলেন?
২. কোন সম্রাট বঙ্গভঙ্গ রদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কারা এবং কেন অংশ নিয়েছিল?
২. বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ কি ছিল?
৩. বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১২

**বিশদ উত্তর প্রশ্ন**

১. ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের কারণসমূহ আলোচনা করুন।
২. ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন।
৩. বঙ্গভঙ্গ কেন রদ করা হয়েছিল? বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল আলোচনা করুন।

ইউনিট ১৩

# বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী রাজনৈতিক বিবর্তন (১৯১১-১৯৩৬)

## ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই ভারতের রাজনীতিতে পরিবর্তনের ধারার সূত্রপাত হয়। এসময় ইংরেজদের প্রতি আনুগত্যের রাজনীতিতে ভাটা পড়ে। ভারতীয়দের মধ্যে স্বার্থ চেতনা ও অধিকারবোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের আস্থা ও বিশ্বাস ভঙ্গ হয়। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য তারা হিন্দুদের সাথে সহযোগিতার পথে পা বাড়ায়। এ সময় ভারতের স্বরাজ অর্জনকে ভারতের মুসলমানরাও তাদের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করে। শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে লক্ষ্মৌ চুক্তি নামক এক যৌথ দাবিনামা স্বাক্ষরের মাধ্যমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ঐক্য প্রক্রিয়ার সূচনা করে। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ঐক্য প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয়। বেঙ্গল প্যাক্ট ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনের আরেক ধাপ অগ্রগতি। তবে এর পরই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। ভারতের রাজনীতিতে পুনরায় হিন্দু-মুসলিম বিভেদ বিসংবাদের কালো থাবা সম্প্রসারিত হয়। ফলে ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দেয়। শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধানের লক্ষে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সাইমন কমিশন গঠন এবং গোলটেবিল বৈঠক আহবানসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ভারতীয়দের উদ্যোগে নেহেরু রিপোর্ট, জিন্নাহর 'চৌদ্দ দফা' ইত্যাদিও সংকট নিরসনে ব্যর্থ হয়। ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে সংকট আরো ঘনিভূত হয়। এমতাবস্থায় ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের লক্ষে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ পড়ে ১৯১১ সালের পর ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ধারা এবং রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধানে সরকার ও ভারতীয়দের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ–


➔ পাঠ ১ : লক্ষ্মৌ চুক্তি (১৯১৬)

➔ পাঠ ২ : খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

➔ পাঠ ৩ : স্বরাজ দল ও বেঙ্গল প্যাক্ট

➔ পাঠ ৪ : সাইমন কমিশন (১৯২৭-৩০) নেহেরু রিপোর্ট (১৯২৮) ও জিন্নাহর চৌদ্দ দফা (১৯২৯)

➔ পাঠ ৫ : আইন অমান্য আন্দোলন ও গোলটেবিল বৈঠক

➔ পাঠ ৬ : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

## পাঠ-১ : লক্ষ্মৌ চুক্তি (১৯১৬)

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ লক্ষ্মৌ চুক্তি সম্পাদনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ এ চুক্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়ন ও প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৯১৬ সালের লক্ষ্মৌ চুক্তি ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ চুক্তি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটি সমঝোতার দলিল। এটি ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

### ১.১ লক্ষ্মৌ চুক্তির পটভূমি

১৯০৯ সালে প্রবর্তিত ভারতীয় কাউন্সিল আইনে (মর্লি-মিন্টু সংস্কার আইন) মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা সংযুক্ত হলেও এটি মুসলমানদের পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। এসময় ভারতের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সংঘটিত কিছু ঘটনা ভারতের মুসলিম রাজনীতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। কংগ্রেসের প্রবল চাপে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে। এতে মুসলমানরা মর্মাহত হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়ে। তাছাড়া ইরানের ব্যাপারে ঈঙ্গ-রুশ চুক্তি, ব্রিটিশ সমর্থনে ইটালী কর্তৃক তুরস্কের অধীনস্থ ত্রিপোলী অধিকার, বলকান যুদ্ধে তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশ আচরণ, ঢাকা ও আলীগড়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সরকারের গড়িমসি ও কালক্ষেপণ ইত্যাদি ভারতীয় শিক্ষিত মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী করে তোলে। ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে কানপুরে একটি মসজিদ ভেঙ্গে সরকারি রাস্তা সম্প্রসারণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং এতে কয়েকজন মুসল্লির মৃত্যু হলে মুসলমানদের সরকার বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ ও অসন্তোষ মুসলিম লীগের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম লীগের তরুণ নেতৃত্ব ব্রিটিশদের সাথে আপোষকামী নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। এ তরুণদের চাপে ১৯১৩ সালে লক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে দলের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করা হয়। জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং স্বরাজ অর্জন মুসলিম লীগের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়।

### ১.২ কংগ্রেস-লীগ সমঝোতা ও লক্ষ্মৌ চুক্তি স্বাক্ষর

এ সময় গোপাল কৃষ্ণ গোকলেসহ কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই ভারতের স্বরাজ অর্জনের আন্দোলনে কংগ্রেস লীগের ঐক্য প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কেননা তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের সহযোগিতা ও সমর্থন ব্যতীত সরকারের কাছে স্বায়ত্তশাসনের দাবি কোনরূপ গুরুত্ব লাভ করবে না। এ পরিস্থিতিতে ১৯১৫ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বোম্বেতে যৌথ অধিবেশনের আয়োজন করে এবং উভয় দলের নেতৃবৃন্দ একে অন্যের সভায় যোগ দিয়ে সরকারি নীতির সমালোচনা ও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে অভিন্ন বক্তব্য রাখেন। তারা স্থির করেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে এ দুই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ সরকারের নিকট যুক্ত পরিকল্পনা পেশ করবে। ১৯১৬ সালের ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ লক্ষ্মৌতে বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন করে। এ অধিবেশনে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ভারতের জন্য একটি যুক্ত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা প্রদানে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তিটিই ইতিহাসে লক্ষ্মৌ চুক্তি নামে পরিচিত। লক্ষ্মৌ চুক্তির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

### ১.৩ লক্ষ্মৌ চুক্তির বিষয়বস্তু

১. লক্ষ্মৌ চুক্তিতে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য সংখ্যা ১৫০ জন করার সুপারিশ করা হয়। এদের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ হবে মনোনীত এবং বাকি চার-পঞ্চমাংশ নির্বাচিত। নির্বাচিত সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ হবে মুসলমান সদস্য এবং পৃথক নির্বাচন প্রথা অনুযায়ী মুসলমান ভোটার দ্বারাই তারা নির্বাচিত হবেন।

২. প্রাদেশিক আইন সভার ক্ষেত্রে বড় প্রদেশের জন্য ১২৫ এবং ছোট প্রদেশের জন্য ৫০ হতে ৭৫ সদস্যের সুপারিশ করা হয়। এদের মধ্যে চার-পঞ্চমাংশ হবে নির্বাচিত এবং বাকি এক-পঞ্চমাংশ মনোনীত।

৩. যে সব প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু সেখানে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে জনসংখ্যা অনুপাতে তাদের প্রাপ্য আসন অপেক্ষা কম আসন দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। এখানেও পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর মাধ্যমেই মুসলমান প্রতিনিধিদের নির্বাচনের বিধান রাখা হয়।
৪. লক্ষ্মৌ চুক্তিতে শর্তারোপ করা হয় যে, নিজেদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছাড়া মুসলমানরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক অন্য কোন আসনে নির্বাচন করতে পারবে না।
৫. লক্ষ্মৌ চুক্তির সিদ্ধান্ত মতে, আইন পরিষদে কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিল কখনো গৃহীত হবে না যদি উক্ত সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য উক্ত বিলের বিরোধিতা করে।
৬. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একত্রে কাজ করবে।

**১.৪ লক্ষ্মৌ চুক্তির গুরুত্ব ও প্রতিক্রিয়া**

লক্ষ্মৌ চুক্তি হিন্দু ও মুসলমানদের সম্প্রীতি ও সমঝোতার এক মূল্যবান দলিল। ভারতের জন্য একটি সংবিধানের মূল রূপরেখা প্রণয়নে এটি ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যৌথ প্রয়াস। এ চুক্তি ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি রচনা করে। এ চুক্তিতে কংগ্রেস প্রথমবারের মতো মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার স্বীকার করে। মুসলিম লীগকেও ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ফলে কংগ্রেস-লীগ পারস্পরিক ঐক্য অর্জিত হয়। যা ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করে।

লক্ষ্মৌ চুক্তিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশে মুসলমানদের আসন সংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এ প্রস্তাব বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর প্রতিবাদে বাংলায় জনপ্রিয় মুসলিম নেতা নওয়াব আলী চৌধুরী প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং একটি নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে পাঞ্জাব মুসলিম লীগেও ভাঙ্গন দেখা দেয়। মাদ্রাজের তামিল ভাষাভাষী মুসলমানরাও এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।

**সার-সংক্ষেপ**

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ ভারতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘটিত কিছু ঘটনায় ভারতের মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আস্থা হারায়। তারা ইংরেজদের সাথে আপোষকামী নীতি পরিত্যাগ করে দাবি আদায়ে কংগ্রেস ও হিন্দুদের সাথে ঐক্য ও সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জনে কংগ্রেস ও মুসলমানদের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মনে করে। এমতাবস্থায় ঐক্য প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ১৯১৬ সালে তারা একটি যুক্ত পরিকল্পনা তৈরি করে। যা লক্ষ্মৌ চুক্তি নামে পরিচিত। এ চুক্তি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতা ও সামাজিক সম্প্রীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.১

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ১৯১৫ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়—
   ক. বোম্বেতে খ. কলকাতায়
   গ. লক্ষ্মৌতে ঘ. করাচিতে

২. লক্ষ্মৌ চুক্তিতে কেন্দ্রীয় আইন সভার জন্য সদস্য সংখ্যা দাবি করা হয়—
   ক. ১২০ জন খ. ১২৫ জন
   গ. ১৫০ জন ঘ. ১৬০ জন

৩. লক্ষ্মৌ চুক্তির প্রতিবাদে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেয়—
   ক. এ.কে. ফজলুল হক খ. খাজা নাজিমুদ্দীন
   গ. স্যার আবদুর রহিম ঘ. নওয়াব আলী চৌধুরী

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ১৯১৩ সালে ____ একটি মসজিদ ভেঙ্গে সরকারি রাস্তা সম্প্রসারণ করা হয়।
২. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য _____ ও _____ একত্রে কাজ করবে।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. লক্ষ্মৌ চুক্তিতে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়।
২. লক্ষ্মৌ চুক্তি ভারতের হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বৃদ্ধি করে।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. কত সালে লক্ষ্মৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়?
২. কোন চুক্তিতে কংগ্রেস প্রথম মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকারের স্বীকৃতি দেয়?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. লক্ষ্মৌ চুক্তির বিষয়বস্তু বা প্রধান ধারাসমূহ আলোচন করুণ।
২. লক্ষ্মৌ চুক্তির তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন।

## পাঠ-২ : খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের কারণ ও পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ আন্দোলন দুটির পরিণতি ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত দুটি আন্দোলন ছিল প্রথম ব্যাপক ও গণ-ভিত্তিক আন্দোলন। এ আন্দোলন দুটি শেষ পর্যন্ত সফল না হলেও ভারতীয় জনগণের মধ্যে আত্মসচেতনতা ও রাজনৈতিক অধিকারবোধ বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করে।

### ২.১ খিলাফত আন্দোলনের কারণ

খিলাফত ইসলামের একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মদীনায় এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হলেও রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারায় এটি দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো ও কর্ডোভা হয়ে শেষ পর্যন্ত তুরস্কের অটোমান সুলতানদের অধিকারে যায়। খিলাফত বিশ্ব মুসলমানের নিকট ঐক্যের ও মর্যাদার প্রতীক। এ মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের অধিকারী হওয়ায় বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানদের মতো তুরস্কের সুলতান খলিফার প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য ও সম্মানবোধ অনেক দিন থেকেই ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শুরু হলে তুরস্ক নিজের স্বার্থে মিত্র শক্তির (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া ইত্যাদি) বিরুদ্ধে অক্ষ শক্তির (জার্মানি, ইটালী ইত্যাদি) পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তাদের মনে দ্বৈত আনুগত্যের প্রশ্ন দেখা দেয়। এমতাবস্থায় চতুর ব্রিটিশদের প্ররোচনায় ভারতীয় মুসলমানগণ এ শর্তে যুদ্ধে যোগদান করেন যে, যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশরা তুরস্কের খিলাফতের মর্যাদা রক্ষা করবে, এর কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু যুদ্ধে অক্ষশক্তি তথা তুরস্ক পরাজিত হলে মুসলমানগণ খলিফার মর্যাদা রক্ষা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় খলিফার মর্যাদা ও খিলাফত রক্ষার দাবিতে ভারতীয় মুসলমানগণ যে আন্দোলন গড়ে তোলে, ইতিহাসে এ আন্দোলন 'খিলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত। আলী ভ্রাতৃদ্বয় (মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী) মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ড. এম.এ. আনসারী, হসরত মোহানী ও শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক প্রমুখের নেতৃত্বে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়।

### ২.২ খিলাফত আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি, গান্ধীর যোগদান ও অসহযোগ আন্দোলন

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি গঠন করা হয়। বোম্বেকে কেন্দ্র করে সব প্রদেশে কমিটির শাখা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। নভেম্বর মাসে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খিলাফত কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে তুরস্কের খলিফার মর্যাদা রক্ষায় সরকার প্রতিশ্রুতি না দিলে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন ও অসহযোগ নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। এ সময়ে কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও রাওলাট বিধিসহ (১৯১৯) বিভিন্ন সরকারি নির্যাতনের প্রতিবাদে অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 'সত্যাগ্রহ' শুরু করেন। তাঁর আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের সমর্থন আদায়ের জন্য গান্ধী খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির সদস্য হন। খিলাফত আন্দোলনের প্রতি গান্ধীর সমর্থনের বিনিময়ে খিলাফত নেতৃবৃন্দ গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়ে তোলে। মিত্র পক্ষ সেভার্স চুক্তির (২৩ আগস্ট, ১৯২০) মাধ্যমে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করার উদ্যোগ নিলে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। সেভার্স চুক্তির প্রতিবাদে মুসলমানগণ ৩১ আগস্ট খিলাফত দিবস পালন করে। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি এবং পূর্ণ স্বরাজের দাবি ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে সরকারি চাকরি ও পদবী ত্যাগ, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ আদালত ও আইন ব্যবসা বর্জন এবং বিলাতি দ্রব্য পরিহার ইত্যাদি প্রস্তাব গ্রহণ করে। খিলাফত কমিটি ও মুসলিম লীগ কংগ্রেসের অসহযোগ কর্মসূচি অনুমোদন করে এবং স্বরাজ অর্জন উভয়ের মূল উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা দেয়। এভাবে খিলাফত ও অসহযোগ হিন্দু-মুসলমানের যৌথ আন্দোলনে পরিণত হয়।

বাংলায় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একটি গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। এতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় অংশ নেয়। বাংলায় এ আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে মাওলানা আকরাম খান, মাওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী, মজিবুর রহমান খান, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বিপিন চন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন জেলায় বহু সংখ্যক কমিটি গঠিত হয়। মোহাম্মদী, আল ইসলাম ও দ্যা মুসলমানসহ বিভিন্ন সংবাদপত্র গণসমর্থন সৃষ্টিতে মূল্যবান ভূমিকা রাখে।

### ২.৩ আন্দোলনের ব্যাপকতা ও ইংরেজদের দমন নীতি

১৯২১ সালের শুরুতে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে। শ্রমিকরা কল-কারখানা ত্যাগ করে। সরকারি চাকরিজীবীরা চাকরিতে ইস্তফা দেয়। আইনজীবীগণ আদালত ত্যাগ করেন। বিদেশী পণ্য পরিহার এবং দেশী পণ্য ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আন্দোলনের ব্যাপকতায় ভীত হয়ে ব্রিটিশ সরকার দমন নীতি গ্রহণ করে। হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। অনেকে আবার স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। মুসলমানরা ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ত্যাগ করার হুমকি দেয়। কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। সরকারকে কর ও খাজনা প্রদান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পর্যায়ে আন্দোলন সহিংস রূপ ধারণ করে। ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে মালাবারে কৃষক বিদ্রোহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর প্রদেশের চৌরি-চৌরা নামক স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতা একটি থানা আক্রমণ করে ২১ জন সিপাহী ও একজন দারোগাকে পুড়িয়ে হত্যা করে।

### ২.৪ আন্দোলনের পরিণতি

অহিংস আন্দোলন সহিংসতায় পরিণত হলে গান্ধী মর্মাহত হন এবং হঠাৎ করে আন্দোলন কর্মসূচি বাতিল করেন। সরকার গান্ধীকে গ্রেপ্তার করে। এতে আন্দোলনকারীগণ হতাশ হয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করায় খিলাফত আন্দোলনও দুর্বল এবং স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯২৪ সালে তুরস্কে মুস্তফা কামাল আতার্তুক খিলাফত উচ্ছেদ করলে এ আন্দোলনের চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটে।

### ২.৫ গুরুত্ব ও প্রভাব

আপাত দৃষ্টিতে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়। তবে এ আন্দোলনে যে রাজনৈতিক তৎপরতা সৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, তা সারা ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করে। যা কালক্রমে ভারতে স্বাধীনতা অর্জনকে তরান্বিত করেছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীকার আন্দোলনের ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম।

### সার-সংক্ষেপ

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খিলাফত আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল তুরস্কের খিলাফত রক্ষা এবং অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল স্বরাজ অর্জন। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা সত্ত্বেও আন্দোলন দুটি যুগপৎ ও যৌথ নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। নানা কারণে এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ ভারতের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে এ দুটি আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বস্তুত ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এটি ছিল প্রথম গণভিত্তিক আন্দোলন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. খিলাফত কি—
   ক. ইসলামের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
   খ. ইসলামের সামাজিক প্রতিষ্ঠান
   গ. ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান
   ঘ. ইসলামের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

২. ভারতীয় মুসলমানরা আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করত—
   ক. মিশরের বাদশাহ্‌র প্রতি
   খ. ইরানের সম্রাটের প্রতি
   গ. তুরস্কের খলিফার প্রতি
   ঘ. সৌদি আরবের যুবরাজের প্রতি

৩. খিলাফত আন্দোলন প্রথমে কারা শুরু করেন?
   ক. মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী
   খ. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌, মাওলানা আকরাম খান
   গ. এ. কে. ফজলুল হক ও নওয়াব আবদুল লতিফ
   ঘ. সৈয়দ আমীর আলী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৪. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড কবে সংঘটিত হয়?
   ক. ১৯১৫ সালে
   খ. ১৯২০ সালে
   গ. ১৯১৯ সালে
   ঘ. ১৯২১ সালে

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

ক. ১৯১৯ সালের _____ মাসে সর্বভারতীয় _____ কমিটি গঠিত হয়।
খ. সেভার্স চুক্তির প্রতিবাদে মুসলমানগণ ৩১ আগস্ট _____ পালন করে।
গ. ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে _____ কৃষক বিদ্রোহ হয়।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

ক. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক মিত্র শক্তির পক্ষে যোগ দেয়।
খ. সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির কেন্দ্র ছিল বোম্বে।
গ. ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের দাবি ঘোষণা করে।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

ক. সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটির প্রথম সভায় সভাপতিত্ব করেন কে?
খ. কত সালে সেভার্স চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
গ. কত সালে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

ক. খিলাফত আন্দোলনের কারণ বর্ণনা করুন।
খ. অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি আলোচনা করুন।
গ. খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ কি?
ঘ. উপ-মহাদেশের ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব কি?

## পাঠ-৩ : স্বরাজ দল ও বেঙ্গল প্যাক্ট

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ স্বরাজ দল গঠন ও বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ বেঙ্গল প্যাক্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

১৯২২ সালে স্বরাজ দল গঠিত হয়। স্বরাজ দলের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের (সি.আর. দাস) উদ্যোগে ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিটি ছিল বাংলার হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রচেষ্টা।

### ৩.১ স্বরাজ দল গঠন

১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে মত বিরোধ দেখা দেয়। জাতীয় কংগ্রেস বিধান সভা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহেরু ও সি.আর. দাস প্রমুখ ব্যবস্থাপক পরিষদগুলোতে যোগদানের পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, আইন সভায় থেকে ধারাবাহিক প্রতিবন্ধকতার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনের (মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইন) মাধ্যমে প্রবর্তিত দ্বৈত শাসন ব্যবস্হার অবসান ঘটানো। কিন্তু ১৯২২ সালে গয়ায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে এ প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এরপর সি.আর. দাস কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং ১৯২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর মতিলাল নেহেরু, হাকীম আজমল খান প্রমুখকে নিয়ে কংগ্রেসের ভেতরেই 'স্বরাজ দল' নামে একটি দল গঠন করেন। সি.আর. দাস এ দলের নেতা নির্বাচিত হন।

### ৩.২ স্বরাজ দলের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি

স্বরাজ দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন অকার্যকর করে দেওয়া এবং ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা। দলের প্রধান কর্মসূচি ছিল আইন সভায় নির্বাচিত হয়ে সরকারি কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করা, বাজেট পাসে বাধা এবং শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করে মন্ত্রী সভার পতন ঘটানো। ১৯২৩ সালের বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে স্বরাজ দল উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। প্রাদেশিক পরিষদের ১৩৯টি আসনের মধ্যে ৪৬টি আসন লাভ করে এ দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়। স্বরাজ দলের এ সাফল্যের মূলে ছিল দেশ বন্ধু সি.আর. দাসের কুশলী নেতৃত্ব।

### ৩.৩ বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষর

সি. আর. দাস ছিলেন একজন দূরদর্শী ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, মুসলমানদের সহযোগিতা ছাড়া যেমন স্বরাজ অর্জন সম্ভব নয়, তেমনি তাঁর 'প্রতিবন্ধক নীতি' কার্যকর করাও অসম্ভব। একজন উদারচিত্ত রাজনীতিক হিসেবে মুসলমানদের ন্যায্য দাবি ও অধিকারের প্রতিও তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা এবং তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের লক্ষে তিনি মুসলিম নেতা এ.কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। এরপর হিন্দু-মুসলিম দাবি-দাওয়া নিয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এ চুক্তিটি 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা 'বাংলা চুক্তি' নামে পরিচিত। ১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বরাজ দলের সভায় চুক্তিটি অনুমোদিত হয়। এ সভায় বলা হয় যে, বাংলায় সত্যিকারের স্বনিয়ন্ত্রিত সরকার প্রতিষ্ঠত হলেই এ চুক্তি কার্যকর হবে।

বেঙ্গল প্যাক্টের বিভিন্ন বিধানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতগুলো ছিল নিম্নরূপ—

**৩.৪ বেঙ্গল প্যাক্টের বিষয়বস্তু**

ক. জনসংখ্যার ভিত্তিতে ও স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থায় বাংলার আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হবে।

খ. স্থানীয় পরিষদসমূহে প্রতিনিধি নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় পাবে শতকরা ৬০টি আসন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পাবে শতকরা ৪০টি আসন।

গ. সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে শতকরা ৫৫ ভাগ পদ পাবে মুসলমানগণ। যতদিন এ সংখ্যায় উন্নীত না হওয়া যায়, ততদিন সরকারি চাকরির শতকরা ৮০ ভাগ পাবে মুসলমানগণ এবং বাকি শতকরা ২০ ভাগ পাবে হিন্দুগণ।

ঘ. এমন কোন ধর্মীয় ব্যাপারে বিল আকারে আইন সভায় উপস্থাপন করা যাবে না, যদি না এর প্রতি সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আইন সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শতকরা ৭৫ ভাগের সম্মতি থাকে।

ঙ. মসজিদের সামনে বাদ্যযন্ত্র সহকারে শোভাযাত্রা করা যাবে না এবং ধর্মীয় প্রয়োজনে মুসলমানদের গরু কোরবানিতে বাধা দেওয়া যাবে না ইত্যাদি।

**৩.৫ বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল**

বেঙ্গল প্যাক্ট ছিল বাংলা তথা উপ-মহাদেশের হিন্দু-মুসলিম মিলনের জন্য একটি প্রশংসনীয় এবং বাস্তব ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ চুক্তির ফলে স্বভাবতই মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ খুশি হয়। তাঁরা সর্বান্তকরণে চুক্তিটিকে স্বাগত জানায়। মুসলিম গণমাধ্যমগুলো তাদের ন্যায্য দাবিসমূহ পূরণ করার মতো উদারতা প্রদর্শন করায় সি.আর. দাস ও তাঁর সহযোগী হিন্দু নেতাদের ধন্যবাদ জানায়। কিন্তু এ সাহসী পদক্ষেপ সি.আর. দাসের নিজ সম্প্রদায়ের অধিকাংশের নিকটই গ্রহণযোগ্য হয়নি। শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত ও জমিদার শ্রেণী এ চুক্তির মধ্যে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা দেখে। ফলে তারা এ চুক্তির বিরোধিতা করে। তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলো বেঙ্গল প্যাক্টের বিরূপ সমালোচনা করে। সি.আর. দাসকে সুবিধাবাদী ও মুসলিম স্বার্থরক্ষাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কোকানন্দ অধিবেশনে চুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করা হয়। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে কোন পৃথক প্রাদেশিক চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে মুসলমানগণ অত্যন্ত হতাশ বোধ করেন। তাঁরা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে অদূরদর্শী ও অতি-স্বার্থপর বলে আখ্যায়িত করেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক বেঙ্গল প্যাক্ট প্রত্যাখ্যাত হলেও সি.আর. দাস তাঁর শক্তি ও উদ্দেশ্যের সততা বলে চুক্তিটি কার্যকরী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯২৫ সালের ১৬ জুন তাঁর অকাল মৃত্যুতে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' অকার্যকর হয়ে পড়ে। স্বরাজ দলের কর্মসূচিতে অনেক পরিবর্তন আসায় হিন্দু-মুসলিম সদস্যদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। সাম্প্রদায়িকতা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও মিলনের সম্ভাবনা চিরতরে নস্যাত হয়ে যায়।

**সার-সংক্ষেপ**

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর কংগ্রেসের কর্মপন্থা নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁর সমর্থক কতিপয় কংগ্রেস নেতা 'স্বরাজ দল' গঠন করেন। সি.আর. দাস ছিলেন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। স্বরাজ আদায়ের আন্দোলনে মুসলমানদের সমর্থন আদায়ের জন্য তিনি তাদের সাথে ঐক্য গড়ার চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি ১৯২৩ সালে মুসলমানদের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন- যা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিত। এ চুক্তিটি ছিল বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্তু কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতা এবং সর্বোপরি দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে চুক্তিটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে রাজনীতিতে পুনরায় সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলে দাঁড়ায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.৩

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. স্বরাজ দল গঠিত হয়–

ক. ১৯২১ সাল খ. ১৯২২ সাল

গ. ১৯২৩ সাল ঘ. ১৯২৪ সাল

২. বেঙ্গল প্যাক্ট কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে প্রত্যাখ্যাত হয়–

ক. গয়া অধিবেশনে খ. নাগপুর অধিবেশনে

গ. কোকনাদ অধিবেশনে ঘ. কলকাতা অধিবেশনে

৩. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মারা যান ১৯২৫ সালের–

ক. ১৬ জুন খ. ১৬ আগস্ট

গ. ১৬ অক্টোবর ঘ. ১৬ ডিসেম্বর

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. স্বরাজ দল গঠিত হয় ____ সালের _____ ডিসেম্বর।

২. ১৯২৩ সালের কংগ্রেসের ____ অধিবেশনে বেঙ্গল প্যাক্ট প্রত্যাখ্যান করা হয়।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. বেঙ্গল প্যাক্টের প্রধান উদ্যোক্তা মতিলাল নেহেরু।

২. বেঙ্গল প্যাক্ট অনুযায়ী স্থানীয় পরিষদসমূহের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ৬০ টি আসন পাবে।

৩. প্রতিবন্ধক নীতির মাধ্যমে আইন সভাকে অকার্যকর করা ছিল স্বরাজ দলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. কত সালে স্বরাজ দল গঠিত হয়?

২. বেঙ্গল প্যাক্টে সরকারি চাকরির শতকরা কত ভাগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়?

৩. বেঙ্গল প্যাক্টের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব কিরূপ ছিল?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. স্বরাজ দলের উদ্দেশ্য ও প্রধান কর্মসূচি কি ছিল?

২. বেঙ্গল প্যাক্টের বিষয়বস্তু বর্ণনা করুন।

৩. বেঙ্গল প্যাক্টের ফলাফল আলোচনা করুন।

# পাঠ-৪ : সাইমন কমিশন (১৯২৭-৩০), নেহেরু রিপোর্ট (১৯২৮) ও জিন্নাহর চৌদ্দ দফা (১৯২৯)

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- কি পরিস্থিতিতে সাইমন কমিশন ও নেহেরু কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- সাইমন কমিশনের প্রতি ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাইমন কমিশন রিপোর্ট ও নেহেরু রিপোর্টের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
- নেহেরু রিপোর্টের প্রতি বিভিন্ন দলের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জিন্নাহর চৌদ্দ দফা উপস্থাপনের পটভূমি ও বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
- চৌদ্দ দফা দাবির ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

## ৪.১ সাইমন কমিশন

১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন (মন্টেগু-চেমস ফোর্ড আইন) প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের বিধান অনুসারে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য দশ বছর পর ১৯২৯ সালে একটি বিধিবদ্ধ কমিশন গঠনের কথা বলা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সংবিধানের আশু সংস্কারের জন্য ভারতীয়দের দাবির প্রেক্ষিতে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার দু'বছর আগেই ১৯২৭ সালে একটি বিধিবদ্ধ পার্লামেন্টারী কমিশন গঠন করে। ব্রিটিশ লর্ড সভার দুইজন এবং কমন্সসভার চারজন সদস্য নিয়ে এ কমিশন গঠিত হয়। স্যার জন সাইমনকে কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। তাঁর নামানুসারে এটি 'সাইমন কমিশন' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯১৯ সালের আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং ব্রিটিশ ভারতে আরও শাসনতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া না দেওয়ার সম্ভাবনা যাচাই করার ভার কমিশনের উপর অর্পিত হয়।

## ৪.২ ভারতীয়দের কমিশন বয়কট

সাইমন কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় ভারতীয় প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। একে পুরোপুরি 'শ্বেতাঙ্গদের কমিশন' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতীয় কংগ্রেস, জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের একাংশ এবং ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন দল এ কমিশন প্রত্যাখ্যান করে একে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কমিশন ভারতে এলে কালো পতাকা প্রদর্শন এবং 'সাইমন ফিরে যাও' শ্লোগান দিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

## ৪.৩ সাইমন কমিশন রিপোর্ট

ভারতীয়দের বিরোধিতা এবং প্রচণ্ড অস্থির ও উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই সাইমন কমিশন কাজ শেষ করে এবং ১৯৩০ সালে দুই খণ্ডে রিপোর্ট প্রকাশ করে। এ রিপোর্ট ছিল ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার এক আকর্ষণীয় এবং ব্যাপক পর্যালোচনার দলিল। এটি ভারতের জন্য ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের সুপারিশ করে। প্রাদেশিক দ্বৈত শাসন বাতিল করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে এবং মুসলমানদের জন্য আইন সভায় আসন সংরক্ষণ ও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে নির্বাচনের সুপারিশ করে।

## ৪.৪ রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব

সাইমন কমিশন রিপোর্ট ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এর সমালোচনা করে। তবে ব্রিটিশ সরকার মোটামুটিভাবে সাইমন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই পরবর্তীতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করে।

## ৪.৫ নেহেরু রিপোর্ট

ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে নেহেরু রিপোর্ট এক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর ভারতের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পটভূমিতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ক্রমাগত চেষ্টা চালায়। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহ সাইমন কমিশন বয়কট করে। কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যান্য দলের সাথে পরামর্শ করে একটি 'স্বরাজ শাসনতন্ত্র' প্রণয়নের

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এজন্য কংগ্রেস সর্বদলীয় সভা ডাকে। ১৯২৮ সালের ১৯ মে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় তৃতীয় সভায় সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি আগস্ট মাসে একটি রিপোর্ট পেশ করে। সংবিধানের খসড়া সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ ভিত্তিক দলিল 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

### ৪.৬ রিপোর্টের বিষয়বস্তু

নেহেরু রিপোর্টে ভারতের জন্য স্বাধীনতার পরিবর্তে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের মর্যাদা প্রদান, দায়িত্বশীল সরকার গঠন, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা গঠন, সিন্ধুকে বোম্বে হতে পৃথক করার প্রস্তাব করে। নেহেরু রিপোর্ট কেন্দ্র ও অমুসলমান প্রধান প্রদেশগুলোতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব করলেও বাংলা এবং পাঞ্জাবে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের নীতি বাতিলের সুপারিশ করে। তাছাড়া রিপোর্টে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন নীতি প্রত্যাহার করে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়।

### ৪.৭ নেহেরু রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া

নেহেরু রির্পোট ভারতে বিদ্যমান পরিস্থিতি অনুযায়ী সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা সুপারিশ করতে ব্যর্থ হয়। রিপোর্ট প্রকাশের পর রাজনৈতিক দলগুলো মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। কংগ্রেস সাধারণভাবে নেহেরু রিপোর্টের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। তবে কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরু স্বাধীনতার পরিবর্তে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দাবি প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানান এবং দলের সচিব পদ থেকে ইস্তফা দেন। শিখ নেতৃবৃন্দ রিপোর্টের সাম্প্রদায়িক প্রস্তাবনাসমূহ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের অধিকার নিশ্চিত না হওয়ায় হরিজন সম্প্রদায় অসন্তোষ প্রকাশ করে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ দল-মত নির্বিশেষে এ রিপোর্টের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নেহেরু রিপোর্ট সংশোধনের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস জিন্নাহর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। এতে মুসলিম লীগ নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ বৃদ্ধি পায়।

### ৪.৮ জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর চৌদ্দ দফা প্রস্তাবনা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে নেহেরু রিপোর্ট ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার নিষ্পত্তি বিধান, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিধানে ব্যর্থ হয়। ফলে জাতীয় জীবনে জাতিগত অনৈক্য বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় নেহেরু রিপোর্টের প্রতিবাদে ১৯২৯ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য চৌদ্দ দফা দাবি উত্থাপন করেন - যা ইতিহাসে জিন্নাহর চৌদ্দ দফা নামে পরিচিত।

### ৪.৯ চৌদ্দ দফার বিষয়বস্তু

জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা দাবির মধ্যে ফেডারেল পদ্ধতির শাসনতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাদেশিক আইন পরিষদ ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থায় সংখ্যালঘুদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ, পৃথক নির্বাচন এবং সকল সম্প্রদায়ের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি দাবি ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও চৌদ্দ দফায় সরকারি চাকরিতে পর্যাপ্ত হারে মুসলমানদের নিয়োগ, কেন্দ্র বা প্রদেশের মন্ত্রী সভায় কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ এবং মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশনের দাবি জানানো হয়।

### ৪.১০ চৌদ্দ দফার গুরুত্ব

ভারতে রাজনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাসে চৌদ্দ দফার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নেহেরু রিপোর্টে ভারতীয় মুসলমানদের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় এর প্রতিবাদস্বরূপ জিন্নাহ চৌদ্দ দফা দাবিনামা পেশ করেন। এ চৌদ্দ দফা বিভক্ত মুসলিম উপদলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে। তাছাড়া পরবর্তীকালে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে (১৯৩৩) এই চৌদ্দ দফা হুবহু মেনে নেওয়া হয়েছিল।

**সার-সংক্ষেপ**

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর ভারতের হিন্দু-মুসলমান বিভেদ, অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-

হাঙ্গামার পটভূমিতে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান ও ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে 'সাইমন কমিশন' গঠন করে। তবে এতে ভারতীয় কোন প্রতিনিধি না থাকায় ভারতে রাজনৈতিক দলগুলো এ কমিশন বয়কট করে। এতদ্‌সত্ত্বেও এ কমিশন ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। কিন্তু এ রিপোর্ট ভারতীয় সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়। ভারতীয় সমস্যা সমাধানে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও গৃহীত হয়। ভবিষ্যৎ সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ে নেহেরু কমিটি গঠিত হয়। ১৯২৮ সালে কমিটি যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে তা 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে পরিচিত। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে নেহেরু রিপোর্ট ব্যর্থ হয়। মুসলমানদের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় মুসলিম লীগ নেহেরু রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে। শুধু তাই নয়, এর প্রতিবাদ স্বরূপ লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯২৯ সালে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য চৌদ্দ দফা দাবি পেশ করেন। জিন্নাহর চৌদ্দ দফা নামে পরিচিত এ দাবিনামা ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য আরও বৃদ্ধি করে। এ সাম্প্রদায়িক বিভেদের শেষ পরিণতিই হলো ভারত বিভক্তি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.৪

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. সাইমন কমিশন গঠিত হয়েছিল—
   ক. ১৯২৫ সালে খ. ১৯২৬ সালে
   গ. ১৯২৭ সালে ঘ. ১৯২৮ সালে

২. 'নেহেরু রিপোর্ট' প্রণয়নকারী সর্বদলীয় কমিটির প্রধান ছিলেন—
   ক. জওহরলাল নেহেরু খ. মতিলাল নেহেরু
   গ. মহাত্মা গান্ধী ঘ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

৩. জিন্নাহর চৌদ্দ দফায় কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য আসন সংখ্যা দাবি করা হয়—
   ক. মোট আসনের অর্ধেক খ. মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ
   গ. মোট আসনের দুই-তৃতীয়াংশ ঘ. মোট আসনের এক-চুতর্থাংশ

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. সাইমন কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় একে _____ বলে আখ্যা দেয়া হয়।
২. নেহেরু রিপোর্টে ভারতের জন্য ____ পরিবর্তে ব্রিটিশ _____ মর্যাদাদানের দাবি করা হয়।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. নেহেরু রিপোর্টে ভারতের স্বাধীনতার দাবি করা হয়।
২. ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে চৌদ্দ দফার প্রতিফলন ঘটে।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমূহ সাইমন কমিশনকে কি বলে আখ্যায়িত করে?
২. নেহেরু রিপোর্ট প্রণয়নকারী সর্বদলীয় কমিটির প্রধান কে ছিলেন?
৩. জিন্নাহ কত সালে তার বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা' পেশ করেছিলেন?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. সাইমন কমিশনের রিপোর্টের বিষয়বস্তু কি ছিল?
২. নেহেরু রিপোর্টের প্রতি বিভিন্ন দলের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।
৩. জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা দাবির মূল বিষয়বস্তু কি ছিল?

## পাঠ-৫ : আইন অমান্য আন্দোলন ও গোলটেবিল বৈঠক

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমি আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি ও ব্যাপকতা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ লন্ডনে আহুত গোলটেবিল বৈঠকের (১৯৩০-৩২) উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ গোলটেবিল বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

### ৫.১ আইন অমান্য আন্দোলন

**আইন অমান্য আন্দোলনের পটভূমি**

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩২) গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯২৯ সালের ৩১ অক্টোবর ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন ভারতকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দানের বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছার কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান যে, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করা হবে। ব্রিটিশ সরকারের এ ঘোষণা ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এ ব্যাপারে তারা সংশয় প্রকাশ করেন। কেননা এতে ডোমিনিয়ন প্রদানের সময়সীমা ঘোষিত হয়নি। এমতাবস্থায় সন্দেহ দূর করা এবং ভারতের ভবিষ্যৎ সুসম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারে প্রকৃত উদ্দেশ্য জানার জন্য মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহেরু, স্যার সাপ্রু এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বড়লাটের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু বড়লাট তাদের কোন আশ্বাস দিতে পারেননি, এতে তাঁরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ হতাশাজনক পরিস্থিতিতে ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। একই সাথে ভারতীয়দের দাবিসমূহ আদায়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এমতাবস্থায় গান্ধী ভারতের 'পূর্ণ স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার দাবিতে 'আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ' আন্দোলন শুরু করেন।

**৫.২ কর্মসূচি**

আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল :

ক. লবণ আইন ভঙ্গ করা।
খ. ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং চাকরিজীবীদের সরকারি অফিস বর্জন করা।
গ. বিদেশী বস্ত্র ও ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করা।
ঘ. মদ ও মাদক জাতীয় পণ্য বর্জন করা এবং
ঙ. ভূমি রাজস্বসহ কর-খাজনা না দেওয়া ইত্যাদি।

**৫.৩ আন্দোলনের ব্যাপকতা**

প্রথমে শুরু হয় লবণ আইন অমান্য আন্দোলন । সরকার সমুদ্রের পানি ফুটিয়ে লবণ তৈরি করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং লবণের উপর ট্যাক্স বাড়িয়ে দেয়। এ অবস্থায় গান্ধী ৭৯ জন প্রশিক্ষিত অনুসারীসহ ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ সাবরমতী আশ্রম হতে ২০০ মাইল পায়ে হেঁটে গুজরাটের ডান্ডিতে পৌঁছান। সেখানে সমুদ্রের পানি হতে লবণ তৈরি করে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলন খুব দ্রুত ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ পণ্য বর্জন এবং বিদেশী বস্ত্রের বহ্নোৎসব আশাতীত সাফল্য লাভ করে। বয়কট পিকেটিং খাজনা ও চৌকিদারী ট্যাক্স প্রদান বন্ধ করা হয়। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার চাপ বাংলায়ও তীব্রভাবে অনুভূত হওয়ায় সেখানেও খাজনা ও অন্যান্য ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করার বিষয়টি গ্রামবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ আন্দোলনে খুব কম সংখ্যক মুসলমান যোগ দিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও এ আন্দোলনের ফলে অনেক স্থানে প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে।

### ৫.৪ সরকারি নির্যাতন ও আন্দোলন প্রত্যাহার

আন্দোলনের ব্যাপকতায় ভীত হয়ে ব্রিটিশ সরকার নির্যাতনের মাধ্যমে আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করেন। গান্ধী, নেহেরুসহ লক্ষাধিক লোককে কারারুদ্ধ করা হয়। জনতাও নির্যাতন প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়। সোলপুরে বিক্ষুব্ধ জনতা ৫টি থানা পুড়িয়ে দেয়। এতে গুলিবর্ষণে বেশ কয়েকজন মারা যায়। এমতাবস্থায় ১৯৩২ সালে গান্ধী আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

### ৫.৫ আন্দোলনের ফলাফল ও গুরুত্ব

আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন ভারতের স্বরাজ অর্জনে ব্যর্থ হয়। তবে ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি ও জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব রয়েছে।

## ৫.৬ গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩০-৩২)

### গোলটেবিল বৈঠক আহবানের উদ্দেশ্য

১৯৩০ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। এ বছর মে মাসে সাইমন কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সমস্ত রাজনৈতিক দল রিপোর্ট গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে । এ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠক আহবান করেন । এ বৈঠকের উদ্দেশ্য ভারতের বিরাজমান পরিস্থিতি ও সংকট নিরসনকল্পে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ এবং ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়ন। ১৯৩০ সালে আহুত গোলটেবিল বৈঠক তিনটি অধিবেশনে ১৯৩২ সালে সমাপ্ত হয়।

### প্রথম গোলটেবিল বৈঠক

গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন বসে ১২ নভেম্বর, ১৯৩০ সালে। এ বৈঠকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, এ,কে, ফজলুল হক, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, ড. অম্বেদকারসহ দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ ভারতের হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কংগ্রেস এ বৈঠক বর্জন করে। বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন, প্রদেশসমূহে দায়িত্বশীল সরকার এবং কেন্দ্রে আংশিক দায়িত্বশীল সরকার গঠন ইত্যাদি কতগুলো সাংবিধানিক প্রস্তাব দেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবগুলো মোটামুটি মেনে নেন। তবে মুসলিম লীগ ও হিন্দু তফসিলী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের দাবি করা হয়। বৈঠকে জিন্নাহ তাঁর চৌদ্দ দফা দাবি পুনরুল্লেখ করেন। এ নিয়ে হিন্দু প্রতিনিধিদের সাথে মতবিরোধ এবং কংগ্রেসের এ বৈঠক বর্জন করায় ৫ দিন আলোচনার পর গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন মুলতবি হয়ে যায়।

### দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক

গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন মুলতবি হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদানে সম্মত করার চেষ্টা করেন। এজন্য ১৯৩১ সালে কংগ্রেস নেতা গান্ধীর সাথে বড়লাট আরউইন এক চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির পর গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। ৭ সেপ্টেম্বর অধিবেশন শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একক প্রতিনিধিরূপে বৈঠকে যোগ দেন। কিন্তু ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাসহ সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে গান্ধী এবং মুসলিম ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে মতপার্থক্যের কারণে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকও ব্যর্থ হয়। ৩১ ডিসেম্বর অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

### সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ও তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেরা নিজেদের জন্য গ্রহণযোগ্য কোন শাসনতান্ত্রিক ফর্মূলা বের করতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া এ সময় গান্ধী পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। গান্ধীসহ বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ অবস্থায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২ সালের ১৬ আগস্ট ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের লক্ষে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বা সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ঘোষণা করেন। এ রোয়েদাদে মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও হরিজনসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ পৃথক নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়। এ রোয়েদাদ ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিতর্কের ঝড় তোলে। কংগ্রেস এর তীব্র

নিন্দা এবং একে জাতির রাজনৈতিক সংহতি বিন্যাসের চক্রান্ত বলে অভিহিত করে। দাবির তুলনায় প্রদত্ত সুবিধা অপ্রতুল হলেও মুসলিম লীগ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এ রোয়েদাদ মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেয়।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ নিয়ে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর উপরোক্ত মিশ্র প্রতিক্রিয়ার পটভূমিতে গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন আহুত হয়। ১৯৩২ সালের ১৭ নভেম্বর হতে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন চলে। এ অধিবেশনে ভারতের মাত্র ৪৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কংগ্রেস এ অধিবেশনে কোন প্রতিনিধি পাঠায়নি। যা হোক তিনটি বিষয় এ বৈঠকে প্রাধান্য পায়; যথা- (ক) দেশীয় রাজ্যগুলোর ফেডারেশনে যোগদানের শর্তাবলি (খ) অবশিষ্ট ক্ষমতার বণ্টন এবং (গ) ব্রিটিশ শাসনের রক্ষা-কবচ। আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এ বৈঠকের গৃহীত অধিকাংশ সিদ্ধান্তই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়।

**সার-সংক্ষেপ**

ভারতের রাজনৈতিক সংকটময় মুহূর্তে সাইমন কমিশন গঠন, ব্রিটিশ সরকারের ভারতকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দানের ঘোষণা, নেহেরু রিপোর্ট ও জিন্নাহর চৌদ্দ দফা ঘোষণার পটভূমিতে গান্ধী ভারতে স্বরাজ আদায়ের লক্ষে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। অবশ্য এ আন্দোলন স্বরাজ অর্জনে ব্যর্থ হয়। এসময় ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসন এবং ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা নির্ধারণের জন্য ব্রিটিশ সরকার লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে। ১৯৩০-৩২ সাল পর্যন্ত গোলটেবিল বৈঠকের তিনটি অধিবেশন হয়। কিন্তু কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্যের কারণে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.৫

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয়—
   ক. খাজনা বন্ধের মাধ্যমে
   খ. লবণ আইন ভঙ্গের মাধ্যমে
   গ. আদালত বর্জনের মাধ্যমে
   ঘ. বিলাতি পণ্য বর্জনের মাধ্যমে

২. আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়—
   ক. ১৯৩১ সালে
   খ. ১৯৩২ সালে
   গ. ১৯৩৩ সালে
   ঘ. ১৯৩৪ সালে

৩. গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়—
   ক. ডাণ্ডিতে
   খ. প্যারিসে
   গ. লন্ডনে
   ঘ. কলকাতায়

৪. দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের পক্ষে যোগদান করেন—
   ক. জওহরলাল নেহেরু
   খ. ড. আম্বেদকার
   গ. এম.কে. গান্ধী
   ঘ. তেজ বাহাদুর সাপ্রু

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. গান্ধী ভারতের পূর্ণ _____ প্রতিষ্ঠার দাবিতে _____ আন্দোলন শুরু করেন।
২. গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন বসে _____ নভেম্বর _____ সালে।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতে আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।
২. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করেন।
৩. তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩২ সালে।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. কত সালে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়।
২. কে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করেন?
৩. তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা কত ছিল?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি কি কি ছিল?
২. গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
৩. সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।
৪. গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফল কি হয়েছিল?

## পাঠ-৬ : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ যে অবস্থায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়েছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ এ আইন সম্পর্কে ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করতে পারবেন।

ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ আইন ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহকে খুশি করতে না পারলেও ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত এটি কার্যকর ছিল। স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানে নিজস্ব পৃথক সংবিধান তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এ আইন সংশোধিত আকারে বলবৎ থাকে।

### ৬.১ ভারত শাসন আইনের পটভূমি

১৯৩০ সালে ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় সাইমন কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমূহ তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে ভারতে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংকট নিরসন ও ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য ব্রিটিশ সরকার গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের তিনটি অধিবেশন হয়। তবে এতে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। বরং ইতোমধ্যে ঘোষিত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার আলোকে একটি শ্বেতপত্র প্রাকাশ করে। সাইমন কমিশন রিপোর্ট ও এ শ্বেতপত্রের আলোকে ১৯৩৪ সালে একটি পার্লামেন্টারী যুক্ত বাছাই কমিটি ভারতের জন্য একটি নতুন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করে। এ খসড়ার ভিত্তিতেই ১৯৩৫ সালের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় হাউসে (লর্ডস সভা ও কমন্স সভা) ভারতের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। ১৯৩৫ সালের ২ আগস্ট ব্রিটিশ রাজা আইনটিতে স্বাক্ষর দান করেন। ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এ আইনটিই বিখ্যাত 'ভারত শাসন আইন' নামে পরিচিত।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি জটিল ও সুবৃহৎ দলিল। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ–

### ৬.২ এ আইনের বৈশিষ্ট্য

ক. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ নিয়ে একটি নিখিল ভারত ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়। তবে ফেডারেশনে দেশীয় রাজ্যগুলোর যোগদান স্বেচ্ছাধীন করা হয়।

খ. এ আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব। এ প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রের শাসনকার্য 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' এ দুভাগে ভাগ করা হয়। সংরক্ষিত বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ধর্ম সংক্রান্ত ও উপজাতীয় অঞ্চলের প্রশাসন। সংরক্ষিত বিষয়গুলোর প্রশাসনভার ছিল গভর্নর জেনারেল ও তাঁর ৩ সদস্যের উপদেষ্টাদের হাতে। অন্যদিকে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মন্ত্রীপরিষদের সহযোগিতায় পরিচালনার বিধান রাখা হয়।

গ. ১৯৩৫ সালের আইনে কেন্দ্রে একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠনের কথা বলা হয়। এর উচ্চকক্ষটি হবে রাষ্ট্র সভা এবং নিম্নকক্ষ ব্যবস্থা পরিষদ।

ঘ. এ আইনে মোট ১১ টি গভর্নর শাসিত প্রদেশের ছয়টিতে কেন্দ্রের মতো দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা এবং বাকি পাঁচটিতে এককক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয়।

ঙ. এ আইনে ১৯৩২ সালের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। অর্থাৎ এ আইন অনুযায়ী মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

চ. ১৯৩৫ সালের আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল প্রদেশসমূহে দ্বৈত শাসনের পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব। এ আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক গভর্নর আইন সভার সদস্যদের মধ্য থেকে একটি মন্ত্রীসভা গঠন করবেন। অতঃপর এ মন্ত্রীসভার সহযোগিতায় গভর্নর প্রদেশের শাসন কার্য পরিচালনা করবেন।

তাছাড়া এ আইনে ভারত সচিবের কাউন্সিল বিলুপ্ত, বার্মাকে ভারত থেকে পৃথক, সিন্ধু ও উড়িষ্যা নামে দুটি নতুন প্রদেশ গঠন এবং একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

**৬.৩ ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিক্রিয়া**

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষণীয়। এ আইনের ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনাটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ ও অকার্যকর। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান রাখা হলেও প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। প্রাদেশিক গভর্নরের ভেটো ক্ষমতার জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি অর্থহীন প্রহসনে পরিণত হয়। ভারতের কোন রাজনৈতিক দলই এ আইনে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কংগ্রেস এ আইনের তীব্র সমালোচনা করে। কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরু একে 'দাসত্বের এক নতুন অধ্যায়' বলে অভিহিত করেন। হিন্দু মহাসভাও এ আইন সমর্থন করেনি। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ আইনে ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তবে তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধানগুলো সমর্থন করেন।

**সার-সংক্ষেপ**

সাইমন কমিশন রিপোর্ট ও গোলটেবিল বৈঠক ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্তন করেন। এ আইনে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান করা হলেও প্রদেশে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা হয়নি। এসব কারণে এ আইন ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.৬

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাস করে—
   ক. ভারতের গভর্নর জেনারেল
   খ. ব্রিটিশ পার্লামেন্ট
   গ. কলকাতা কাউন্সিল
   ঘ. ভারত সচিবের কাউন্সিল

২. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে—
   ক. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বাবস্থা
   খ. দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা
   গ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
   ঘ. এককেন্দ্রিক শাসন

৩. ১৯৩৫ সালের আইনে ভারত থেকে পৃথক করে—
   ক. সিন্ধুকে
   খ. পাঞ্জাবকে
   গ. নেপালকে
   ঘ. বার্মাকে

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ১৯৩৫ সালের আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রে _____ প্রতিষ্ঠা।
২. কংগ্রেস নেতা _____ ১৯৩৫ সালের আইনকে দাসত্বের এক নতুন অধ্যায় বলে আখ্যায়িত করেন।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. ১৯৩৫ সালের আইনে দেশীয় রাজ্যগুলোর জন্য ভারতীয় ফেডারেশনে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়।

২. ১৯৩৫ সালের আইন ভারতের কোন রাজনৈতিক দলকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. ১৯৩৫ সালের আইনে কেন্দ্রে কত কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠনের প্রস্তাব করা হয়?
২. ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হওয়া ১৯৩৫ সালের আইনকে চূড়ান্ত স্বাক্ষর করেন?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি আলোচনা করুন।
২. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১৩

**বিশদ উত্তর প্রশ্ন**

১. লক্ষ্মৌ চুক্তির বিষয়বস্তু বর্ণনা করে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
২. ভারতে খিলাফত আন্দোলনের একটি বিররণ দিন।
৩. বেঙ্গল প্যাক্টের পটভূমি, বিষয়বস্তু ও এর প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
৪. নেহেরু রিপোর্টের পটভূমি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। এ রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল?
৫. জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৬. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ইউনিট ১৪

# বিভাগ-পূর্ব রাজনীতি (১৯৩৭-১৯৪৭)

## ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর ৩০ -এর দশকে ভারতে হিন্দু-মুসলিম বিভেদের পটভূমিতে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রদত্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ যখন ব্যর্থ হয়, তখন ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রর্বতন করেন। এ আইন প্রবর্তনের পর ভারতের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভারতে দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলমানরা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। এ সময় ভারতের রাজনীতি সুস্পষ্টভাবে অনৈক্যের দিকে ধাবিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯৩৯-১৯৪৫) ব্রিটিশ সরকার একটি শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে উপমহাদেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করে। কিন্তু সরকারের কোন চেষ্টাই সফল হয়নি। হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটলে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা দানে বাধ্য হয়। ভারত বিভক্ত হয়, অভ্যুদয় ঘটে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি রাষ্ট্রের। এই ইউনিট পাঠ শেষে আপনি ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচন, লাহোর প্রস্তাব ও এর পরবর্তী সময়ে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধানের নানা চেষ্টা সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং ভারত বিভক্তির পটভূমি আলোচনা করতে পারবেন।

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ–


➔ পাঠ ১ : ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন এবং বাংলার রাজনৈতিক দলসমূহ

➔ পাঠ ২ : বঙ্গীয় মন্ত্রীসভা (১৯৩৭-১৯৪৭)

➔ পাঠ ৩ : লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০)

➔ পাঠ ৪ : ক্রীপস প্রস্তাব ও পরবর্তী রাজনীতি (১৯৪২-৪৬ সাল)

➔ পাঠ ৫ : ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা (১৯৪৬)

➔ পাঠ ৬ : স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ (১৯৪৭)

➔ পাঠ ৭ : ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন : স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

## পাঠ-১ : ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন এবং বাংলার রাজনৈতিক দলসমূহ

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ নির্বাচনের ফলাফল ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

### ১.১ ১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলসমূহ

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন বাংলার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৯৩৬ সাল হতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো সারা বাংলায় নির্বাচনের তোড়জোর আরম্ভ হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলায় তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক দল তিনটি হচ্ছে–

ক. জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন পুনর্গঠিত মুসলিম লীগ;
খ. এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-প্রজা পার্টি এবং
গ. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

উল্লেখ্য যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ছিল জাতীয় ভিত্তিতে গঠিত সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন। অন্যদিকে কৃষক-প্রজা পার্টি ছিল সম্পূর্ণভাবে পৃথক এবং প্রদেশ পর্যায়ে গঠিত বাংলার একটি রাজনৈতিক সংগঠন।

### ১.২ কৃষক-প্রজা পার্টি

১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি সংগঠন স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে নির্বাচনী প্রচারণায় লিপ্ত হয়। কৃষক-প্রজা পার্টিও ১৪ দফা কর্মসূচি সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এসময় সংগঠন হিসেবে বাংলায় কৃষক-প্রজা পার্টি যথেষ্ট সক্রিয় ও শক্তিশালী ছিল। ১৯২৯ সালে স্যার আবদুর রহিম 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন করেন। ১৯৩৫ সালে এ. কে. ফজলুল হক এ দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে প্রজা সমিতির নতুন নামকরণ করা হয় 'কৃষক-প্রজা পার্টি'। কৃষক-প্রজা পার্টি গঠনের মাধ্যমে বাংলার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্দোলনের প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে। এ দেশের রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় অতি অল্প দিনের মধ্যে কৃষক-প্রজা পার্টি গ্রাম বাংলার মেহনতি মানুষের জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৯৩৬ সালে এ দলের পক্ষ থেকে 'চৌদ্দ দফা' নামক একটি ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। এ ইশতেহারের প্রধান বিষয়গুলো ছিল- বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, খাজনার হার কমানো, নযর ও সেলামী রহিতকরণ, ঋণ শালিসি বোর্ড গঠন, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি।

### ১.৩ ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি ও নিউ মুসলিম মজলিশ পার্টি

১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৩৬ সালে নবাব হাবিবুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে রক্ষণশীল মুসলিম নেতৃবৃন্দ কলকাতায় 'ইউনাইডেট মুসলিম পার্টি' নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল অভিজাত উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, রক্ষণশীল মুসলিম নেতা ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের দল। সোহরাওয়ার্দী এই দলে যোগদানের ফলে এ দল বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তিনি এটিকে গণমুখী সংগঠন করার জন্য জমিদার, শ্রমিক, প্রজা, মালিক তথা সকল শ্রেণীর লোককে এতে যোগদানের আহ্বান জানান। বিবাদমান মুসলিম দলগুলোকেও কলহ পরিহার করে এতে যোগদানের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। কৃষক প্রজা-পার্টির সাথেও এ দল আপোষ করতে প্রস্তুত ছিল। যদিও নেতৃত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। প্রায় একই সময় কলকাতায় ডা. রফি আহম্মদ, হাসান ইস্পাহানী প্রমুখ 'নিউ মুসলিম মজলিশ' নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পরে অবশ্য এ দুটি দল মুসলিম লীগের সাথে একত্রিত হলে মুসলিম লীগ পুনর্গঠিত হয়।

### ১.৪ পুনর্গঠিত মুসলিম লীগ

জিন্নাহ্‌র লন্ডনে স্বেচ্ছা নির্বাসন, সংকীর্ণ দলাদলি ও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ-এর দশকের শুরুতে মুসলিম লীগ দুর্বল ও মৃত প্রায় একটি সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৪ সালের শেষ দিকে জিন্নাহ দেশে ফিরে এসে এর স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এর পুনর্গঠন কাজ শুরু করেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচন সামনে রেখে তিনি মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারণার জন্য ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সবগুলো প্রদেশ সফর করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলকাতায়

আসেন এবং মুসলিম নেতৃত্বাধীন দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি, নিউ মুসলিম মজলিশ এবং কৃষক-প্রজা পার্টির সাথে আলোচনা করে আসন্ন নির্বাচনে মুসলিম লীগের অধীনে নির্বাচনের প্রস্তাব দেন। ফজলুল হকের ব্যক্তিগত সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কৃষক-প্রজা পার্টি ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেনি। কেননা কৃষক-প্রজা পার্টির অন্যতম নির্বাচনী ইশতেহার ছিল 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ'। কিন্তু ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি ও মুসলিম লীগের অভিজাত ভূস্বামী শ্রেণী এ দাবি মেনে নিতে রাজি না হওয়ায় প্রজা-পার্টি তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র ইস্যু নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেয়। এমতাবস্থায় ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির সমন্বয়ে পুনর্গঠিত মুসলিম লীগ স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়।

### ১.৫ ১৯৩৭ সালের নির্বাচন ও এর ফলাফল

১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই ভারতের জন্য অধিকতর রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবি করে নির্বাচনী প্রচারণায় অবতীর্ণ হয়। অন্যদিকে কৃষক-প্রজা পার্টি কৃষকদের দুর্দশা অবসানের জন্য জমিদারি প্রথার অবসানসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে। ফলে কৃষক-প্রজা পার্টির কর্মসূচি সহজেই গ্রামীণ সাধারণ জনমানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ফজলুল হকের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাও কৃষক-প্রজা পার্টির প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ২৫০টি। তন্মধ্যে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ছিল ১২১টি আসন। সংরক্ষিত এ আসনগুলোর জন্য বাংলার মানুষ প্রধান দুটো দলে বিভক্ত হয়। একদিকে অসাম্প্রদায়িক কৃষক-প্রজা পার্টি এবং অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ও অভিজাতদের সংগঠন মুসলিম লীগ। নির্বাচনে উভয় দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। নির্বাচনের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ :

| ক্রমিকন ং | রাজনৈতিক দল | প্রাপ্ত আসন সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১. | কৃষক-প্রজা পার্টি | ৩৮ |
| ২. | মুসলিম লীগ | ৪০ |
| ৩. | নির্দলীয় মুসলমান | ৪১ |
| ৪. | কংগ্রেস | ৬০ |
| ৫. | ইউরোপীয় | ২৫ |
| ৬. | নিদর্লীয় নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু | ২৩ |
| ৭. | নিদর্লীয় বর্ণ হিন্দু | ১৪ |
| ৮. | নিদর্লীয় অতিরিক্ত | ১২ |

উল্লেখ্য যে, স্বতন্ত্র সদস্যদের অধিকাংশ মুসলিম লীগে এবং কিছু সংখ্যক কৃষক-প্রজা পার্টিতে যোগ দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৯ এবং কৃষক-প্রজা পার্টি ৫৫ তে।

### ১.৬ গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরাট সাফল্য লাভ করে। যদিও পাঞ্জাব এবং সিন্ধুতে তাদের এত সাফল্য অর্জিত হয়নি। বাংলায় তাদের এ সাফল্যের কারণ ছিল—

ক. মুসলিম লীগের প্রার্থীদের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা।
খ. নির্বাচনী প্রচারণার জন্য নিজস্ব তহবিল।
গ. দৈনিক আজাদ ও স্টার অব ইন্ডিয়ার মতো জনপ্রিয় পত্রিকাগুলোর মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারণা।
ঘ. শিক্ষিত সচেতন মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র সমাজের মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগকে সমর্থন দান, এবং
ঙ. সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ইত্যাদি।

তবে নির্বাচনে মুসলিম লীগের এ সাফল্য কিছুটা হলেও ম্লান হয়েছিল দলের প্রভাবশালী নেতা খাজা নাজিম উদ্দিনের নিজ জমিদারি পটুয়াখালীতে শোচনীয় পরাজয়। কৃষক-প্রজা পার্টির এ. কে. ফজলুল হক তাঁকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। নাজিম উদ্দিনের এ পরাজয় ফজলুল হকের গ্রাম বাংলায় বিপুল জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। কৃষক-প্রজা পার্টির প্রতিনিধিগণও সাধারণ মানুষের আস্থা লাভ করেছিল। তাদের ঘোষিত 'ডাল-ভাত' কর্মসূচি ছিল মূলত দরিদ্র জনগোষ্ঠীরই

কর্মসূচি। এ নির্বাচনে আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো মুসলিম রাজনীতিতে অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব হ্রাস এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা লাভ।

**সার-সংক্ষেপ**

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে ভারতে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় কৃষক-প্রজা পার্টি প্রধান দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে মুসলিম সংরক্ষিত আসনসমূহে কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং উভয় দল প্রায় সমসংখ্যক আসন লাভ করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত মুসলমান নেতাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.১

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হক যে দলের প্রধান ছিলেন—

ক. কৃষক-শ্রমিক পার্টি খ. কৃষক-প্রজা পার্টি
গ. গণতন্ত্রী পার্টি ঘ. মুসলিম লীগ

২. ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ফজলুল হকের নিকট পরাজিত হন মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা—

ক. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ. শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. খাজা নাজিম উদ্দিন ঘ. মাওলানা আকরম খাঁ

৩. ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা—

ক. ৩৮ টি খ. ৬০ টি
গ. ৫০ টি ঘ. ৫৫ টি

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. কৃষক-প্রজা পার্টি _____ ইশতেহার প্রকাশ করে।
২. ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে _____ সালে ভারতে _____ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
২. ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. ১৯৩৬ সালে নবাব হাবিবুল্লাহ প্রমুখের নেতৃত্বে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নাম কি?
২. ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা কত ছিল?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফলের বর্ণনা দিন ।

## পাঠ-২ : বঙ্গীয় মন্ত্রীসভা (১৯৩৭-১৯৪৭)

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- ☞ ১৯৩৭-১৯৪৭ সালের মধ্যে বঙ্গীয় মন্ত্রীসভাসমূহের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ বিভিন্ন মন্ত্রীসভার কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ বঙ্গীয় রাজনীতিতে মন্ত্রীসভার কার্যাবলির প্রভাব প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল বাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের উত্থান ঘটে, হিন্দুদের কাছ থেকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাতে চলে আসে। আলোচ্য কালপর্বে বাংলায় চারটি মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন হয়- ক. ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রীসভা (১৯৩৭-১৯৪১), খ. ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা (১৯৪১-১৯৪৩), গ. নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভা (১৯৪৩-১৯৪৫) এবং ঘ. সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা (১৯৪৬-১৯৪৭)। নিম্নে উক্ত মন্ত্রীসভাসমূহের গঠন, কার্যাবলি ও বাংলার রাজনীতিতে এর প্রভাব প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হলো।

### ২.১ ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রীসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

**মন্ত্রীসভার গঠন**

পূর্ববর্তী পাঠের আলোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে বাংলায় কোয়ালিশন সরকার গঠন অনিবার্য হয়ে পড়ে। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে, কৃষক-প্রজা পার্টি মুসলিম লীগ ও স্বতন্ত্র মুসলিম সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় কাছাকাছি। তবে বাংলায় ফজলুল হকের ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা ও প্রজা আন্দোলনের শক্তি ইত্যাদি বিবেচনায় বাংলার গভর্নর ফজলুল হককে মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মুসলমান সদস্যদের ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রবল জনমত থাকলেও ফজলুল হক প্রথমে কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব কৃষক-প্রজা পার্টির সাথে মন্ত্রীসভা গঠনে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। এমতাবস্থায় কাল বিলম্ব না করে মুসলিম লীগ ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন একটি মন্ত্রীসভা গঠনে তাদের সম্মতির কথা জানালে ফজলুল হক ও তার দল কৃষক-প্রজা পার্টি এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রায় তিন সপ্তাহ সময় নিয়ে ফজলুল হক ১১ সদস্যের একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠন করেন। মন্ত্রীসভা ছিল নিম্নরূপ :

| নাম | রাজনৈতিক সংগঠন | দপ্তর |
|---|---|---|
| ১. এ. কে. ফজলুল হক | কৃষক-প্রজা পার্টি | মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় |
| ২. খাজা নাজিম উদ্দিন | মুসলিম লীগ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| ৩. নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ | মুসলিম লীগ | কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয় |
| ৪. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী | মুসলিম লীগ | বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রণালয় |
| ৫. সৈয়দ নওশের আলী | কৃষক-প্রজা পার্টি | জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় |
| ৬. নবাব মোশাররফ হোসেন | স্বতন্ত্র মুসলিম | বিচার ও আইন মন্ত্রণালয় |
| ৭. নলিনী রঞ্জন সরকার | বর্ণ হিন্দু | অর্থ মন্ত্রণালয় |
| ৮. বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় | বর্ণ হিন্দু | রাজস্ব মন্ত্রণালয় |
| ৯. মহারাজা শশী চন্দ্র নন্দী | বর্ণ হিন্দু | যোগাযোগ ও পূর্ত মন্ত্রণালয় |
| ১০. প্রসন্নদেব রাইকত | তফসিলী হিন্দু | শুল্ক ও বন মন্ত্রণালয় |
| ১১. মুকুন্দ বিহারী মল্লিক | তফসিলী হিন্দু | সমবায়, ঋণ ও পল্লী-দারিদ্র্য মন্ত্রণালয় |

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় যোগদান করেনি। ১১ সদস্যের মন্ত্রীসভায় ৬ জন ছিলেন মুসলমান। তন্মধ্যে কৃষক-প্রজা পার্টির ছিলেন মাত্র ২ জন। এ নিয়ে কৃষক-প্রজা পার্টিতে প্রথমে অসন্তোষ এবং পরে প্রকাশ্যে বিভক্তি দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত কৃষক-প্রজা পার্টির সংসদীয় শাখা এবং মূল সংগঠন দুটোই আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সম্মিলিত মন্ত্রীসভাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মন্ত্রীসভার স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য ফজলুল হক ১৯৩৭ সালের ১৫ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম লীগে যোগ দেন। তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি এবং সোহরাওয়ার্দী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

**হক মন্ত্রীসভার কার্যকাল**

মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করায় ফজলুল হককে কৃষক-প্রজা পার্টির অন্যতম কর্মসূচি 'বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ' সহ কিছু বিষয়ে ছাড় দিতে হয়। এ বিষয়ে ১৯৩৮ সালে 'ফ্লাউড কমিশন' নামে একটি কমিশন গঠিত হলেও দেশ বিভাগের পূর্বে কোন সরকারই জমিদারি প্রথা উচ্ছেদে কোন কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। আসলে এ মন্ত্রীসভাকে বহু সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল। তথাপি কৃষক ও বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানদের স্বার্থে হক মন্ত্রীসভা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস ও কৃষকদের অধিকার বৃদ্ধি এবং কৃষকদের করভার লাঘবের জন্য এ মন্ত্রীসভার উদ্যোগে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) আইন (১৯৩৮) এবং কৃষিখাত আইন (১৯৩৮) পাস করা হয়। এই সময় ঋণ শালিসি বোর্ড গঠন করে কৃষকদের ঋণভার লাঘবের চেষ্টা করা হয়। ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় চাকরি নিয়োগ বিধি প্রবর্তন করে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪০ সালে মহাজনী আইনের মাধ্যমে মহাজনদের লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন এবং সুদের হার নির্দিষ্ট করা হয়। এ ছাড়াও রাজবন্দিদের মুক্তি, হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণসহ হক মন্ত্রীসভা আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পন্ন করে।

**বাংলার রাজনীতিতে প্রভাব**

নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হক মন্ত্রীসভা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ বাংলার মুসলিম জনমতকে প্রভাবিত করে। তবে এ কৃতিত্বের সুফল মুসলিম লীগের পক্ষে যায়। সংগঠনগতভাবে মুসলিম লীগও এ কৃতিত্বকে পুরোপুরি নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে। ফলে মুসলিম লীগের গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তাকে আরো বৃদ্ধি করে এবং এর অগ্রগতি হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য।

**প্রথম হক মন্ত্রীসভার পতন**

মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে বিশেষ করে জিন্নাহর সাথে ফজলুল হকের মতবিরোধ ১৯৪০ সাল থেকেই শুরু হয়। প্রাদেশিক ব্যাপারে জিন্নাহর অযাচিত হস্তক্ষেপ ছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের সহযোগিতার নীতির প্রশ্নে মতবিরোধ তীব্র হয়। জিন্নাহ ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধনীতির সমর্থন বিরোধী। ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ সরকার 'জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল' গঠন করে ফজলুল হকসহ মুসলিম লীগের তিন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীর নাম এতে যুক্ত করে। জিন্নাহ এক্ষেত্রে তিন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীকে কাউন্সিল হতে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। পাঞ্জাব ও আসামের মুখ্যমন্ত্রী জিন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী পদত্যাগ করলেও ফজলুল হক অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এতে মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করে। এ সময় সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথেও ফজলুল হকের তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ফজলুল হক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিল হতে পদত্যাগ করেন। ১৯৪১ সালের ১ ডিসেম্বর তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকেও পদত্যাগ করেন। ফলে প্রথম হক মন্ত্রীসভার পতন ঘটে।

## ২.২ ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা (১৯৪১-১৯৪৩)

**প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠন**

জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও অবাঙালি প্রাদেশিক নেতৃত্বের সাথে চরম মতবিরোধের পটভূমিতে ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। এরপর ফজলুল হক তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট তফসিলি হিন্দু এবং কৃষক-প্রজা পার্টির সমন্বয়ে 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি' নামে একটি নতুন সম্মিলিত দল গঠন করেন। এ দলের উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ও বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

**দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভা গঠন**

আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ফজলুল হকের প্রতি সমর্থন থাকায় ১৯৪১ সালের ১০ ডিসেম্বর বাংলার গভর্নর ফজলুল হককে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। ১১ ডিসেম্বর প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির উপ নেতা শরৎ বসু গ্রেপ্তার হন। নতুন মন্ত্রীসভায় তাঁর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি ছিল চূড়ান্ত। কিন্তু তার গ্রেপ্তারের ফলে তাকে বাদ দিয়েই ফজলুল হক ১১ সদস্যের একটি পূর্ণ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। মন্ত্রীসভায় ৬ জন মুসলমান এবং ৫ জন হিন্দু সদস্য ছিলেন। হকের নতুন মন্ত্রীসভা পাঁচমিশালি দল নিয়ে গঠিত হয়। এ মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন মুসলিম লীগের পক্ষ ত্যাগকারী খাজা হাবিবুল্লাহ,

কৃষক-প্রজা পার্টির একাংশের নেতা শামসুদ্দিন আহমদ এবং হিন্দু মহা সভার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। শ্যামাপ্রসাদকে অর্থ-মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

**কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া**

হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা ১৯৪৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। কংগ্রেস এ মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়নি। এমনকি কংগ্রেসের হাইকমান্ড এ মন্ত্রীসভার ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখায়নি। প্রথম থেকেই মুসলিম লীগ এ মন্ত্রীসভাকে সুনজরে দেখেনি। মন্ত্রীসভায় মুসলিম বিদ্বেষী কট্টর সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অন্তর্ভুক্তিকে পুঁজি করে মুসলিম লীগ এ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে মুসলিম জনমত গঠনে তৎপর হয়। মুসলিম লীগের এ মন্ত্রীসভাকে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা নামে আখ্যায়িত করে। সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য মুসলিম লীগের নেতৃত্বে সারা বাংলায় ব্যাপক সফরের মাধ্যমে এ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। ফলে হক মন্ত্রীসভা মুসলিম জনমনে বিশেষ করে মধ্য শ্রেণী ও ছাত্রদের আস্থা হারায় এবং ক্রমশ অপ্রিয় হয়ে ওঠে।

**মন্ত্রীসভার কতিপয় পদক্ষেপ ও এর প্রতিক্রিয়া**

দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভার কতগুলো পদক্ষেপ জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মন্ত্রীসভার জন্য এর পরিণতি মারাত্মক হয়েছিল। মন্ত্রীসভা কর্তৃক রাজনৈতিক তৎপরতা রোধে 'জরুরি বিধি' প্রবর্তন, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল স্থগিতকরণ, সিভিল ডিফেন্স বিভাগে হিন্দুদের অধিকহারে চাকরি প্রদান, কিশোরগঞ্জ শহরে জামে মসজিদের সামনে হিন্দুদের গান-বাজনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং এতে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত হওয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি মুসলমানদের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। ফলে হকের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা মুসলিম সমাজে দারুণ অপ্রিয় হয়ে পড়ে।

**দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভার পতন**

১৯৪২ সালে গান্ধীর 'ভারত ছাড় আন্দোলন'কে কেন্দ্র করে বাংলায় ব্যাপক গণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। এর কিছুদিন আগে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর রহস্যজনক অন্তর্ধান এবং তাঁর 'আজাদ হিন্দু ফৌজের' তৎপরতা বাংলায় অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করে। বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। এ সময় মেদিনীপুরে কংগ্রেস সমর্থকদের উপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। বাংলায় তখন দারুণ খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এ সংকট মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে ফজলুল হক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফলে দ্বিতীয় হক মন্ত্রীসভার পতন ঘটে।

## ২.৩ নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভা (১৯৪৩-১৯৪৫)

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার পতনের পর গভর্নর হার্বার্ট মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা স্যার খাজা নাজিম উদ্দিনকে মন্ত্রীসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। ২৪ এপ্রিল তিনি ১৩ সদস্যের একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এ মন্ত্রীসভায় ৭ জন মুসলমান এবং ৬ জন হিন্দু (৩ জন বর্ণ হিন্দু এবং ৩ জন তফসিলি হিন্দু) সদস্য ছিলেন। কংগ্রেস এ মন্ত্রীসভায়ও যোগ দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ছাড়াও মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে খাজা শাহাব উদ্দিন, তমিজ উদ্দিন খান, নবাব মোশাররফ হোসেন, পুলিন বিহারী মল্লিক প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। এ মন্ত্রীসভায় সোহরাওয়ার্দী বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

**১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ**

নাজিম উদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বাংলায় ১৯৪৩ সালে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার শাসনামালেই বাংলায় খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল। নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভা গঠনের পর এ সংকট আরো তীব্র হয়। এ খাদ্য সংকটের পিছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। যথা—

ক. ব্রহ্মদেশ হতে চাল আমদানি বন্ধ হওয়া। বস্তুত জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ দখল হওয়ায় চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়।
খ. অনাবৃষ্টির ফলে দেশে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস।
গ. সেনাবাহিনীর জন্য সরকারের খাদ্যশস্য সংরক্ষণ নীতি এবং
ঘ. মুনাফা লোভী অসাধু ব্যবসায়ীদের মুজদদারী ইত্যাদি।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে কর্ডনিং প্রথার কারণে সরকার অন্যান্য প্রদেশ হতে খাদ্য আমদানি করতে ব্যর্থ হয়। ফলে দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং এতে ৩০ লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারায়। দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষার জন্য সোহরাওয়ার্দী

নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সরকারি উদ্যোগে বহু লঙ্গরখানা খোলা হয়। কলকাতা ও অন্যান্য শহরে রেশনিং প্রথা চালু করাসহ নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের তীব্রতা হ্রাস পায়।

**নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভার পতন**

বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা ছাড়া নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভা তার দুবছরের শাসনামলে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এ মন্ত্রীসভা মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিলটি হিন্দুদের বিরোধিতার কারণে পুনরায় পাস করাতে ব্যর্থ হয়। এ সময় মন্ত্রীসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির নানা অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এমনকি মুসলিম লীগের অভ্যন্তরেই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভার নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় মুসলিম সমাজে পাকিস্তান আন্দোলনের ব্যাপক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে হিন্দুরাও মন্ত্রীসভার প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে থাকে। এমত পরিস্থিতিতে ১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চ বাজেট বরাদ্দের উপর ভোটাভোটির সময় ২০ জন সরকার সমর্থক সদস্য বিরোধী শিবিরে যোগ দেয়। ফলে পরিষদে ১০৬-৯৭ ভোটে নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভার পতন ঘটে।

## ২.৪ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা ( ১৯৪৬-১৯৪৭)

**১৯৪৬ সালের নির্বাচন**

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শ্রমিক দল জয়লাভ করে। ইংল্যান্ডের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৬ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার ইতিহাসে এ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করে। মুসলিম লীগ বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নির্বাচনে মুসলিম লীগকে সমর্থন দেয়। মুসলিম লীগ হারিকেন প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয় এবং বঙ্গীয় আইন সভার ১২১ টি সংরক্ষিত মুসলিম আসনের ১১৪ টি আসনে জয়লাভ করে। এ. কে. ফজলুল হক মৃতপ্রায় কৃষক-প্রজা পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি নিজে এবং অপর তিনজন সহযোগী ছাড়া কৃষক-প্রজা পার্টির আর কেউ নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেনি।

**সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন**

১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল মুসলিম লীগ নেতা সোওয়াওয়ার্দী ৮ সদস্যের একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এ ৮ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন ছিলেন মুসলিম লীগ দলীয় এবং ১ জন তফসিলি হিন্দু। নভেম্বর মাসে অবশ্য মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণ করা হয়েছিল।

**সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার কার্যক্রম**

সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা ১৫ মাস ক্ষমতায় ছিল। এসময়ে তাদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য কোন আইনগত বিধান রচনা করা সম্ভব হয়নি। ভাগ চাষীদের 'তেভাগা আন্দোলন'কে সমর্থন করার জন্য বঙ্গীয় বর্গাদার নিয়ন্ত্রণ বিল আইন সভায় উত্থাপিত হলেও মুসলিম লীগের জোতদার সদস্যদের বিরোধিতায় তা ব্যর্থ হয়। জমিদারি বাতিল সংক্রান্ত 'ফ্লাউড কমিশন' রিপোর্টটি ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে আইন সভায় তোলা হলেও বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তা আইনে পরিণত হতে পারেনি।

**সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীসভার পতন**

প্রকৃতপক্ষে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার কার্যকাল ছিল বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্রান্তিকাল। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান, দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে এই অধ্যায়ের রাজনীতি আবর্তিত হয়। এই সময় 'কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং এ দাঙ্গা রোধে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার ব্যর্থতা, স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর অবস্থান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এ অবস্থায় বাংলার মুসলিম লীগের সংসদীয় নেতা নির্বাচনের জন্য ১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট যে ভোট হয় তাতে সোহরাওয়ার্দী খাজা নাজিম উদ্দিনের কাছে ৭৫-৩৯ ভোটে পরাজিত হন।

**সার-সংক্ষেপ**

১৯৩৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কাল বাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। এ সময় বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কালপর্বে চারটি মন্ত্রীসভা বাংলায় ক্ষমতাসীন হয়। তবে এ চারটি মন্ত্রীসভার মধ্যে ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রীসভা ছাড়া অন্য কোন মন্ত্রীসভা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বস্তুত এ কালপর্বটি বঙ্গ-ভারতের রাজনীতির একটি চূড়ান্ত ক্রান্তিকাল। এ সময় বাংলার ক্ষমতাসীন মন্ত্রীসভাগুলোকে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিত হতে হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন করেন—
   ক. শেখ মুজিবুর রহমান — খ. এ. কে. ফজলুল হক
   গ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ — ঘ. শামসুদ্দীন আহমদ

২. শাম্যাপ্রসাদ মুখার্জীর রাজনৈতিক দলের নাম—
   ক. হিন্দু মহাসভা — খ. কৃষক-প্রজা পার্টি
   গ. ভারতীয় কংগ্রেস — ঘ. ফরওয়ার্ড ব্লক

৩. বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল—
   ক. ১৯৪০ সালে — খ. ১৯৪২ সালে
   গ. ১৯৪৩ সালে — ঘ. ১৯৪৪ সালে

৪. সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার শাসনকাল ছিল—
   ক. ২৩ মাস — খ. ১৭ মাস
   গ. ১৩ মাস — ঘ. ১৫ মাস

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. এ. কে. ফজলুল হক ১৯৩৭ সালের ১৫ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে _____ যোগদান করেন।
২. ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল মুসলিম লীগ নেতা _____ নেতৃত্বে ৮ সদস্যের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. ১৯৩৭ সালে ফজলুল হক কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন।
২. নাজিম উদ্দিন মন্ত্রীসভার শাসনামলে ১৯৪৩ সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কে?
২. ১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ কয়টি আসন লাভ করেছিল?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. প্রথম হক মন্ত্রীসভার কার্যক্রম সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের প্রকৃতি আলোচনা করুন।
৩. ১৯৩৭ - ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ৪ টি বঙ্গীয় মন্ত্রীসভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

## পাঠ-৩ : লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০)

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- ☞ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ☞ লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

লাহোর প্রস্তাব ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা এ ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণের পর মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে তার স্বার্থক পরিণতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং পরে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

### ৩.১ লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি

লক্ষ্মৌ চুক্তি এবং পরবর্তীতে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সেতুবন্ধন রচনা করে। তবে আইন সভায় মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও স্বতন্ত্র নির্বাচন অধিকার প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে সমস্যা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। এ শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কয়েকটি উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করে। এ আইন ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তবে এ আইনের আওতায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকর করার জন্য ১৯৩৭ সালে যে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে প্রায় সকল রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশসমূহেও মুসলিম লীগ পরাজিত হয়। এমতাবস্থায় মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব করলে কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি মুসলিম লীগের সাথে কোনরূপ আলাপ-আলোচনা ছাড়াই কংগ্রেস মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ মন্ত্রীসভা গঠন করে। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। 'বন্দেমাতারাম'কে জাতীয় সংগীত হিসেবে প্রবর্তনের চেষ্টা, স্কুলসমূহের পাঠ্যসূচিতে হিন্দু ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্যকে বাধ্যতামূলককরণ, আযান নিষিদ্ধকরণ, নামাজের সময় মসজিদের সামনে দিয়ে বাধ্যযন্ত্রসহ মিছিল এবং সরকারি ভবনসমূহে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন ইত্যাদি মুসলিম অনুভূতিকে আহত করে। তদুপরি কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক ভারতে কেবল দুটি শক্তির- ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেসের অস্তিত্ব সংক্রান্ত ঘোষণা মুসলমানদের দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ করে। জিন্নাহ (যিনি এক সময় হিন্দু-মুসলিম মিলনের প্রবক্তা ছিলেন) নেহেরুর বক্তব্যের প্রতিবাদে তাঁর বিখ্যাত 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' ঘোষণা করেন। দ্বি-জাতিতত্ত্ব মতে, ভারতে হিন্দু-মুসলিম দুটি আলাদা জাতি। তাদের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং সাম্প্রদায়িক জটিলতা নিরসনে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন অপরিহার্য।

অবশ্য মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবি প্রথম উত্থাপন করেন আল্লামা ইকবাল ১৯৩০ সালে। ১৯৩৩ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঞ্জাবি ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে 'পাকিস্তান' নামক পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রাস্তব করেন। ১৯৩৯ সালে জিন্নাহ পুনরায় মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন।

### ৩.২ লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ ও এর মূল বক্তব্য

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লীগের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির বক্তৃতায় জিন্নাহ তাঁর দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর ২৩ মার্চ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক একটি প্রস্তাব পেশ করেন- যা ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। এই প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ—

- ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।
- পূর্বোক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের প্রদেশগুলো হবে স্বশাসিত ও সার্বভৌম।

- সর্বক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন স্বার্থ ও অধিকার রক্ষাকল্পে সংবিধানে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২৪ মার্চ প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগ অধিবেশনে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

**৩.৩ লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া**

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি হিন্দু ও কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। কংগ্রেস নেতা নেহেরু ও গান্ধী উভয়েই এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। গান্ধী তাঁর লেখায় লাহোর প্রস্তাবের সমালোচনা করেন এবং ভারত বিভাগকে পাপের সমতুল্য বলে মন্তব্য করেন। নেহেরু মুসলমানদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অবান্তর মন্তব্য করেন। হিন্দু সংবাদপত্র ও সাময়িকীসমূহ লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে আখ্যায়িত করে এর তীব্র সমালোচনা করে। যদিও মূল প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র গঠনের কথা উল্লেখ নেই। সেখানে স্টেটস (States) গঠনের কথা বলা হয়েছে। তবে ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের মধ্যে এক রাষ্ট্রের ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ দলীয় আইন সভার সদস্যদের এক সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়। এ দাবি অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি মাত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হয়।

**৩.৪ লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব**

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্ব সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। মুসলমানরা মুসলিম লীগের নেতৃত্বে তাদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। দীর্ঘদিনের জটিল শাসনতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষে ব্রিটিশ সরকার ও মুসলমানদের দাবি মেনে নেয়। ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র 'পাকিস্তানের' জন্ম হয়।

বাংলার যে মুসলমান সম্প্রদায় এতদিন পর্যন্ত নিজেদের আত্মপরিচয়ের সন্ধানে ছিল, তারা লাহোর প্রস্তাবে এর সন্ধান পায়। লাহোর প্রস্তাব তাদেরকে একটি জাতীয় চেতনা দান করে। ১৯৪৭ সালে পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলেও এ জাতীয় চেতনাই পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা যোগায়।

**সার-সংক্ষেপ**

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারতের এক জটিল রাজনৈতিক সংকটকালে ১৯৪০ সালে এ. কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এ প্রস্তাবের আংশিক পরিবর্তন করে পরবর্তীতে ভারতে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির স্বপ্ন পূরণ হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৩

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন—
   ক. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
   খ. এ. কে. ফজলুল হক
   গ. খাজা নাজিম উদ্দিন
   ঘ. শহীদ সোহরাওয়ার্দী

২. লাহোর প্রস্তাব ছিল—
   ক. স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রস্তাব
   খ. স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব
   গ. মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব
   ঘ. ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাব

৩. পাকিস্তান নামটির উদ্ভাবন করেন—
   ক. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
   খ. আল্লামা ইকবাল
   গ. এ. কে. ফজলুল হক
   ঘ. চৌধুরী রহমত আলী

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. দ্বি-জাতিতত্ত্ব মতে ভারতে _____ দুটি আলাদা জাতি।
২. ____ সালের ____ মার্চ এ. কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. আল্লামা ইকবাল দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা।
২. লাহোর প্রস্তাবে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চল নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা কে?
২. ভারত বিভাগকে পাপের সমতুল্য বলে কে মন্তব্য করেন?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য কি?
২. লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব ও ফলাফল আলোচনা করুন।

## পাঠ-৪ : ক্রীপস প্রস্তাব ও পরবর্তী রাজনীতি (১৯৪২-৪৬ সাল)

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ ক্রীপস মিশনের আগমন ও এর প্রস্তাব সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ ক্রীপস প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ☞ ক্রীপস প্রস্তাব পরবর্তী ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

### ৪.১ ক্রীপস প্রস্তাব (১৯৪২)

**ক্রীপস মিশন আগমনের পটভূমি**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পরপরই ভারতে 'প্রতিরক্ষা আইন' পাসের প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার পদত্যাগ, যুদ্ধে ব্রিটেনকে সর্বাত্মক সহায়তাদানে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের জার্মানি গমন এবং 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' গঠন ব্রিটিশ সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এসময় ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে নাজী আক্রমণ, দূরপ্রাচ্যে জাপানিদের বিজয় এবং তাদের হাতে মালয় ও বার্মার পতনের পর ব্রিটিশ সরকার বেকায়দায় পড়ে। তারা ভারতের নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। সর্বোপরি এসময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, চীনের মার্শাল চিয়াং কাইশেক, অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মি. ইভাত ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য চাপ দেয়।

**ক্রীপস মিশনের আগমন ও প্রস্তাব পেশ**

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ কমন্সসভার সদস্য এবং যুদ্ধ মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী স্যার স্ট্যাপোর্ড ক্রীপসকে ভারতে পাঠান। ক্রীপস ১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ দিল্লিতে এসে পৌঁছান। তিনি কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনার পর একটি শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব পেশ করেন। ইতিহাসে এ প্রস্তাব 'ক্রীপস প্রস্তাব' নামে পরিচিত। ক্রীপস প্রস্তাবের শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ :

**ক্রীপস প্রস্তাবের শর্তাবলি**

ক. ক্রীপস প্রস্তাবে বলা হয় যে, যুদ্ধ শেষ হবার পর ভারতকে ডোমিনিয়ন বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে।

খ. ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি গণ-পরিষদ গঠন করা হবে।

গ. প্রদেশগুলো ইচ্ছা করলে নতুন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবে অথবা বর্তমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামোই অক্ষুণ্ন রাখবে।

ঘ. ক্রীপস প্রস্তাবে অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের কথা বলা হয়। তবে দেশরক্ষা ও প্রতিরক্ষা বিভাগে পূর্বের ন্যায় ব্রিটিশ সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়।

**প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া**

ক্রীপস প্রস্তাব কংগ্রেস, মুসলিম লীগ বা হিন্দু মহাসভাসহ ভারতের কোন রাজনৈতিক দলকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কংগ্রেসের দাবি ছিল অবিভক্ত ভারত। তারা মনে করে ক্রীপস প্রস্তাবের অনিবার্য ফলস্বরূপ ভারত হিন্দু ও মুসলমান শাসিত দুটি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হবে। ক্রীপস প্রস্তাব পরোক্ষভাবে মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের মূলনীতি স্বীকার করলেও পরিকল্পনা কার্যকরের সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখসহ তাদের আরো কিছু দাবির স্বীকৃতি না থাকায় মুসলিম লীগও এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে ক্রীপস প্রস্তাব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

**গুরুত্ব ও ফলাফল**

ক্রীপস প্রস্তাবের নানা সীমাবদ্ধতা ছিল সন্দেহ নেই। তথাপি একথা বলা যায় যে, ভারতে এ যাবত উত্থাপিত যে কোন শাসনতান্ত্রিক ফরমূলার চেয়ে এটি ছিল অগ্রগামী। কেননা এ প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকার প্রথমবারের মতো ভারতের ডোমিনিয়ন মর্যাদার দাবি মেনে নেয়। ভারতীয়দের নিজস্ব সংবিধান প্রণয়নের অধিকার দেয় এবং এজন্য একটি গণপরিষদ গঠনের কাঠামো প্রদান করে। যদিও এসব ভারতীয়দের প্রত্যাশার তুলনায় নগণ্য ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাব ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ক্রীপস মিশন ব্যর্থ হয়।

### ৪.২ আগস্ট আন্দোলন

ক্রীপস মিশনের ব্যর্থতা গান্ধীর হাতকে শক্তিশালী করেছিল। এসময় জাপানিদের বার্মা দখলের পটভূমিতে গান্ধী ভারত থেকে ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানান। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ওয়ার্দ্ধায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা থেকেও এই দাবি পুনর্ব্যক্ত করা হয়। ১৯৪২ সালের ৭ আগস্ট কংগ্রেস কমিটিতে ভাষণদানকালে গান্ধী বলেন, 'স্বাধীনতা আকাশ থেকে ঝরে পড়বে না-লড়াই করে আমাদের স্বাধীনতা আনতে হবে।' গান্ধীর এ বক্তব্যের পর তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' দাবি ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলন দমনের জন্য বহু কংগ্রেস নেতা ও কর্মীকে কারারুদ্ধ এবং কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করে। ফলে দেশব্যাপী গণবিক্ষোভ শুরু হয়। এটিই 'আগস্ট আন্দোলন' নামে পরিচিত। এই আন্দোলন সারাদেশে ব্যাপক সহিংস আন্দোলনে রূপ নেয়। তুলনাহীন হিংসাত্মক হাঙ্গামা ও ব্যাপক নিষ্ঠুর তৎপরতায় প্রশাসনকে অচল করে দেওয়ার পদক্ষেপ নেয়া হয়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়। কংগ্রেসের বাইরের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব যেমন- মুসলিম লীগ, লিবারেল, হিন্দু মহাসভা, ন্যাশনাল ডেমোক্রেট, কমিউনিস্টরা এ আন্দোলন অনুমোদন করেনি। যা হোক, শেষ পর্যন্ত সরকার কঠোর হাতে এ আন্দোলন দমন করে। গান্ধীসহ বহু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়।

### ৪.৩ ১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ

ভারতের রাজনীতির উপরোক্ত পটভূমিকায় বাংলায়ও রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয়। ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার পতনের পর মুসলিম লীগ বাংলার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। খাজা নাজিম উদ্দিনের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এসময় বাংলায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সর্বনাশা এ দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারায়। অবশ্য লীগমন্ত্রী সভার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহু জীবন রক্ষা পায়।

### ৪.৪ লীগ-কংগ্রেস সমঝোতার প্রয়াস, ১৯৪৪

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ক্রীপস প্রস্তাব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এ সময় কংগ্রেস 'অখণ্ড ভারত' এবং মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির দাবিতে অটল থাকে। ভারতীয় রাজনীতির এ পটভূমিতে কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার রাজা গোপাল আচারী তাঁর দলকে মুসলিম লীগের দাবি বিবেচনা করে দেখার পরামর্শ দেন। ১৯৪৪ সালে গান্ধী-জিন্নাহর মধ্যে সমঝোতা বৈঠক হয়। কিন্তু এতে সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কোন সমঝোতায় পৌঁছতে পারেনি।

### ৪.৫ ১৯৪৬ সালের নির্বাচন

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র বাহিনী জয়লাভ করে। যুদ্ধ শেষে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে চার্চিলের রক্ষণশীল দলকে পরাজিত করে শ্রমিক দল ক্ষমতা দখল করে। মি. এ্যাটলী ক্লিমেন্ট নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী ১৯৪৬ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ আশাতীত সাফল্য লাভ করে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করে।

**সার-সংক্ষেপ**

১৯৪২-৪৬ সাল পর্যন্ত সময়কাল ভারতের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪২ সালে দূর প্রাচ্যে মিত্র বাহিনীর ভাগ্য বিপর্যয়ের পটভূমিতে আন্তর্জাতিক চাপ ও ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪২ সালে ক্রীপস মিশন প্রেরণ করে। ভারতের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য মিশন যে প্রস্তাব পেশ করে, তা 'ক্রীপস প্রস্তাব' নামে পরিচিত। কিন্তু ক্রীপস প্রস্তাব ভারতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগসহ কোন রাজনৈতিক দলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলে এটি ব্যর্থ হয়। এসময় কংগ্রেস ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করে। সরকার কঠোর হস্তে এ আন্দোলন দমন করেন। এসময় বাংলায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণহানী ঘটে। ১৯৪৪ সালে লীগ-কংগ্রেসের মধ্যে একটি সমঝোতা উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং ব্রিটেনে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয়। ১৯৪৬ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ আশাতীত সাফল্য অর্জন করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৪

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**
**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. স্ট্যাপোর্ড ক্রীপসকে ভারতে পাঠান—
ক. এ্যাটলী ক্লিমেন্ট খ. রামসে ম্যাকডোলাল্ড
গ. উইনস্টন ঘ. আরউইন

২. আগস্ট আন্দোলন হয়েছিল—
ক. ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে খ. ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে
গ. ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ঘ. ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে

৩. ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন—
ক. সোহরাওয়ার্দী খ. খাজা নাজিম উদ্দিন
গ. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ঘ. নওয়াব আলী চৌধুরী

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**
১. ক্রীপস ____ সালের ২৩ মার্চ _____ এসে পৌছান।
২. ১৯৪৪ সালে ____ ও ____ মধ্যে সমঝোতা বৈঠক হয়।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**
১. স্ট্যাপোর্ড ক্রীপস ছিলেন ভারত সচীব।
২. ১৯৪৪ সালে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যকার সমঝোতা প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**
১. স্ট্যাপোর্ড ক্রীপস কে ছিলেন?
২. কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে আগস্ট আন্দোলন হয়েছিল?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**
১. ক্রীপস প্রস্তাবের শর্তাবলী কি ছিল?
২. ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

## পাঠ-৫ : ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা (১৯৪৬)

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ৫.১ ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের পটভূমি

১৯৪২ সালের ক্রীপস প্রস্তাব ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়। 'অখণ্ড ভারত' নীতিতে কংগ্রেসের অটল অবস্থান এবং জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আপোষহীন দাবি ক্রীপস প্রস্তাবের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। ভারতের রাজনীতির এরূপ অবস্থায় কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার রাজা গোপাল আচারী তাঁর দলকে মুসলিম লীগের দাবি বিবেচনা করে দেখার পরামর্শ দেন। ১৯৪৪ সালে গান্ধী ও জিন্নাহর মধ্যে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন সমাধান হয়নি। ১৯৪৫ সালে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য সিমলায় সব রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনার বৈঠকে বসেন। কিন্তু এ বৈঠকও ব্যর্থ হয়।

এদিকে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ইংল্যান্ডে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শ্রমিক দল বিজয়ী এবং মি. এ্যাটলী প্রধানমন্ত্রী হন। শ্রমিল দল ভারতীয়দের স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। ক্ষমতা লাভের পরই নতুন প্রধানমন্ত্রী ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। একই সাথে শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের লক্ষে ভারতে একটি মিশন প্রেরণের ঘোষণা দেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত সচিব পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে তিন সদস্যের যে মিশন ভারতে পাঠান ইতিহাসে তা 'ক্যাবিনেট মিশন' বা 'মন্ত্রী মিশন' নামে পরিচিত। এ মিশনের অপর দুজন সদস্য ছিলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস এবং এ.ভি. আলেকজান্ডার।

### ৫.২ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা

১৯৪৬ সালের ২৪ মার্চ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে। মিশন পর্যায়ক্রমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগসহ রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা, প্রদেশসমূহের প্রধানমন্ত্রী, সংখ্যালঘু নেতা ও দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজাদের সাথে মতবিনিময় এবং এদের দাবি ও মতামত পর্যালোচনা করে ১৬ মে একটি নিজস্ব প্রস্তাব বা পরিকল্পনা পেশ করে, যা 'ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা বা প্রস্তাব' নামে পরিচিত। এ পরিকল্পনার রূপরেখা ছিল নিম্নরূপ :

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় ভারতে তিন স্তরবিশিষ্ট একটি ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়–

১. কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।
২. ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করা হবে। এ ইউনিয়নের হাতে থাকবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং মুদ্রা বিভাগ। অন্যান্য বিষয় থাকবে প্রদেশের হাতে।
৩. প্রদেশসমূহকে তিনটি বিশেষ গ্রুপে ভাগ করা হবে- ক. হিন্দু প্রধান প্রদেশ, খ. মুসলমান প্রদেশ এবং গ. বাংলা ও আসাম প্রদেশ। প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটি গণপরিষদ থাকবে।

ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, প্রত্যেক গ্রুপের সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে সমগ্র ভারতের জন্য একটি সংবিধান রচনা করবে। এ প্রস্তাবের শর্তারোপ করা হয় যে, এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলে পুরোটাই গ্রহণ করতে হবে, অংশবিশেষ গ্রহণ করা যাবে না।

### ৫.৩ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ভারতীয় রাজনীতিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কেননা এর মাধ্যমে ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে ব্রিটিশ নীতির সুস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই পরিকল্পনাটির খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণ করতে থাকে। এক কেন্দ্রীক সরকার গঠনের প্রস্তাবের মধ্যে কংগ্রেস 'অখণ্ড ভারত' প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেখতে পায়। তবে গ্রুপিং ব্যবস্থা তাদের অসন্তুষ্ট করে। অন্যদিকে গ্রুপিং ব্যবস্থায় মুসলিম লীগ খুশি হয়। কেননা এর মধ্যে তারা তাদের পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখে। তাই তারা ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কংগ্রেস গ্রুপিং ব্যবস্থা এবং

কেন্দ্রীয় সরকারের সদস্যদের মধ্যে লীগ ও কংগ্রেসের সংখ্যা সাম্য নীতি ছাড়া পরিকল্পনার অন্যান্য অংশে অংশগ্রহণ করে। যদিও পরিকল্পনার শর্ত মোতাবেক আংশিক গ্রহণের অবকাশ ছিল না। এমতাবস্থায় মুসলিম লীগ সরকার গঠনের সুযোগ দাবি করলে ব্রিটিশ সরকার গড়িমসি করতে থাকে। এ সময় কংগ্রেসের কার্য-কলাপ সম্পর্কেও লীগের সন্দেহ হয়। ফলে মুসলিম লীগও ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়। এতে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা কার্যত ব্যর্থ হয়।

**সার-সংক্ষেপ**

ক্রীপস প্রস্তাবের ব্যর্থতার পর ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধানে গান্ধী-জিন্নাহ আলোচনা ও সিমলা বৈঠক কোন ইতিবাচক ফলাফল আনতে পারেনি। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ইংল্যান্ডের শ্রমিক সরকারের নতুন প্রধানমন্ত্রী মি. এ্যাটলী ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের দায়িত্ব দিয়ে একটি ক্যাবিনেট মিশন পাঠান। এই মিশন যে পরিকল্পনা পেশ করে তাতে ভারতীয়দের কাছে ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি ছিল সুস্পষ্ট। অবশ্য এ পরিকল্পনা গ্রহণে কংগ্রেসের অসহযোগিতা এবং আংশিক গ্রহণের ইচ্ছা ইত্যাদি কারণে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৫

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়–

ক. ১৯৪২ সালে খ. ১৯৪৪ সালে

গ. ১৯৪৫ সালে ঘ. ১৯৪৬ সালে

২. ক্যাবিনেট মিশনের নেতৃত্ব দেন–

ক. লর্ড মাউন্ট ব্যাটন খ. এ.ভি. আলেকজান্ডার

গ. পেথিক লরেন্স ঘ. স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ____ সালের ____ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসে।

২. ____ ও _____ উভয়েই পরিকল্পনাটির খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করে।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

২. ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় ভারতে একটি তিন স্তরবিশিষ্ট ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. ক্যাবিনেট মিশনে নেতৃত্বদানকারী ভারত সচীবের নাম কি?

২. ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশসমূহকে কয়টি গ্রুপে ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়।

**ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দিন।

২. ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

## পাঠ-৬ : স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ (১৯৪৭)

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ ১৯৪৭ সালে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ এ উদ্যোগের প্রকৃতি আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ এ উদ্যোগের ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের প্রাক্কালে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন, সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এ উদ্যোগের সঙ্গে বাংলার কতিপয় প্রভাবশালী হিন্দু-মুসলিম নেতা একাত্মতা প্রকাশ করে। কিন্তু নানা কারণে এ উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়। যদি এ উদ্যোগটি সফল হতো তবে ভারত ও পাকিস্তানের সাথে অখণ্ড বাংলাও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হতো।

### ৬.১ অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের পটভূমি

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবল অস্থিরতা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। পাকিস্তান অর্জনের দাবিতে মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের দিন কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। ক্রমে এ দাঙ্গা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। এ সময় ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবিও তীব্র আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. এ্যাটলী ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণায় ভারত বিভক্তি এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঈঙ্গিত ছিল। এমতাবস্থায় কালবিলম্ব না করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশকে হিন্দু-মুসলিম এলাকায় বিভক্ত করার প্রস্তাব করে। হিন্দু মহাসভা বাংলাকে বিভক্ত করে হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে 'পশ্চিম বাংলা প্রদেশ' গঠন এবং একে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যুক্ত করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। কলকাতার বাঙালি-অবাঙালি শিল্প ও বণিক সমিতিসমূহ এ আন্দোলনের সমর্থনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে। হিন্দু মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহ এ ব্যাপারে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমন এক পরিস্থিতিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

### ৬.২ উদ্যোগের গতি-প্রকৃতি

১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন। তিনি দীর্ঘ বক্তৃতায় বাংলা বিভক্তির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতা কিরণ শংকর রায় এ উদ্যোগের প্রতি তাদের জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন। ১৯৪৭ সালের ২০ মে শরৎচন্দ্র ও সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে এ ব্যাপারে বাংলার হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়, যা বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব নামে পরিচিত।

### ৬.৩ বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু

বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবে বলা হয় যে, বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। এ স্বাধীন বাংলার শাসনতন্ত্রে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অনুপাতে আসন সংরক্ষণসহ যুক্ত নির্বাচন ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভা নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইনসভা ও মন্ত্রীসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলায় হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সকল চাকরিতে সমান অংশ থাকবে।

### ৬.৪ উদ্যোগের প্রতিক্রিয়া

সোহরাওয়ার্দীর স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের প্রতি বাংলার গভর্নর স্যার এফ. বারোজ এবং ভারত সচীব লিস্ট ওয়েলের পূর্ণ সমর্থন ছিল। ভারতের ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন প্রথমে এর বিরোধিতা করলেও পরে বারোজের প্রচেষ্টায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অঞ্চল নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন প্রধান লক্ষ্য হলেও নানা কারণে মুসলিম লীগ নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহও সোহরাওয়ার্দীর এ উদ্যোগে সম্মতি জানিয়েছিলেন। এ উদ্যোগের প্রতি কংগ্রেসের হাইকমান্ড বিশেষ করে নেহেরু ও প্যাটেলের প্রতিক্রিয়া আদৌ সহায়ক ছিল না। প্যাটেল এ পরিকল্পনাকে একটি ফাঁদ হিসেবে আখ্যায়িত করে হিন্দু ও কংগ্রেস নেতাদের এ ফাঁদে পা না দেওয়ার ব্যাপারে সর্তক করে দেন। হিন্দু

মহাসভার মনোভাবও এরূপই ছিল। সোহরাওয়ার্দী কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার বিরোধিতাকে 'পরাজিতের মানসিকতা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

### ৬.৫ স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের ব্যর্থতা

সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়। পণ্ডিতদের মতে, এ উদ্যোগের প্রতি প্রয়োজনীয় জনসমর্থন তৈরির জন্য পর্যাপ্ত সময়ের স্বল্পতা, হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের হাইকমান্ডের তীব্র বিরোধিতা এ উদ্যোগের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। তদুপরি উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এ উদ্যোগকে দুর্বল করে। তাছাড়া কংগ্রেস মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় পরিস্থিতি ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। ফলে স্বাধীন অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

**সার-সংক্ষেপ**

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতার পরে ভারতের এক অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. এ্যাটলী ভারতীয়দের স্বাধীনতা দানের ঘোষণা দেন। এমতাবস্থায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশিম সহ বাংলার অনেক প্রভাবশালী হিন্দু-মুসলিম নেতা এতে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। জিন্নাহ এমনকি ব্রিটিশ প্রশাসনও এ উদ্যোগের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এ উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলা বিভক্তির দাবি জানায়। তাদের অটল অবস্থানের কারণে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৬

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের কর্মসূচি দিয়েছিল—

ক. জাতীয় কংগ্রেস খ. মুসলিম লীগ
গ. কৃষক-প্রজা পার্টি ঘ. জমিয়ত-ই-ইসলাম দল

২. বসু-সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব ছিল—

ক. ভারতের স্বাধীনতার খ. ভারত বিভাগের
গ. স্বাধীন অখণ্ড বাংলার ঘ. বাংলা বিভক্তির

৩. বসু-সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবকে সমর্থন করেন বাংলার গভর্নর—

ক. স্যার এফ. বারোজ খ. লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন
গ. ব্যামফিল্ড ফুলার ঘ. এফ.জি. ল্যাংলী

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. পাকিস্তান অর্জনের দাবিতে _____ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কর্মসূচি ঘোষণা করে।
২. বাংলার মুখ্যমন্ত্রী _____ স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সোহরাওয়ার্দী।
২. কংগ্রেসের হাইকমান্ড স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা উদ্যোগকে সমর্থন জানান।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. বাংলার কোন মুখ্যমন্ত্রী স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন?
২. লিস্ট ওয়েল কে ছিলেন?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন।
২. স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের ব্যর্থতার কারণ কি?

## পাঠ-৭ : ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন : স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- ☞ ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ ভারত স্বাধীনতা আইনের মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রতি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ☞ স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যুদয় সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ১৯৪৭ সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ বছর ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এজন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন পাস করা হয়। ইতিহাসে এ আইনটি 'ভারত স্বাধীনতা আইন' নামে পরিচিত। এই আইনের ভিত্তিতেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় এবং স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

### ৭.১ ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষাপট

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতার পর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। পাকিস্তান অর্জনের দাবিতে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন উপলক্ষে কলকাতাসহ সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এতে হাজার হাজার নিরীহ লোক প্রাণ হারায়। এসময় ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে যে, ভারতীয়দের স্বাধীনতার আন্দোলন যেমন দমন সম্ভব নয়, তেমনি কংগ্রেস-লীগ বিরোধ নিষ্পত্তিও অসম্ভব। এমতাবস্থায় ব্রিটেনের সদ্য নির্বাচিত শ্রমিক দলীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী মি. এ্যাটলী ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন যে, শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সমঝোতা হোক বা না হোক ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারত ত্যাগ করবে। মি. এ্যাটলীর এ 'ফেব্রুয়ারি ঘোষণা' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। উভয় দলই স্ব-স্ব অবস্থানে অনড় থাকায় পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে। ফলে ভারত বিভক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

### ৭.২ ৩রা জুন পরিকল্পনা

সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের পরামর্শক্রমে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ পরিকল্পনাটি ঐতিহাসিক '৩রা জুন পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। এ পরিকল্পনায় মুসলমানদের পাকিস্তান দাবি নীতিগতভাবে স্বীকার করে ভারত বিভক্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের ব্যাপারে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেয়া হয়। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ভারতীয় স্বাধীনতা বিল নামে একটি বিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হবে বলেও পরিকল্পনায় বলা হয়। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭' পাস হয়।

১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দলীল। এটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল—

### ৭.৩ ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক. এই আইন ভারতে ব্রিটিশ শসনের অবসান ঘটায়। ভারতকে বিভক্ত করে ভারত ইউনিয়ন এবং পাকিস্তান নামে দুটি ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করে। ডোমিনিয়ন দুটির আইনগত সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়।

খ. এ আইনে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় শাসন ব্যাপারে উভয় ডোমিনিয়নে একজন করে গভর্নর জেনারেল থাকবেন। ডোমিনিয়ন মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল ইংল্যান্ডের রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

গ. ১৯৩৫ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত আইনসভা গণপরিষদের মর্যাদা লাভ করে। এ গণপরিষদের হাতে স্ব-স্ব ডোমিনিয়নের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ঘ. প্রতিষ্ঠিত ডোমিনিয়ন দুটি ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত থাকবে কি-না, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

ঙ. সিভিল সার্ভিস ও সশস্ত্র বাহিনীকে আনুপাতিক হারে দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে ভাগ করা হয়।
চ. দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর ব্রিটিশ সরকারের সকল প্রকার প্রাধান্যের অবসান ঘটে। এদেরকে স্বাধীন থাকতে বা ইচ্ছামত ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

### ৭.৪ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া

১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইনের প্রতি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এতে ভারত বিভক্তির যে প্রস্তাব করা হয় কংগ্রেস নেতা গান্ধী ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। অবশ্য মাউন্ট ব্যাটেনের পরামর্শে নেহেরু ও প্যাটেল বিভক্তি প্রস্তাব মেনে নেয়। তাদের প্রভাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নীতি পরিবর্তন করে এবং ভারতীয় জনগণকে বিভক্তি প্রস্তাব মেনে নেওয়ার আহ্বান জানায়। মাউন্ট ব্যাটেন ও প্যাটেলের সাথে সাক্ষাতের পর গান্ধীও তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেন। একমাত্র মাওলানা আযাদ অখণ্ড ভারত দাবিতে অটল থাকেন।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মুসলিম লীগ মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, মুসলিম লীগের দাবি ছিল পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং বৃহৎ বাংলা ও আসাম নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল মাউন্ট ব্যাটেন তাদের দাবি মেনে নেন নি। তিনি জিন্নাহকে 'অখণ্ড ভারত' অথবা খণ্ডিত পাঞ্জাব ও বাংলা নিয়ে পাকিস্তান এর যে কোন একটি বেছে নিতে বলেন। লীগের অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও নিরূপায় জিন্নাহ ক্ষুদ্র পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য হন।

### ৭.৫ স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন উক্ত সালের ১৪ এবং ১৫ আগস্ট কার্যকর করা হয়। ফলে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত (হিন্দুস্থান) নামে উপমহাদেশে দুটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। ভারতে প্রায় দুশ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে মহামান্য ব্রিটিশ সম্রাটের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানোর জন্য ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন করাচী উপস্থিত হন এবং ১৪ আগস্ট গণপরিষদে প্রদত্ত এক ভাষণে পাকিস্তান সৃষ্টিকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেন। ১৫ আগস্ট দিল্লিতে ভারতে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানেও ভাইসরয় যোগ দেন। এভাবে উপমহাদেশে জন্ম নেয় 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের।

**সার-সংক্ষেপ**

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতার পটভূমিতে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সীমাহীন মতানৈক্য, ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ভারত স্বাধীনতা আইন পাস করে। এ আইনের মাধ্যমে উপমহাদেশে প্রায় দু'শ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে এবং জন্ম নেয় 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৪.৭

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করে—
   ক. ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টকে
   খ. ১৯৪৬ সালের ১৬ অক্টোবরকে
   গ. ১৯৪৭ সালের ১৬ আগস্টকে
   ঘ. ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টকে

২. ফেব্রুয়ারি ঘোষণা দেন—
   ক. লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন
   খ. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
   গ. মি. এ্যাটলী
   ঘ. লর্ড ওয়াভেল

৩. ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করেছে—
   ক. ভারত
   খ. করাচি
   গ. পাকিস্তান
   ঘ. বাংলাদেশ

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. _____ সালের _____ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করা হয়।
২. ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি ঘোষণায় _____ সালের_____ মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়।
৩. ১৯৪৭ সালের _____ আইন উক্ত সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট কার্যকর হয়।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. কংগ্রেস প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আন্দোলন শুরু করে।
২. লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয়।
৩. ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীন ভারত ইউনিয়নের জন্ম হয়।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. ১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন কোন আইনের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ?
২. '৩রা জুন পরিকল্পনা' কে প্রণয়ন করেন?
৩. কংগ্রেসের কোন নেতা শেষ পর্যন্ত অখণ্ড ভারত দাবিতে অটল থাকেন?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষাপট কি ছিল?
২. ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন পরিকল্পনা আলোচনা করুন।
৩. ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৪. কিভাবে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল?

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১৪

**বিশদ উত্তর প্রশ্ন**

১. কৃষক-প্রজা পার্টির বিশেষ উল্লেখপূর্বক ১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক নির্বাচনের অংশগ্রহণকারী প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের পরিচয় ও তৎপরতা আলোচনা করুন।
২. ১৯৩৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ৪ টি বঙ্গীয় মন্ত্রীসভার পরিচয় দিন।
৩. লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করুন। লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলা যায় কি?
৪. ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা কি ছিল? এ পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
৫. ১৯৪৬ সালের স্বাধীন অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও এর প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।
৬. ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের পটভূমি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

ইউনিট ১৫

# পাকিস্তান আমলে বাংলা (১৯৪৭-১৯৭০)

## ভূমিকা

দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনের পর ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী ভারত বিভক্ত হয় এবং দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। প্রায় দেড় হাজার মাইলের ভৌগোলিক ব্যবধান এবং আলাদা বৈশিষ্ট্যের দুটি ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, লোকাচার ও জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দু অংশের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও কেবল ধর্মীয় ঐক্যের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রধান দুটি অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। কিন্তু ধর্মীয় ঐক্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারেনি। নতুন রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর উর্দু ভাষাভাষী পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব পাকিস্তানের (আজকের বাংলাদেশ) প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ, তাদের প্রতি শোষণ-নিপীড়ন ও বঞ্চনা এ অঞ্চলের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। জনসংখ্যার দিক হতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও উপেক্ষা জনমনে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতির ধ্বংস সাধনে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত ষড়যন্ত্রও তাদের কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় পাকিস্তান সৃষ্টির পরেই স্বাধীকারের প্রশ্নে পূর্ব-পাকিস্তানিদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। প্রথমেই সূচিত হয় ভাষা আন্দোলন। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার অধিকার। তথাপি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বোধোদয় হয়নি। তাদের অব্যাহত বৈষম্যমূলক শোষণ-নিপীড়নের পটভূমিতে ১৯৫৪ সালে যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর পর ক্রমান্বয়ে স্বাধিকার প্রশ্নে দানা বাঁধে ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন। পরিণতিতে সংঘটিত হয় ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান। পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রের ভিত কেঁপে ওঠে। এ পরিস্থিতিতে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের ভরাডুবি ঘটে।

আলোচ্য ইউনিটে পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতি, শোষণ-বঞ্চনা এবং স্বাধিকার প্রশ্নে পূর্ব-পাকিস্তানিদের আন্দোলন-সংগ্রামের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

- পাঠ ১ : ভাষা আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৫২)
- পাঠ ২ : যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন, পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন ও পরবর্তী ঘটনা
- পাঠ ৩ : পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি, আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও মৌলিক গণতন্ত্র প্রর্বতন
- পাঠ ৪ : আইয়ুব বিরোধী ছাত্র ও গণ-আন্দোলন (১৯৬১-৬৫)
- পাঠ ৫ : ১৯৬৫ সালের নির্বাচন, পাক-ভারত যুদ্ধ
- পাঠ ৬ : বাংলার (পূর্ব-পাকিস্তান) প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি
- পাঠ ৭ : ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন-১৯৬৬
- পাঠ ৮ : এগার দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান
- পাঠ ৯ : ইয়াহিয়া খানের শাসন ও ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

## পাঠ-১ : ভাষা আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৫২)

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি ¾**

- ☞ ভাষা আন্দোলনের সূচনা কিভাবে হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের গঠন ও এর ভূমিকার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ একুশে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা। বস্তুত এ আন্দোলন বাংলার গণমানুষকে স্বাধিকার আন্দোলনের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে। এ স্বাধিকার চেতনা কালক্রমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়।

### ১.১ রাষ্ট্র ভাষা বিতর্ক

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই এর রাষ্ট্র ভাষা কি হবে এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। পাকিস্তান ছিল একটি বহুভাষী রাষ্ট্র। এর মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। পক্ষান্তরে মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৬ ভাগ ছিল উর্দুভাষী। এ হিসেবে বাংলা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। আর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসেবে 'বাংলার' রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীগণ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা হিসেবে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ঘোষণার দাবি উপেক্ষা করা হয়।

### ১.২ ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়

**ভাষা আন্দোলনের সূচনা**

উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে সমগ্র দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অন্যায় সিদ্ধান্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায় ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান যুবকর্মী সম্মেলনে। এ সম্মেলনে দাবি করা হয় যে, পূর্ব-পাকিস্তানে শিক্ষার বাহন এবং অফিস ও আইন-আদালতের ভাষা হবে বাংলা।

**রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন ও তমদ্দুন মজলিশ**

১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে এ সংগঠনের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে 'পাকিস্তানে রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এটি ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা। অধ্যাপক আবুল কাসেম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন এবং আবুল মনসুর আহমদ প্রণীত এ পুস্তিকায় উর্দুর সাথে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি জানানো হয়। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার সুপারিশ করা হয়। এতে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ৬ ডিসেম্বর অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। এদিকে ভাষা আন্দোলনের সাংগঠনিক রূপ দেয়ার জন্য তমদ্দুন মজলিশ একটি 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। নূরুল হক ভূঁইয়া এ পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

**সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ**

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পরিষদ সদস্যদের ইংরেজি অথবা উর্দুতে বক্তৃতা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। এ অবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তান কংগ্রেস দলের সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষারূপে স্বীকৃতি দানের দাবি জানান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন এ দাবি প্রত্যাখ্যান করলে পূর্ব বাংলার ছাত্র-শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীমহল প্রতিবাদ মুখর হয়ে পড়ে। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ২ মার্চ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও যুব সংগঠন মিলিতভাবে

'সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। সংগ্রাম পরিষদ রাষ্ট্র ভাষার ক্ষেত্রে সরকারি ষড়যন্ত্র রোধ এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে ঢাকার রাজপথ। এসময় পুলিশী আক্রমণে বহু ছাত্র আহত হয় এবং বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ১২-১৫ মার্চ ঢাকাসহ সকল জেলায় ধর্মঘট কর্মসূচি পালিত হয়। পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের সাথে একটি ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে তিনি সংগ্রাম পরিষদের অনেকগুলো শর্ত মেনে নিলেও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার দাবি মানেন নি।

**জিন্নাহর ঢাকা সফর আন্দোলনে নতুন মাত্রা**

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব-পাকিস্তান সফরে ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ ঘোষণা করেন, 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা'। জিন্নাহর এ ঘোষণা পূর্ববাংলায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ২৪ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি জানিয়ে জিন্নাহকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

**আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের চেষ্টা ও এর প্রতিবাদ**

বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এসময় সরকার আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের চেষ্টা করে। এ জঘন্য প্রচেষ্টার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে বাংলা হরফ পরিবর্তন না করার দাবি জানায়।

## ১.৩ ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়

**লিয়াকত আলী খানের ঘোষণা ও প্রতিবাদ**

১৯৪৯ সালের শেষ দিকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকা সফরে এলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ প্রদত্ত একটি মানপত্রে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দানের পূর্ণাঙ্গ দাবি করা হয়। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। তবে ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি গণপরিষদে ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা'। তার এ ঘোষণা পূর্ব বাংলায় প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। ফলে গণপরিষদে ভাষার প্রশ্নে আলোচনা স্থগিত হয়ে যায়।

**খাজা নাজিম উদ্দিনের ঘোষণা ও ব্যাপক আন্দোলন**

১৯৫০ সালের পর আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়ে। তবে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন উর্দুকেই একমাত্র 'রাষ্ট্র ভাষা' হিসেবে ঘোষণা করায় পুনরায় আন্দোলন গতিবেগ লাভ করে। পূর্ববাংলার বিক্ষুব্ধ জনতা নাজিম উদ্দিনের ঘোষণার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ধর্মঘট ও হরতাল কর্মসূচি গ্রহণ করে। 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে পুনরায় মুখরিত হয় রাজপথ। ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৪ ফেব্রুয়ারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

**একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাঙালির আত্মদান**

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশন ছিল। রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঐ দিন রাষ্ট্র ভাষা দিবস পালনসহ সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এবার ভয় পায় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩ টায় ১৪৪ ধারা জারি এবং মিছিল ও জনসভা নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় মিলিত হয়। তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল সহকারে অধিবেশনরত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদের দিকে অগ্রসর হয়। ছাত্রদের মিছিল বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পৌঁছলে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। এতে ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। এক পর্যায়ে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে জব্বার, রফিক, সালাম, বরকত শহীদ হন। কয়েকজন ছাত্রীসহ আরো অনেকেই আহত হন।

২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা সারাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পরে। প্রাদেশিক পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন ত্যাগ করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি ঘটনার প্রতিবাদে একটি বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। এতে পুনরায় পুলিশ গুলি চালালে শফিউর সহ কয়েকজন শহীদ এবং বেশ কিছু আহত ও গ্রেপ্তার হন। ২১ ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণে যেখানে কয়েকজন শহীদ হয়েছিল সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে আজকের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার।

**বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মর্যাদা দান**

অবিরাম ছাত্র ও গণ-আন্দোলনের মুখে নুরুল আমিন সরকার বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে গণ্য করার জন্য গণপরিষদে প্রস্তাব উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করে। ফলে ১৯৪৭ সালে সূচিত ভাষা আন্দোলন লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়।

**১.৪ গুরুত্ব ও তাৎপর্য**

ভাষা আন্দোলন বাংলার জনগণের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি ছিল বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবিতে সংগঠিত গণ-আন্দোলন। এ আন্দোলন পূর্ব-বাংলার অধিকার বঞ্চিত মানুষকে অধিকার সচেতন ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত করে তোলে। আর এ চেতনাই পরবর্তীকালে প্রতিটি গণ-আন্দোলনে প্রেরণা যোগায় এবং জনগণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথকে সুগম করে স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ স্বীকৃতি আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

**সার-সংক্ষেপ**

ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের প্রথম এবং প্রধান ঘটনা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করতে তৎপর হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানি শাসকদের এ অপতৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য এদেশের ছাত্র-জনতা চূড়ান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্য আত্মদানের মাধ্যমে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য নজীর সৃষ্টি করে। এ সাফল্য তাদের নব চেতনায় উজ্জীবিত করে যা পরবর্তীতে স্বাধিকার অর্জনের সফল আন্দোলনে প্রেরণা যোগায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.১

### ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ 'বাংলা' ভাষাভাষী ছিলেন—
   ক. শতকরা ৪০ ভাগ খ. শতকরা ৫০ ভাগ
   গ. শতকরা ৫৫ ভাগ ঘ. শতকরা ৫৬ ভাগ

২. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার প্রথম দাবি জানায়—
   ক. পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সংসদ খ. পাকিস্তান সাহিত্য পরিষদ
   গ. তমদ্দুন মজলিশ ঘ. গণতান্ত্রিক যুবলীগ

৩. 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা' কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কে এই ঘোষণা দেন?
   ক. চৌধুরী খালেকুজ্জামান খ. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
   গ. লিয়াকত আলী খান ঘ. নুরুল আমীন

৪. কোন প্রতিষ্ঠান ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে?
   ক. বাংলা একাডেমী খ. ইউনিসেফ
   গ. ইউনেস্কো ঘ. ও. আই. সি

### খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা _____ ভাগ মাত্র ছিল উর্দু ভাষাভাষী।
২. মুখ্যমন্ত্রী _____ ২০ ফেব্রুয়ারি _____ ধারা জারি করেন।
৩. _____ সালে বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকে _____ রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

### গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১. উর্দু ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা।
২. তমদ্দুন মজলিশ প্রথম বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি জানায়।
৩. ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লিয়াকত আলী খান।

### ঘ. এক কথায় উত্তর দিন

১. ভাষা আন্দোলন বিষয়ক প্রথম পুস্তিকার নাম কি?
২. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
৩. ইউনেস্কো কত সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে?

### ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ভাষা আন্দোলনের সূচনা কিভাবে হয়েছিল?
২. ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিশের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৩. সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও এর ভূমিকা আলোচনা করুন।
৪. ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন ।

## পাঠ-২ : যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন, পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন ও পরবর্তী ঘটনা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ ১৯৫৪ সালে কিভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন, নির্বাচনের ফলাফল ও তাৎপর্য আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন ও পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

পূর্ব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের ইতিহাসে যুক্তফ্রন্ট ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এই নির্বাচনেই পূর্ব বাংলার জনগণ জাতি হিসেবে নিজস্ব অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

### ২.১ যুক্তফ্রন্ট গঠন

মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, অগণতান্ত্রিক মনোভাব, বৈষম্য ও নির্যাতনমূলক নীতির ফলে পূর্ব-বাংলার গণমনে মুসলিম লীগ বিরোধী মনোভাব চরম আকার ধারণ করে। এসময় পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচন নিয়ে ক্ষমতাসীনদের টালবাহানায় জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অবশেষে বিক্ষুব্ধ মানুষের চাপের মুখে সরকার ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। ছাত্র সমাজ ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদগণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য চাপ দেয়। এমতাবস্হায় মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। চারটি দল নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। দলগুলো হচ্ছে- (১) আওয়ামী মুসলিম লীগ (১৯৪৯ সালে সোহ্‌রাওয়ার্দী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) (২) নেজাম-ই-ইসলামী (মাওলানা আতহার আলীর নেতৃত্বাধীন) (৩) কৃষক-শ্রমিক পার্টি (১৯৫৩ সালে শেরে বাংলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) এবং (৪) গণতন্ত্রী দল (হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন)। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা এবং নির্বাচনী ইশতেহার ছিল ২১ দফা। এ দফাগুলো ছিল নিম্নরূপ :

### ২.২ যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা

১. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করা
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ করা
৩. পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করা
৪. সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা
৫. পূর্ব পাকিস্তানে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা
৬. কারিগর-মোহাজিরদের কাজের ব্যবস্থা করা
৭. বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করা
৮. পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা
৯. অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা
১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা
১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা ও মন্ত্রীদের বেতন ১ হাজার টাকার বেশি না করা
১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা
১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স বাতিল করা
১৫. বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক করা
১৬. বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা
১৭. ২১ ফেব্রুয়ারি নিহত শহীদ স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ করা
১৮. ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা
১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা
২০. কোন অজুহাতেই আইন সভার মেয়াদ বৃদ্ধি না করা
২১. পরিষদের কোন সদস্য পদ খালি হলে তিন মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

### ১.৩ ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও নির্বাচন-এর ফলাফল

২১ দফা ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকারের দলিল। এতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় । এজন্য পূর্ব বাংলার জনগণ ২১ দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। ফলে ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে এবং মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। নির্বাচনের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ :

**মোট আসন সংখ্যা ৩০৯**

| রাজনৈতিক দলের নাম | প্রাপ্ত আসন সংখ্যা |
|---|---|
| যুক্তফ্রন্ট | ২৩৬ |
| মুসলিম লীগ | ০৯ |
| কংগ্রেস | ২৪ |
| তফসিলী সম্প্রদায় | ২৭ |
| খেলাফত-ই-রাব্বানী | ০১ |
| খ্রিস্টান | ০১ |
| বৌদ্ধ | ০২ |
| কমিউনিস্ট পার্টি | ০৪ |
| নিদর্লীয় | ০৫ |
| মোট আসন সংখ্যা = | ৩০৯ টি |

### ২.৪ মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনসহ মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার ৫ জন প্রভাবশালী সদস্য এবং কয়েকজন খ্যাতিমান কেন্দ্রীয় নেতা এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হন। মুসলিম লীগের এ পরাজয়ের কতগুলো কারণ ছিল। যথা- মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতা, রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নকে সঠিকভাবে মোকাবিলায় ব্যর্থতা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবির বিরোধিতা, পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক দুর্গতি, সাধারণ জনগণ থেকে নেতৃবৃন্দের বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি।

### ২.৫ নির্বাচনের তাৎপর্য

১৯৫৪ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। যথা—

ক. এটি ছিল সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে প্রথম অবাধ নির্বাচন।

খ. এ নির্বাচন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং তাদের মধ্যে বিপুল রাজনৈতিক উৎসাহ-উদ্দিপনা সৃষ্টি করে।

গ. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে জোরদার করে।

ঘ. শোষিত-বঞ্চিত পূর্ব বাংলার জনমনে বিপুল আশার সঞ্চার করে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি বহুলাংশে তাদের মোহমুক্তি ঘটায়। যা ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়সহ পরবর্তীকালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতির উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

### ২.৬ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন

১৯৫৪ সালের ২৫ মার্চ পূর্ব বাংলার গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান যুক্তফ্রন্ট সংসদীয় দলের নেতা ফজলুল হককে সরকার গঠনের আহ্বান জানান। ফজলুল হক ৪ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এ মন্ত্রীসভার আয়ুস্কাল ছিল অত্যন্ত অল্প। তবে এ সময়ের মধ্যেই এই মন্ত্রীসভা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা এবং বর্ধমান হাউসকে বাংলা একাডেমী করার প্রস্তাব অনুমোদন করে।

### ২.৭ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার অবসান

যুক্তফ্রন্ট ছিল একটি নির্বাচনী মোর্চা। কোন আর্দশিক ভিত্তিতে নয় বরং নির্বাচন এবং মুসলিম লীগকে মোকাবিলার জন্যই এ মোর্চা গড়ে উঠেছিল। তাই ক্ষমতায় যাওয়ার পর নেতৃবৃন্দের মধ্যকার ব্যক্তিগত রেষারেষি এবং মন্ত্রীত্ব নিয়ে বিরোধ এবং শরিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে মতানৈক্যের ফলে যুক্তফ্রন্টে বিভেদ দেখা দেয়। যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গন এবং মন্ত্রীসভা বাতিলের জন্য এসময় কেন্দ্রীয় সরকারও নানা তৎপরতা শুরু করে। কেননা যুক্তফ্রন্টের এ বিপুল বিজয় কেন্দ্রীয় সরকার সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। কাজেই তারা নানা অজুহাত খুঁজতে থাকে। এসময় মুখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক কলকাতা গিয়ে যে বক্তব্য রাখেন, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তার অপব্যাখ্যা করে। ফজলুল হকের বিরুদ্ধে নানা রকম কুৎসা রটানো হয়। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ এনে তাঁকে অপসারণের ষড়যন্ত্র করা হয়। একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকার সুপরিকল্পিতভাবে আদমজীনগর ও চন্দ্রঘোনাসহ দেশের নানা স্থানে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা বাধায়। এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে সরকার ফ্রন্ট মন্ত্রীসভার উপর এর দায় চাপিয়ে দেয়। শেষে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করা হয়।

### ২.৮ বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিলের পর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২ ক ধারা অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রিয় শাসন জারি করেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করে এ.কে. ফজলুল হককে গৃহবন্দি এবং অসংখ্য যুক্তফ্রন্ট নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন চলে। ১৯৫৬ সালের মার্চে ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন।

**সার-সংক্ষেপ**

পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, অগণতান্ত্রিক মনোভাব এবং পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে পূর্ব বাংলার জনমনে শাসক গোষ্ঠী ও মুসলিম লীগ সম্পর্কে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলার জন্য ৪টি বিরোধী রাজনৈতিক দল নির্বাচনী মোর্চা যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। ২১ দফা কর্মসূচিকে নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে গ্রহণ করে যুক্তফ্রন্ট ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বিপুল বিজয় অর্জন করে। পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। তবে যুক্তফ্রন্টের এ বিপুল বিজয় কেন্দ্রীয় সরকার সহজভাবে মেনে নেয়নি। ফলে শুরু হয় ষড়যন্ত্র। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করে পূর্ব বাংলায় সরাসরি কেন্দ্রের শাসন জারি করেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়–

ক. ১৯৫২ সালে খ. ১৯৫৩ সালে
গ. ১৯৫৪ সালে ঘ. ১৯৫৬ সালে

২। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কয়টি আসন লাভ করে?

ক. ২২০ খ. ২৪০
গ. ২৩৬ ঘ. ১৯২

৩। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন–

ক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ. এ.কে. ফজলুল হক
গ. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঘ. আবুল মনুসর আহমদ

৪। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়–

ক. ৩০ মে, ১৯৫৪ খ. ৩০ আগস্ট, ১৯৫৪
গ. ৩০ অক্টোবর, ১৯৫৪ ঘ. ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৪

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ____ টি দল নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর _____ গঠিত হয়।
২. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল _____ ।
৩. প্রাদেশিক পরিষদের _____ আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ _____ আসন লাভ করে।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. জামায়াত ইসলামী দলটি ছিল যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল।
২. পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯ টি।
৩. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়ার পর মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. কয়টি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল?
২. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি?
৩. ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্টের নাম কি?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. কিভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল?
২. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল আলোচনা করুন।
৩. কবে এবং কিভাবে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয়েছিল?

## পাঠ-৩ : পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি, আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ পাকিস্তানে কিভাবে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও তাঁর কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

### ৩.১ পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি

**প্রথম সংবিধান ঘোষণা**

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ঘোষণা করা হয়। এ সংবিধানের মাধ্যমে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র নাম ধারণ করে। পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে একত্রিত করে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নাম দেয়া হয়। সংবিধানে দুই প্রদেশের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং সকল বিষয়ে সংখ্যাসাম্য নীতি স্বীকৃত হয়। বাংলা এবং উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

**৩.২ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ (১৯৫৬-৫৮)**

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ ইসকান্দর মির্জা পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন গণতন্ত্র বিরোধী। পাকিস্তানে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হউক তা মির্জার আদৌ পছন্দ ছিল না। তাই তিনি গণতন্ত্রের বিকাশকে ব্যহত করার সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তার অগণতান্ত্রিক আচরণে ও হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৫৬-৫৮ সালের মধ্যে কেন্দ্রে তিনটি মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানেও রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করে। যুক্তফ্রন্ট নেতৃত্বের মধ্যে রেষারেষি, আওয়ামী লীগের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সর্বোপরি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার ষড়যন্ত্র ও হস্তক্ষেপের ফলে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হয়। পূর্ব পাকিস্তানের এই রাজনৈতিক বিশৃংখলার সুযোগে প্রেসিডেন্ট মির্জা পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্টর শাসন জারি করেন। অবশ্য পরিস্থিতির চাপে দুই মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্টর শাসন প্রত্যাহার করে নেন। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়।

**৩.৩ ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর মৃত্যু ও সামরিক শাসন জারি**

এই সময় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সভা চলাকালে আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক লীগের সদস্যদের মধ্যে গোলযোগ বাঁধে। এক পর্যায়ে উত্তেজিত পরিষদ সদস্যগণ ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন জিনিস ছুড়তে শুরু করে। এতে তিনি আহত হন এবং পরদিন হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গণতন্ত্র বিরোধী অশুভ শক্তিগুলো প্রেসিডেন্ট মির্জার নেতৃত্বে শক্তি সঞ্চয় করে। প্রেসিডেন্ট মির্জা এ ঘটনার প্রেক্ষিতে অক্টোবর' ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খান প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত হন। দেশের শাসনতন্ত্র-আইন পরিষদ; কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা বাতিল করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। সমগ্র পাকিস্তানকে তিনটি সামরিক এলাকায় বিভক্ত করে প্রত্যেক এলাকায় একজন করে সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। জেনারেল ওমরাও খান পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক এবং জাকির হোসেনকে গভর্নর নিয়োগ করা হয়। পাকিস্তান নিরাপত্তা আইন বলে সামরিক সরকার আবুল মনসুর আহমেদ, হামিদুল হক ও শেখ মুজিবসহ পূর্ব পাকিস্তানের বহু নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

**৩.৪ আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল (১৯৫৮)**

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা ছিলেন গণতন্ত্র বিরোধী। গণতন্ত্র ধ্বংসে তাঁর অপতৎপরতার অন্যতম সহযোগী ছিলেন প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খান । কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাসে তাঁর একান্ত পার্শ্বচর আইয়ুব খানের হাতেই তাঁর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। সামরিক শাসন জারির ২১ দিন পরেই আইয়ুব খান ইস্কান্দর মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত এবং দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন। ১৯৫৮ সালের ২৭ আক্টোবর আইয়ুব খান নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন। একই সংগে তিনি প্রধান সেনাপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে বহাল থাকেন। আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতা দখলকে অক্টোবর বিপ্লব বলে আখ্যা দেন।

### ৩.৫ আইয়ুব খানের কতিপয় রাজনৈতিক পদক্ষেপ

আইয়ুব খান সুচতুর রাজনীতিবিদ ছিলেন। ক্ষমতায় এসেই তিনি কতগুলো রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র হননের চেষ্টা করেন। তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং ঢালাওভাবে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। জনসমর্থন আদায়ের জন্য কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি দূর ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির পর তিনি নিজে ব্যারাকে ফিরে যাবার এবং গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। আসলে এগুলো ছিল রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি। অবশ্য জনগণ সহজেই এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁকে সত্যিকার জনদরদি শাসক মনে করে।

### ৩.৬ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ

আইয়ুব খান জনগণের কিছু আস্থা অর্জনের পর রাজনৈতিক সাফল্য অর্জনের পথে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হন। তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি হাতে নেন। ১৯৫৯ সালের ৭ আগস্ট 'পোডো' (PODO) এবং 'এবডো' (EBDO) নামক দুটি আদেশ জারি করে রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেন।

### ৩.৭ মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন

১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান তাঁর বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তাঁর উদ্ভাবিত পরিকল্পনা মৌলিক গণতন্ত্র নামে পরিচিত। আইয়ুব খান প্রচার করেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সংসদীয় গণতন্ত্র পাকিস্তানের স্বল্প শিক্ষিত মানুষের জন্য অনুপযোগী। তাঁর প্রবর্তিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' সর্বসাধারণের উপযোগী । এতে জনগণ সহজে অংশগ্রহণ করতে পারবে। মৌলিক গণতন্ত্র কার্যকর করার জন্য তিনি পাকিস্তানের দুই অংশ থেকে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এরা ছিলেন ৫ স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনের সর্ব নিম্নস্তর ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য। এ ৮০ হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য মৌলিক গণতন্ত্রীরাই প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদসহ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একমাত্র ভোট প্রদান ক্ষমতার অধিকারী ছিল। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থাসূচক ভোটে আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

**সার-সংক্ষেপ**

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলেও এর প্রথম সংবিধান রচিত হয় ১৯৫৬ সালে। সংবিধান অনুযায়ী দেশটির নামকরণ হয় 'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র'। ইসকান্দর মির্জা পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। তিনি ছিলেন গণতন্ত্র বিরোধী। তাঁর ষড়যন্ত্র ও হস্তক্ষেপ এবং সর্বোপরী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতার ফলে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্র ও প্রদেশে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অস্থিতিশীল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৮ সালে ইস্কান্দর মির্জা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করে। অবশ্য মাত্র ২১ দিনের মাথায় তিনি তাঁর একান্ত সহচর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আইয়ুব খান কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। আইয়ুব খান নিজেকে প্রেসিডেন্ট, প্রধান সেনাপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে বহাল রেখে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন। পাকিস্তানের ইতিহাসে শুরু হয় এক নতুন যুগের। আইয়ুব খান বিভিন্ন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর মৌলিক গণতন্ত্র।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৩

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়—
   ক. ১৯৫৪ সালে খ. ১৯৫৫ সালে
   গ. ১৯৫৬ সালে ঘ. ১৯৫৭ সালে

২. পূর্ব বাংলার 'পূর্ব পাকিস্তান' নামকরণ করা হয়—
   ক.১৯৪৭ সালে খ. ১৯৫৪ সালে
   গ. ১৯৫৫ সালে ঘ. ১৯৫৬ সালে

৩. পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট—
   ক. চৌধুরী খালেকুজ্জামান খ. মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জা
   গ. গোলাম মুহাম্মদ ঘ. আইয়ুব খান

৪. 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রবর্তন করেন—
   ক. মাওলানা ভাসানী খ. ইস্কান্দর মির্জা
   গ. আইয়ুব খান ঘ. আজম খান

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ১৯৫৬ সালের সংবিধানে দুই প্রদেশের পূর্ণ আঞ্চলিক _____ এবং সকল বিষয়ে _____ নীতি গৃহীত হয়।
২. ____ এবং ___ নামক দুটি আদেশ জারি করে আইয়ুব খান রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম ও নির্বাচন নিষিদ্ধ করেন।
৩. আইয়ুব খানের উদ্ভাবিত গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা _____ নামে পরিচিত।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
২. ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন।
৩. ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে দেশটির সাংবিধানিক নামকরণ কি করা হয়েছিল?
২. ১৯৫৮ সালে কাকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছিল?
৩. কবে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হন?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
২. আইয়ুব খান কিভাবে ক্ষমতায় আসেন?
৩. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কি বুঝেন?

## পাঠ-৪ : আইয়ুব বিরোধী ছাত্র ও গণ-আন্দোলন (১৯৬১-৬৫)

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি ¾**

- ☞ ১৯৬১-৬৫ সালের মধ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ ১৯৬২ সালের সংবিধান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও গণ-আন্দোলন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

### ৪.১ পাকিস্তানের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কয়েকটি কমিশন গঠন

১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর আইয়ুব খান দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি কমিশন গঠন করেন। এদের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক কমিশন, শিক্ষা কমিশন, ভূমি সংস্কার কমিশন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ভূমি সংস্কার ও মুসলিম পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে তিনি যে প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় দেন তা জনসমর্থন লাভ করে। কিন্তু শাসনতন্ত্র ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল কার্যক্রম জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

### ৪.২ আইয়ুব খানের পূর্ব পাকিস্তান সফর

নতুন শাসন পদ্ধতির প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনসমর্থন আদায়ের লক্ষে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি সমস্যা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরিকরণের প্রতিশ্রুতি দেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন জেনারেল আজম খান। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাদি সমাধানে আন্তরিক ছিলেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার কারণে তাঁর প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

### ৪.৩ অন্দোলনের সূচনা

১৯৬১ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম আইয়ুবী সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের জন্য দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন। এ ঘটনার পর আইয়ুব খান পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করেন। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র ও গণ-আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। আন্দোলন দমনের জন্য সরকার নিরাপত্তা অধ্যাদেশের আওতায় আবুল মনসুর আহমদ, তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ও শেখ মুজিবসহ পূর্ব পাকিস্তানের বহু নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে ।

### ৪.৪ ১৯৬২ সালের সংবিধান

পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র ও গণ আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে আইয়ুব খান পাকিস্তানের নতুন সংবিধান ঘোষণা করেন। এ সংবিধানটি ছিল এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক। এই সংবিধানে কেন্দ্র ও প্রদেশের আইনসভা মন্ত্রী পরিষদ ও গভর্নরের ক্ষমতাকে সংকুচিত করে প্রেসিডেন্টের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়। এতে বিচার বিভাগের ক্ষমতাও খর্ব করা হয়। ঢাকাকে নাম মাত্র দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদা দেওয়া হয়।

### ৪.৫ সংবিধানের প্রতিক্রিয়া

১৯৬২ সালের সংবিধানে জনগণের উপর অনাস্থা প্রকাশ পায়। জনগণের অধিকার অগ্রাহ্য করে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যক্তিস্বার্থে রচিত সংবিধানকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে শুরু হয় ব্যাপক ছাত্র ও গণ-আন্দোলন। নতুন শাসনতন্ত্র বাতিল, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রাজবন্দিদের মুক্তি-এ তিন দফা দাবিতে ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করে।

### ৪.৬ জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ও সামরিক শাসন প্রত্যাহার

শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানে ছাত্র ও গণ-আন্দোলন চলাকালে আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। তারপরেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের একদিন পূর্বে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক মৃত্যবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে বড় ধরনের শূন্যতা দেখা দেয়। প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচন বর্জনের

ফলে আইয়ুব সমর্থক ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সহজেই নির্বাচনে জয়লাভ করেন । নির্বাচনের কিছুদিন পর ১৯৬২ সালের ৮ জুন আইয়ুব খান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন।

### ৪.৭ রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ও ৯ নেতার বিবৃতি

সামরিক শাসন রহিত করা হলেও এ সময় প্রেসিডেন্ট এক অধ্যাদেশ বলে জাতীয় পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক দল গঠন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দেশের এই সংকটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৬২ সালের ২৫ জুন পূর্ব পাকিস্তানের ৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি আইয়ুবের শাসনতন্ত্র বাতিল করে গণপ্রতিনিধি কর্তৃক একটি স্থায়ী শাসনতন্ত্র রচনার প্রস্তাব করে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি, তাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রচেষ্টা। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ বিবৃতিকে সমর্থন করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার সোহরাওয়ার্দীকে মুক্তি দেন।

### ৪.৮ ৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন

পাকিস্তানের শিক্ষা সংস্কারের লক্ষে গঠিত হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রিপোর্টের প্রতিবাদে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। ছাত্ররা কমিশন রিপোর্ট বাতিল, গণমুখী ও বিজ্ঞান ভিত্তিক গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য কয়েকটি গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে স্বোচ্চার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এটাই পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সফল গণ-অভ্যুত্থান। এতে আইয়ুব খানের ক্ষমতার ভীত নড়ে ওঠে।

### ৪.৯ রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ছিলেন রাজনৈতিক উচ্চভিলাসী। এজন্য তিনি 'পলিটিক্যাল পার্টিজ এ্যাক্ট' বা রাজনৈতিক দলবিধি প্রবর্তন করে রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন ঘটান। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং নিজে 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' নামে একটি দল গঠন করেন। এই বিধির মাধ্যমে তিনি গণ ঐক্য ধ্বংস ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দীসহ পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ এ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম পার্টি সক্রিয় হয়। এসময় সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' (এন.ডি.এফ) নামে একটি রাজনৈতিক মোর্চা গঠন করেন। এন.ডি.এফ. গঠনের মূল উদ্দেশ্যে গণ ঐক্য সৃষ্টি, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জনস্বার্থ রক্ষা এবং জাতীয় স্বার্থ সুদৃঢ় করা। এর মূল দাবি ছিল ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনর্বহাল।

### ৪.১০ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন

ইতোমধ্যে আইয়ুব খান মোনায়েম খানকে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন প্রগতি ও গণতন্ত্রের বিরোধী এবং আইয়ুব খানের একান্ত দোসর। বাংলার ইতিহাসে তিনি এক ধিকৃত ব্যক্তিত্ব। তাঁর সময়ে দেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও অরাজকতা চরমে পৌঁছে। এদিকে ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে পূর্বপাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। এ সময় বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে গণ ঐক্যে ফাটল ধরে এবং এন.ডি.এফ. এ দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় শেখ মুজিবের প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। কিছুদিন পর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও পুনর্গঠন করা হয়।

**সার-সংক্ষেপ**

১৯৫৮ সালে ইস্কান্দর মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর অগণতান্ত্রিক ও একনায়ক সুলভ শাসনের প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনা করেন। নানা রকম দমন-নীপিড়ন ও বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেও এ আন্দোলন প্রশমন করা সম্ভব হয় নি, বরং এ আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৪

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**
**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ১৯৬১ সালে আইয়ুব খানের পূর্ব পাকিস্তান সফরের সময় সেখানকার গভর্নর ছিলেন—
ক. গোলাম মুহাম্মদ খ. আজম খান
গ. জাকির হোসেন ঘ. মোনায়েম খান

২. পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান রচিত হয়—
ক. ১৯৫৯ সালে খ. ১৯৬০ সালে
গ. ১৯৬২ সালে ঘ. ১৯৬৩ সালে

৩. 'পলিটিক্যাল পার্টিজ এ্যাক্ট' প্রবর্তন করেন—
ক. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী খ. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান
গ. মোনায়েম খান ঘ. প্রধান মন্ত্রী মুহাম্মদ আলী

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. _____ সালের ৮ জুন _____ সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন।
২. ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর _____ মৃত্যুবরণ করেন।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানে নিরাপত্তা আইনে সোহ্‌রাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করা হয়।
২. হামদুর কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা শিক্ষা আন্দোলন করেন।
৩. সোহরাওয়ার্দী 'কনভেনশন মুস্‌লিম লীগের' প্রতিষ্ঠা।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. কবে পাকিস্তানের রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়।
২. জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এন.ডি.এফ) গঠনে কোন নেতা অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।
৩. কত সালে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক মৃত্যুবরণ করেন?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-প্রশ্ন উত্তর**

১. ১৯৬২ সালের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
২. ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের উপর আলোকপাত করুন।
৩. আইয়ুব খানের 'পলিটিক্যাল পার্টিজ এ্যাক্ট' প্রর্বতন ও এর প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।

## পাঠ-৫ : ১৯৬৫ সালের নির্বাচন, পাক-ভারত যুদ্ধ

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি ¾**

- ☞ ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

### ৫.১ ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন

১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পরবর্তী বছরে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণা পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আইয়ুবী স্বৈরাচারের উৎখাত এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষে এ নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। ক্ষমতাসীন 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ'কে মোকাবিলা করার জন্য ৫টি বিরোধী দল একত্রিত হয়ে একটি নির্বাচনী জোট গঠন করে। এ জোটের নামকরণ করা হয় 'সম্মিলিত বিরোধী দল' সংক্ষেপে কপ (COP)। ৯ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে এ জোট প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রথমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আইয়ুব খান কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধী দলীয় জোট ফাতেমা জিন্নাহ্কে প্রার্থী করেন। ফাতেমা জিন্নাহ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, তবে কায়েদ-ই-আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন হিসেবে তাঁর প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তাছাড়া তিনি গণতন্ত্রের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। এজন্যই তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে সম্মত হয়েছিলেন।

### ৫.২ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল

নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খানই বিজয়ী হন। তাঁর এ বিজয়ের মূল কারণ ছিল তাঁর অনুগত মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটদান। মৌলিক গণতন্ত্রীরা নিজেদের কায়েমী স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পুনরায় আইয়ুব খানকে ভোট দেন। তাছাড়া আইয়ুব খান নির্বাচনে দুর্নীতি ও অসাধুতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হননি। সরকারি প্রশাসনযন্ত্রও তার পক্ষে কাজ করে। ফলে সহজেই দ্বিতীয়বারের মতো তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

### ৫.৩ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন

১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে জাতীয় পরিষদ এবং মে মাসে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের সময়সূচি ধার্য করা হয়। প্রহসনের নির্বাচনে অংশ্রগহণের প্রশ্নে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য হলেও শেষ পর্যন্ত কপ ও এন.ডি.এফ. নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারি ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

### ৫.৪ নির্বাচনের ফলাফল

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল ও সরকারি দলের সম্পূর্ণ অনুকূলে যায়। নির্বাচনে অবৈধ প্রভাব এবং প্রশাসনিকযন্ত্রকে ব্যবহার করে আইয়ুব খান নির্বাচনী ফলাফলের চাকা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেন। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে কপ ১০ টি, এন.ডি.এফ ৫ টি এবং স্বতন্ত্র ৬ টি আসন লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদের মোট ১৪৯ টি আসনের মধ্যে সরকারি দল কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৬৬ টি, বিরোধী দল ২৫ টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৫৮ টি আসন লাভ করে। অবশ্য সরকার পরে নানা প্রলোভনে স্বতন্ত্রদের দলে ভিড়িয়ে নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখে। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এ নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখতে পারিন।

### ৫.৫ ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সূচনা। মূলত কাশ্মীর সমস্যা দুদেশের মধ্যে বহুদিনের একটি অমীমাংসিত সমস্যা। এ সমস্যার উদ্ভব দেশ বিভাগ হতে। জাতিসংঘ গণভোটের মাধ্যমে সমস্যাটির নিষ্পত্তি চাইলেও ভারতের অনীহার কারণে তা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় উভয় দেশ কাশ্মীরকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দাবি করতে থাকে। ১৯৪৮ সালে কাশ্মীর নিয়ে দুদেশের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ হয়। ১৯৬৫ সালে ভারত অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলে পাকিস্তান অনুপ্রবেশকারী তৎপরতা বৃদ্ধির অভিযোগকে কেন্দ্র করে দু দেশের মধ্যকার বিরোধ অত্যাধিক ও মারাত্মক আকার ধারণ করে। সেপ্টেম্বর মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

### ৫.৬ যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে লাহোরের দিকে অগ্রসর হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। স্থল ও বিমান যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর বাঙালি সৈন্যরা অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। তাদের সাহসিকতা ও প্রতিরোধের কারণে ভারত লাহোর দখলে ব্যর্থ হয়। এ যুদ্ধ মাত্র সতের দিন স্থায়ী হয়েছিল।

### ৫.৭ যুদ্ধ বিরতি ও তাসখন্দ চুক্তি

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে ২৩ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয়। অতঃপর সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী মি. কোসিগিনের আমন্ত্রণে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে আলোচনা অনুযায়ী ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিটি ইতিহাসে 'তাসখন্দ চুক্তি' নামে পরিচিত। এ চুক্তি অনুযায়ী দু দেশের বিরোধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। তবে মজার ব্যাপার এই যে, এ চুক্তিতে কাশ্মীর সম্পর্কিত কোন বক্তব্য ছিল না।

### ৫.৮ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া

পাক-ভারত যুদ্ধ ও তাসখন্দ ঘোষণা আইয়ুবী শাসনের রাজনৈতিক ভাগ্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আইয়ুব খানের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পায়। কাশ্মীর সংক্রান্ত কোন বক্তব্য না থাকায় জনগণ তাসখন্দ চুক্তিকে অপমানজনক চুক্তি বলে গণ্য করে। তাসখন্দ চুক্তির প্রতিবাদে ছাত্র ও রাজনীতিকরা শহরাঞ্চলে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলন দমন করার জন্য অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়।

### ৫.৯ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া

পাক-ভারত যুদ্ধ পশ্চিম পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি সৈনিকদের বীরত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে। এ যুদ্ধের সময় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক অসহায়ত্বের প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। যুদ্ধকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় পূর্ব পাকিস্তান একেবারেই অরক্ষিত হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার তাদের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই তারা নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তদুপরি যুদ্ধজনিত কারণে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে অহেতুক চাপ তাদের আইয়ুব বিরোধী মনোভাবকে আরো চাঙ্গা করে।

**সার-সংক্ষেপ**

১৯৬২ সালের সংবিধান ঘোষণার পর আইয়ুব বিরোধী প্রচণ্ড ছাত্র ও গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ সম্মিলিত জোট গঠনের মাধ্যমে প্রতিটি নির্বাচনে আইয়ুব খান ও তার দলকে মোকাবিলা করেন। অবশ্য আইয়ুব খান অবৈধভাবে সরকারি প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি নির্বাচনেই বিজয়ী হন। নির্বাচনের পরপরই কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাত্র ১৭ দিন যুদ্ধের পর জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতি এবং রাশিয়ার উদ্যোগে তাসখন্দে দু দেশের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি হয়। তবে এ যুদ্ধ আইয়ুব খানের রাজনৈতিক জীবনে বড় রকমের আঘাত হানে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৫

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. সম্মিলিত বিরোধী দল 'কপ' গঠিত হয়েছিল—
   ক. ৪ টি বিরোধী দল সমন্বয়ে
   খ. ৭ টি বিরোধী দল সমন্বয়ে
   গ. ৫ টি বিরোধী দল সমন্বয়ে
   ঘ. ৬ টি বিরোধী দল সমন্বয়ে

২. ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল—
   ক. ১৭ মাস
   খ. ১৭ দিন
   গ. ২০ দিন
   ঘ. ২ মাস

৩. তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—
   ক. পাকিস্তান-রাশিয়ার মধ্যে
   খ. ভারত-রাশিয়ার মধ্যে
   গ. পাক-ভারতের মধ্যে
   ঘ. ভারত-বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দল _____ প্রার্থী করে।
২. ____ সামস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ হয়।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. ১৯৬৫ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে সরকারি দল ২০ টি আসন লাভ করেছিল।
২. তাসখন্দ চুক্তিতে ভারতের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্বাক্ষর করেন।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে 'কপ' প্রার্থীর নাম কি?
২. কোন চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. সংক্ষেপে ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

## পাঠ-৬ : বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি -**

- ☞ বাংলার (পূর্ব পাকিস্তানের) প্রতি পাকিস্তানি শাসকগণের বৈষম্যমূলক আচরণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ বাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তানিদের বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া কতটুকু হয়েছিল, তা আলোচনা করতে পারবেন।

### ৬.১ বৈষম্যমূলক নীতি

প্রথম থেকেই বাংলার প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের নীতি ছিল বৈষম্যমূলক। পাকিস্তানের জন্ম থেকে পরবর্তী সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই তা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য অস্বীকার করে ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার প্রাপ্য ন্যায্য অধিকারের দিকে মোটেও দৃষ্টি দেয় নি। বরং রাজনৈতিক, সামরিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমাগত ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাকিস্তানি শাসকদের গৃহীত বৈষম্যমূলক নীতির একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

**ক. রাজনৈতিক বৈষম্য**

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের অব্যাবহিত পর থেকেই পূর্ব বাংলা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও স্বাধিকারের প্রশ্নে পূর্ব বাংলা ক্রমাগত উপেক্ষিত হতে থাকে। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে পূর্ব বাংলার সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী উভয় পদেই নিয়োগ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান হতে। সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবিকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানের রাজধানীও প্রতিষ্ঠা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে। পরে আইয়ুব খান রাজধানী ইসলামাবাদে স্থানান্তর করেন। পশ্চিম পাকিস্তানিরাই ছিল প্রকৃত অর্থে শাসন ক্ষমতার কর্ণধার। পূর্ব বাংলার জননেতা এ.কে. ফজলুল হকসহ এ অঞ্চলের জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এমনকি সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও আইন পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যাসাম্য নীতি মানতে বাধ্য করা হয়। পাকিস্তানি শাসকদের এসব বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে যখন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবি তোলে, তখন শাসক চক্র অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। এমনকি তারা এ অঞ্চলের দেশপ্রেমিক জননেতাদের দেশদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলাকারী আখ্যা দিতেও কণ্ঠাবোধ করেনি।

**খ. সামরিক বৈষম্য**

পূর্ব পাকিস্তান ছিল ভৌগোলিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা এর নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন নিশ্চিত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। শুধু তাই নয়, এসময় দু অঞ্চলের মধ্যে সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল সীমাহীন। পাকিস্তানের দেশ রক্ষা বাহিনীর তিনিটি সদর দফতরই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। একমাত্র সমরাস্ত্র কারখানাটিও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। দেশ রক্ষা বাহিনীর উচ্চপদে বাঙালিদের কোন স্থান ছিল না। দেশ রক্ষা বাহিনীতে চাকরির ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের স্থান ছিল একচেটিয়া। নিম্নের সারণি হতে এর একটি চিত্র পাওয়া যাবে -

| | বিভাগ | পশ্চিম-পাকিস্তান | পূর্ব-পাকিস্তান |
|---|---|---|---|
| ১. | স্থল বাহিনী | ৯৫% | ৫% |
| ২. | নৌ বাহিনী (কারিগরি) | ৮১% | ১৯% |
| ৩. | নৌ বাহিনী (অকারিগরি) | ৯১% | ৯% |
| ৪. | বিমান বাহিনীর বৈমানিক | ৯১% | ৯% |
| ৫. | সশস্ত্র বাহিনী (সংখ্যায়) | ৫০০,০০০ | ২০,০০০ |

পাকিস্তানে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ছিল সর্বোচ্চ। কিন্তু এর তেমন কোন সুফল পূর্ব পাকিস্তানিরা ভোগ করতে পারেনি। প্রতিরক্ষা ব্যয়ের সিংহভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। পূর্ব পাকিস্তান ছিল সামরিক দিক হতে অবহেলিত, উপেক্ষিত ও অরক্ষিত। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় সকলেই এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারে।

**গ. অর্থনৈতিক বৈষম্য**

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান মারাত্মক অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আয়তনে বড় হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল অনুর্বর ও মরুময়। সেজন্য এখানে কোন কৃষি উন্নয়নের সম্ভাবনা ছিল

না। শিল্প-কারখানাও তেমন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে আর্থিক দিক থেকে প্রথম দিকে পশ্চিম পাকিস্তান ছিল দুর্বল। অন্য দিকে পূর্ব বাংলা ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এজন্য এর অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বৈষম্যের কারণে পূর্ব বাংলার জনগণ এ সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়। পাকিস্তানের মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অর্জিত হতো পূর্ব বাংলা থেকে। অথচ এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় হতো এ অঞ্চলে। মোট রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ বাংলার পণ্য থেকে অর্জিত হলেও বাংলা আমদানি পণ্যের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ পেত। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের হলেও জাতীয় আয়ের মাত্র ২৭ ভাগ ব্যয় হতো এদের জন্য। স্টেট ব্যাংকসহ প্রায় সকল ব্যাংক, বীমা, বাণিজ্য, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিদেশী মিশনসমূহের সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করা হয়। ফলে এ অঞ্চল হতে অবাধে অর্থ পাচার সম্ভব হয়।

শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও বড় বড় সকল শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে যে কয়টি শিল্প-কারাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারও মালিকানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। সেবা ও উন্নয়ন খাতেও বৈষম্য ছিল সুস্পষ্ট।

**সেবা ও উন্নয়ন খাতে বৈষম্যের চিত্র নিচের দুটি সারণি হতে পাওয়া যাবে**

| | খাত | পশ্চিম পাকিস্তান | পূর্ব পাকিস্তান |
|---|---|---|---|
| ১. | জনসংখ্যা | ৫ কোটি ৫০ লাখ | ৭ কোটি ৫০ লাখ |
| ২. | ডাক্তারের সংখ্যা | ১২,৪০০ | ৭,৬০০ |
| ৩. | হাসপাতালের বেড সংখ্যা | ১৬,০০০ | ৬,০০০ |
| ৪. | পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ৩২৫ | ৮৮ |
| ৫. | শহর সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র | ৮১ | ৫২ |

**উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ**

| বিষয় | পশ্চিম পাকিস্তান | পূর্ব-পাকিস্তান |
|---|---|---|
| বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা | ৮০% | ২০% |
| বৈদেশিক সাহায্য (মার্কিন সাহায্য ছাড়া) | ৯৬% | ৪% |
| মার্কিন সাহায্য | ৬৬% | ৩৪% |
| পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন | ৫৮% | ৪২% |
| শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন | ৮০% | ২০% |
| শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক | ৭৬% | ২৪% |
| গৃহ নির্মাণ | ৮৮% | ১২% |

১৯৫৮-৫৯ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু গড় আয় ছিল পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা শতকরা ৩২ ভাগ বেশি ১৯৬৯-৭০ সালে মোট দাঁড়ায় শতকরা ৬১ ভাগে।

**ঘ. শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য**

শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রেও বেদনাদায়েক বৈষম্য দেখা যায়। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পায়। অথচ একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংখ্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বিগুণ। ২০ বছরে এখানে ৫ গুণ ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানে বৃদ্ধি পায় ৩০ গুণ। কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩ এবং পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৩ টি গবেষণা কেন্দ্র তৈরি করা হয়। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন বৃত্তির সিংহভাগ সুবিধা পায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা।

**চাকরির ক্ষেত্রেও যে বৈষম্য ছিল এর উদাহরণ নিম্নোক্ত সারণি**

| দফতর | পশ্চিম পাকিস্তান | পূর্ব পাকিস্তান |
|---|---|---|
| কেন্দ্রীয় বেসামরিক দফতর | ৮৪% | ১৬% |
| বৈদেশিক দফতর | ৮৫% | ১৫% |
| বিদেশী মিশনের প্রধান কর্মকর্তা | ৬০% | ৯% |
| পাকিস্তান এয়ারলাইন্স (সংখ্যায়) | ৭০০০ | ২৮০ |

এমনিভাবে পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনা থেকেই পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) শোষণ, বঞ্চনা ও নানা বৈষম্যের শিকার হতে থাকে।

### ৬.২ বৈষম্য নীতির প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এরূপ নির্লজ্জ বৈষম্য নীতি স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। পাকিস্তানিদের ব্যাপক রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ও শোষণ নীতির প্রতিবাদে এ অঞ্চলের জনগণ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় আইয়ুব খান তাঁর উন্নয়ন দশক উদ্‌যাপন করলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একে প্রহসন হিসেবে গ্রহণ করে এবং স্বাধিকার অর্জনের জন্য গণ-আন্দোলনের শুরু করে। যার পরিণাম আইয়ুবের পতন এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জন এবং বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়।

**সার-সংক্ষেপ**

ভৌগোলিক অবাস্তবতা ও কৃষ্টি কালচারের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ন্যায্য অধিকার লাভের আশায় পূর্ব বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু শুরু থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার প্রতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। ফলে পূর্ব বাংলা একটি পশ্চাদপদ এলাকায় পরিণত হয়। পূর্ব বাংলার জনমানুষের কাছে এ বৈষম্যের চিত্র সুস্পষ্ট হওয়ায় তীব্র প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। স্বাধিকার অর্জনের জন্য সূচিত হয় গণ-আন্দোলনের।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৬

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী ছিল—
   ক. লাহোর খ. করাচী
   গ. রাওয়ালপিন্ডি ঘ. ইসলামাবাদ

২. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পাকিস্তানের মোট জাতীয় আয় থেকে ব্যয় করা হতো—
   ক. ৫০ ভাগ খ. ৬০ ভাগ
   গ. ৩০ ভাগ ঘ. ২৭ ভাগ

৩. ১৯৬৯-৭০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের গড় মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে বেশি ছিল—
   ক. শতকরা ৩২ ভাগ বেশি খ. শতকরা ৬১ ভাগ বেশি
   গ. শতকরা ২৫ ভাগ বেশি ঘ. শতকরা ৬০ ভাগ বেশি

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি সদর দপ্তরই ছিল _____ ।
২. আয়তনে বড় হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল ছিল _____ ও _____ ।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানিদের ন্যায্য অধিকারের ব্যাপারে শুরু থেকেই খুবই সহানুভূতিশীল ছিল।
২. দেশ রক্ষা বাহিনীর সর্বোচ্চ পদে বাঙালিদের কোন স্থান ছিল না।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. কে পাকিস্তানের রাজধানী করাচী থেকে ইসলামাবাদ স্থানান্তর করেন?
২. পাকিস্তানের মোট রাজস্ব আয়ের শতকরা কত ভাগ পূর্ব বাংলা থেকে অর্জিত হতো।

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের সামরিক বৈষম্যের একটি চিত্র দিন।
২. পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল, তার বিবরণ দিন।
৩. পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।

## পাঠ-৭ : ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন (১৯৬৬)

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

- ☞ যে পরিস্থিতি ১৯৬৬ সালে ৬ দফা পেশ করা হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ ছয় দফা দাবি সম্পর্কে আলোচনা করতে পরবেন।
- ☞ ছয় দফার তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৬৬ সালের 'ছয় দফা' আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত এ ছয় দফা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের 'মুক্তির সনদ'।

### ৭.১ ছয় দফা পেশের পটভূমি

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ এবং বিশেষ করে তৎপরবর্তী 'তাসখন্দ ঘোষণাপত্র' কেবল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নয় পশ্চিম পাকিস্তানেও জনমতের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদগণ এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৯৬৬ সালে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে 'নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স' আহবান করেন। সম্মেলনে প্রায় ৭০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তবে এতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল মাত্র ২১ জন। তারা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দাবি সংবলিত একটি 'ছয় দফা প্রস্তাব' উত্থাপনের চেষ্টা করেন । কিন্ত পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের বিরোধিতায় তিনি ব্যর্থ হন। অবশেষে লাহোরে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর কর্মসূচি প্রকাশ করেন। 'ছয় দফা' ভিত্তিক এ কর্মসূচি ইতিহাসে 'ঐতিহাসিক ছয় দফা' নামে পরিচিত। ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং ১৯ মার্চ কাউন্সিল অধিবেশনে 'ছয় দফা' কর্মসূচি অনুমোদন লাভ করে।

### ৭.২ ছয় দফা কর্মসূচি

১. **শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি :** ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য সত্যিকার অর্থে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। এর সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আইন সভাগুলো আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে। সংবিধানে জনগণের পূর্ণ মৌলিক অধিকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদত্ত হবে।

২. **কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা :** কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেবল প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে।

৩. **মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থা :** পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সহজ ও অবাধ বিনিময়যোগ্য পৃথক মুদ্রা থাকবে অথবা ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই প্রদেশে দুটি রির্জাভ ব্যাংকসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু থাকবে।

৪. **রাজস্ব, কর, শুল্ক ব্যবস্থা :** সকল প্রকার কর ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে। আদায়কৃত রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা দেওয়া হবে।

৫. **বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্য :** দু'অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা হিসাব থাকবে। প্রয়োজনে দু'অঞ্চল থেকে সমান হারে অথবা সংবিধানে নির্ধারিত হারে কেন্দ্রকে প্রদান করা হবে।

৬. **প্রতিরক্ষা :** নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী তথা মিলিশিয়া বা প্যারামিলিশিয়া গঠন করতে পারবে।

### ৭.৩ ছয় দফার প্রতিক্রিয়া

ছয় দফাকে মনে করা হতো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত ও নির্যাতিত জনগণের মুক্তির সনদ। এ কর্মসূচি তাদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। ফলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানায়। ক্রমশ পূর্ব পাকিস্তানে এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ ছয় দফার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তারা ছয় দফার নানা অপব্যাখ্যা এবং একে জাতীয় সংহতির পরিপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করে।

### ৭.৪ সরকারি দমন নীতি

পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে সরকার দমন নীতি প্রয়োগ করে। গভর্নর মোনায়েম খানের নির্দেশে শেখ মুজিবসহ বহু নেতা-কর্মিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এতে পূর্ব পাকিস্তানে ভীষণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বন্দিদের মুক্তির দাবিতে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন প্রদেশব্যাপী এক সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেওয়া হয়। ঐ দিন সরকার ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করলে কিশোর মনুমিয়াসহ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ জন নিহত ও শত শত লোক আহত হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্যবৃন্দ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন।

### ৭.৫ ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি সর্বক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি করে, ছয় দফা কর্মসূচি ছিল তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবি ছিল না, বরং এটি ছিল বৈষম্যের প্রতিকার ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবি। কিন্তু সরকারের নানারূপ অপব্যাখ্যা, দমন-নিপীড়নমূলক নীতি পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সংগ্রামী রূপ দান করে। এ সংগ্রামী চেতনার ফসল '৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান এবং ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ছয় দফার গুরুত্ব অপরিসীম।

### ৭.৬ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

সরকারি দমন-নির্যাতন সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমশ আন্দোলন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় সরকার ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার একটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে। শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিকে মামলাভুক্ত করা হয়। এ মামলাটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। মামলার অভিযোগে বলা হয় যে, আসামিগণ ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভারতের আগরতলায় ষড়যন্ত্র করেছিল। শেখ মুজিবসহ অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকায় একটি বিশেষ ট্রাইবুন্যাল আদালত গঠন করে বিচার কার্য শুরু করা হয়। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি এম. আর. খান এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। প্রধান আসামি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ১৬টি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। মামলা চলাকালে রাজসাক্ষীদের অনেকে গোপন কথা ফাঁস করে দেন এবং তাদের জোরপূর্বক সাক্ষ্য দিতে বলা হয়েছে বলে স্বীকার করেন। একদিকে সাক্ষীদের মিথ্যা বলতে অনীহা, আসামিদের জোরালো প্রতিবাদের কারণে বিচার প্রক্রিয়া শিথীল হয়ে পড়ে।

### ৭.৭ মামলা প্রত্যাহার

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পূর্ব পাকিস্তানের গণ-মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আসামিদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সৃষ্ট আন্দোলন আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। এসময় মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক বন্দি অবস্থায় ঢাকা সেনানিবাসে পুলিশের গুলিতে নিহত হলে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। অবশেষে আন্দোলনের মুখে সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মামলাটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে রেসকোর্স ময়দানে এক বিরাট গণসংবর্ধনা দেয়া হয় এবং ঐইদিনই তিনি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন।

### ৭.৮ মামলার ফলাফল ও গুরুত্ব

পাকিস্তান সরকারের পক্ষে এ মামলাটি ছিল সম্পূর্ণ নেতিবাচক। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর জন্য এ মামলার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথমত, এ মামলার পর পাকিস্তান সরকার গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। দ্বিতীয়ত, বঙ্গবন্ধু অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতায় পরিণত হন। মামলা চলাকালে তাঁর পাকিস্তানের দু'অংশের বৈষম্যের বর্ণনায় তাঁর দলের পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে। তৃতীয়ত, এই মামলার ব্যর্থতায় আইউব খানের পতন ঘটে। বাঙালির বিজয় ঘটে। চতুর্থত, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পেছনে এ মামলার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। ১৯৬৮ সালের আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে যা নির্বাচনে সক্রিয় প্রভাব ফেলে।

**সার-সংক্ষেপ**

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতি গৃহীত নানা বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট বিক্ষুব্ধ অবস্থার পটভূমিতে ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করা হয়। ছয় দফা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ। তাই এর প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানায়। এ দফাগুলো দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এমতাবস্থায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দমন-নির্যাতনের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হয়ে শেখ মুজিবসহ বেশ কিছু সামরিক-বেসামরিক লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে। এটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মালমা নামে পরিচিত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রবল গণ-আন্দোলনের মুখে সরকার মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৭

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ছয় দফা প্রথম উত্থাপন করা হয়—
   ক. ইসলামাবাদে খ. ঢাকায়
   গ. লাহোরে ঘ. করাচিতে

২. ছয় দফা দাবি উপস্থাপন করা হয়—
   ক. ১৯৬২ সালে খ. ১৯৬৬ সালে
   গ. ১৯৬৭ সালে ঘ. ১৯৬৯ সালে

৩. পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করে ১৯৬৮ সালের—
   ক. জানুয়ারি মাসে খ. ফেব্রুয়ারি মাসে
   গ. মার্চ মাসে ঘ. ডিসেম্বর মাসে

৪. আগরতলা ষড়যন্ত্র মালা প্রত্যাহার করা হয় ১৯৬৯ সালের—
   ক. ২১ ফ্রেব্রুয়ারি খ. ২২ ফেব্রুয়ারি
   গ. ২২ মার্চ ঘ. ২১ এপ্রিল

৫. শেখ মুজিব 'বঙ্গবন্ধু' উপাধীতে ভূষিত হন ১৯৬৮ সালের—
   ক. ২২ ফেব্রুয়ারি খ. ২৪ ফেব্রুয়ারি
   গ. ২৩ ফেব্রুয়ারি ঘ. ২৭ ফেব্রুয়ারি

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য একটি _____ রচনা করতে হবে।
২. ন্যাপ নেতা ____ ৬ দফার বিরোধিতা করেছিলেন।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. ছয় দফায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা দাবি করা হয়।
২. শেখ মুজিব ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি।
৩. ছয় দফা মতে পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
২. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের মধ্যে কে বন্দি অবস্থায় পুলিশের হাতে নিহত হয়েছিলেন?
৩. কবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছিল?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-প্রশ্ন উত্তর**

১. ছয় দফা দাবি কি?
২. ছয় দফার প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।
৩. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

## পাঠ-৮ : এগার দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি -**

- ☞ ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ ১৯৬৯ সনের গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### ৮.১ উন্নয়ন দশক পালন ও পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া

পূর্ববর্তী পাঠে এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। এ আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ 'ডেমোক্রেটিক একশান কমিটি' (DAC) গঠন করে। আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ও মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন পরিচালনা করা ছিল 'ডাক' এর উদ্দেশ্য। এজন্য 'ডাক' ৮ দফা ভিত্তিক আন্দোলন শুরু করে। এসময় ১৯৬৮ সালের ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতার দশম বার্ষিকী উপলক্ষে পাকিস্তানে 'উন্নয়ন দশক' পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ কর্মসূচি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শোষণ-বঞ্চনা ও ষড়যন্ত্রের শিকার পূর্ব পাকিস্তানিদের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। তারা আইয়ুবী স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে।

### ৮.২ সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন

আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন ছাত্র সমাজ এসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের মস্কো ও পিকিংপন্থী দুটি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (এন.এস.এফ) একাংশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে।

### ৮.৩ এগার দফা কর্মসূচি

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে। ১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এক সাধারণ ছাত্র সভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ১১ দফা কর্মসূচিতে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত ৬ দফা কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১১ দফা দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিনেন্স বাতিলসহ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, ব্যাংক ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, কৃষকদের খাজনা ও ট্যাক্স হ্রাস, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত, সকল বিবর্তনমূলক আইন বাতিল এবং বন্দিদের মুক্তি ও সকল মামলা প্রত্যাহার।

### ৮.৪ এগার দফা ভিত্তিক আন্দোলন

ছাত্রদের ১১ দফা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। ১১ দফা আদায়ের দাবিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৯৬৯ সালের ১৮ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। সরকার ইতোমধ্যেই শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করেছিল। ১৮ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশ শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। পুলিশ ও ই. পি. আর (বর্তমান বি ডি আর) ছাত্রদের নির্মমভাবে নির্যাতন ও বেশ কিছু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৯ জানুয়ারি ধর্মঘট, ছাত্রসভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ২০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়।

### ৮.৫ আসাদের মৃত্যু ও গণ-অভ্যুত্থান

২০ জানুয়ারি ছাত্র সমাবেশে হাজার হাজার ছাত্র যোগদান করে। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল পুলিশী বাধা উপেক্ষা করে শহীদ মিনারের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ-ই.পি.আর বাহিনীর সাথে তাদের সংঘর্ষ বাধে। এক পর্যায়ে পুলিশ বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার উপর গুলি চালালে ঢাকা সেন্ট্রাল 'ল' কলেজের ছাত্র আসাদুজ্জামানসহ আরো তিনজন নিহত হয়। এ ঘটনা জ্বলন্ত বারুদে অগ্নিসংযোগ করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ২১ জানুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত শহীদদের গায়বানা জানাজা শেষে ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি শোক কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। প্রথম দু'দিন ধর্মঘট ও বিক্ষোভ এবং শেষ দিন প্রদেশব্যাপী হরতালের ডাক দেওয়া হয়। ২৪ তারিখের হরতালের দিনটি গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে আসে। এদিন উত্তেজিত ছাত্র-জনতা সচিবালয় ভবন আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগ করলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে নবকুমার

ইনস্টিটিউটের ছাত্র মতিউর রহমানসহ কয়েকজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়। ফলে বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করে। শহীদ মতিউরের লাশ নিয়ে উত্তেজিত জনতা বিশাল শোভাযাত্রা বের করে। এসময় প্রবল জনরোষে আক্রান্ত হয় সরকার সমর্থক 'দৈনিক পাকিস্তান' ও 'ডেইলি মর্নিং নিউজ' পত্রিকা অফিস। সরকার কারফিউ জারির মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। তবে সান্ধ্য আইন গণ-অভ্যুত্থানকে দমন করতে পারেনি। বরং সারা দেশে দ্রুত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানেও এ আন্দোলনের ঢেউ লাগে। একনায়কতন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, পেশোয়ার ও করাচী থেকে শুরু হয়ে আন্দোলন ক্রমশ পশ্চিম পাকিস্তানের মফস্বল এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে।

### ৮.৬ আলোচনার প্রস্তাব ও পরবর্তী পরিস্থিতি

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যখন গণবিদ্রোহের জোয়ারে উত্তাল তখন ১৯৬৯ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিরোধী রাজনীতিবিদদের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু মাওলানা ভাসানী বৈঠকে যোগদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য যে গণ-অভ্যুত্থানে ভাসানীও নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় ছিলেন। কারাগারে আটক শেখ মুজিবুর রহমান প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে ১৭ ফেব্রুয়ারি বৈঠক অনুষ্ঠানে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এতে গণ-আন্দোলন আরো তীব্র হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি সাধারণ হরতাল পালিত এবং বিকেলে পল্টন ময়দানে বিশাল ছাত্র ও গণ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে আটক আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনীর গুলিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহার মৃত্যুতে সারাদেশে আন্দোলনের দাবানল জ্বলে ওঠে।

### ৮.৭ আইয়ুব খানের নতি স্বীকার

প্রবল গণ-বিদ্রোহের মুখে আইয়ুব খান নতি স্বীকারে বাধ্য হন। আন্দোলন প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে জরুরি অবস্থা উঠিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ বন্দিদের মুক্তি দেয়া হয়। একই সাথে তিনি আর প্রেসিডেন্ট প্রার্থী না হওয়ারও ঘোষণা দেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি কারামুক্ত শেখ মুজিবকে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সংবর্ধনা দেয়া হয়। সংবর্ধনা সভায় ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

### ৮.৮ গোল টেবিল বৈঠক

কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষে সরকারের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন ৪০ মিনিট আলোচনার পর ১০ মার্চ পর্যন্ত বৈঠক মুলতবি করা হয়। ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত বৈঠকে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচন এবং সংসদীয় সরকার প্রবর্তনের দাবি মেনে নিলেও বঙ্গবন্ধুর স্বায়ত্তশাসনের দাবি অগ্রাহ্য করেন। ফলে বৈঠক ব্যর্থ হয়।

### ৮.৯ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পদত্যাগ

গোল টেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার পর পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। এমতাবস্থায় ক্ষমতা রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে আইয়ুব খান গণ-ধিকৃত মোনায়েম খানকে বরখাস্ত করে অর্থমন্ত্রী ড.এম.এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। বরং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। সমগ্র পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এ অবস্থায় উপায়ন্তর না দেখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সেনাপ্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে প্রচণ্ড গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের এক দশকের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে।

**সার-সংক্ষেপ**

বাংলার ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের এগার দফা ও গণ-অভ্যুত্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের

স্বৈরশাসনে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা স্বৈরশাসনের অবসান, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য ৬ দফা ও এগার দফা ভিত্তিক আন্দোলন শুরু করে। কালক্রমে এ আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এ গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুব শাসনের অবসান ঘটে। গণ-অভ্যুত্থানে পূর্ব পাকিস্তানিদের এ সাফল্য পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৮

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. আইয়ুব খান 'উন্নয়ন দশক' পালন করেন—
   ক. ১৯৬৬ সালে খ. ১৯৬৮ সালে
   গ. ১৯৬৯ সালে ঘ. ১৯৬৭ সালে

২. এগার দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে—
   ক. ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি খ. পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
   খ. সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘ. পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ

৩. আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন—
   ক. ১৮ জানুয়ারি খ. ২০ জানুয়ারি
   গ. ১৮ ফেব্রুয়ারি ঘ. ২১ ফেব্রুয়ারি

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে সর্বদলীয় _____ পরিষদ গঠিত হয়।
২. পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য _____ গোল টেবিল বৈঠক আনুষ্ঠিত হয়।
৩. আইয়ুব খান _____ সালে _____ মার্চ ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়।
২. রাওয়ালপিন্ডির গোল টেবিল বৈঠকে আইয়ুব খান স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেন।
৩. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. গণ-আন্দোলনে শহীদ আসাদ কে ছিলেন?
২. ১৮৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নিহত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের নাম কি?
৩. মোনায়েম খানকে বরখাস্ত করে কাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিল?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. এগার দফা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. সংক্ষেপে গণ-অভ্যুত্থানের বর্ণনা দিন।
৩. গণ-অভ্যুত্থানের ফলাফল আলোচনা করুন ।

## পাঠ-৯ : ইয়াহিয়া খানের শাসন ও ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি–**

☞ ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা লাভ ও তাঁর গৃহীত কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

☞ ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও এর ফালাফল আলোচনা করতে পারবেন।

### ৯.১ ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা লাভ ও সামরিক শাসন জারি

পূর্ববর্তী পাঠে আপনারা জেনেছেন যে, ১৯৬৯ সালের প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসেই দেশে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষিত হয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। ২৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে তিনি অল্পকালের মধ্যে দেশে একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠন এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দেন।

### ৯.২ নির্বাচনের ঘোষণা

জেনারেল ইয়াহিয়ার ২৬ মার্চ এর ভাষণের উদ্দেশ্য সৎ মনে হলেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এতে সংশয় প্রকাশ করেন। তারা অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি জানান। অবশেষে ক্ষমতা গ্রহণের ৮ মাস পর ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই ঘোষণায় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এক ইউনিট প্রথা বাতিল করে ইতঃপূর্বে অবলুপ্ত ৪টি প্রদেশ পুনর্বহাল করেন। ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে হতে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালুর অনুমতি দেয়া হয়।

### ৯.৩ আইন কাঠামো আদেশ ও এর প্রতিক্রিয়া

১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ ইয়াহিয়া খান 'আইন কাঠামো আদেশ' জারি করেন। এই আদেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের গঠন প্রণালী ও নির্বাচন বিষয়ক বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ আদেশে 'এক ব্যক্তির এক ভোট' নীতিতে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করা হয়। জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ৩১৩ (১৩টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ)। আদেশে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদ প্রথম অধিবেশনের দিন হতে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করবে। যদি তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। সংবিধান সংক্রান্ত বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হলেও পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে।

আইন কাঠামো আদেশের প্রতি রাজনৈতিক দলসমূহ বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ভাসানী ন্যাপ ও ন্যাশনাল লীগ নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এই আদেশের বিরূপ সমালোচনা করলেও পাকিস্তানের ১১টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণে সম্মত হয়। আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনকে ৬ দফা ও ১১ দফার বিষয়ে রেফারেন্ডাম হিসেবে অভিহিত করে।

### ৯.৪ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত থাকলেও বন্যাজনিত কারণে তা পরিবর্তন করা হয়। ৭ ডিসেম্বর জাতীয় এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। তবে নির্বাচনের প্রাক্কালে ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে। ভয়াবহ গোর্কী ও জলোচ্ছ্বাসে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আনুমানিক ১০/১৫ লক্ষ লোক এতে নিহত হয়। ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর যথাক্রমে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলের জাতীয় পরিষদের ৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি আসনে এক মাস পর ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

**৯.৫ নির্বাচনের ফলাফল**

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অন্য দুটি আসনে নির্বাচিত হন পি.ডি.পি প্রধান জনাব নূরুল আমিন ও রাজা ত্রিবিদ রায়। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে সংরক্ষিত ১০টি মহিলা আসনসহ আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন লাভ করে। বাকি আসনগুলোর ২টি পি.ডি.পি, ১টি নেজাম-ই- ইসলামী, ১টি জামায়াতে ইসলামী, ১টি ন্যাপ (মস্কো) ও ৭টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়লাভ করে। অন্যদিকে জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৪৪টি আসনের মধ্যে জুলফিকার আলী ভূট্টোর নেতৃতাধীন ''পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি'' ৮৮টি আসন লাভ করে। উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পিপলস্ পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন পায়নি।

**৯.৬ নির্বাচনের গুরুত্ব**

১. **বাঙালি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয় :** ১৯৪৭ সালের পর থেকে বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্যবাদ দাবি করেছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে এর বিজয় হয়।

২. **স্বায়ত্তশাসনের বৈধতা প্রমাণ :** নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের বৈধতা প্রমাণ করে।

৩. **বাঙালি জাতীয়তাবাদের জয় :** ১৯৫২ সাল থেকে ভাষাভিত্তিক যে জাতীয়তাবাদের সূচনা হয় তা নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে সুদৃঢ় হয়।

**৪. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রভাব**

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। এ সাফল্যে পূর্ব পাকিস্তানে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আওয়ামী লীগ ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি বিজয় দিবস পালন করে। এ দিন রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল সমাবেশে আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণ ৬ দফা বাস্তবায়নে প্রকাশ্য শপথ গ্রহণ করে ।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এ সাফল্যে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী শংকিত হয়ে পড়ে । তারা জনগণের রায়কে বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সংবিধান প্রণয়ন প্রশ্নে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির জুলফিকার আলী ভূট্টোর মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা দেয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খানও নানা অজুহাতে জাতীয় পরিষদ আহবানে টালবাহানা শুরু করেন। আওয়ামী লীগের চাপে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন । কিন্তু ১ মার্চ আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এর ফলে ঢাকাসহ সারা প্রদেশে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, যা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনা করে।

**সার-সংক্ষেপ**

পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হাস্তান্তরে বাধ্য হন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা লাভ করেই পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন। সংবিধান বাতিল এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। অবশ্য রাজনৈতিক দলসমূহের দাবিতে শেষ পর্যন্ত তিনি সাধারণ নির্বাচন দেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রদেশিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক দল হিসেবে সারা পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু সরকার নির্বাচনের রায় বানচালে ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করলে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। যা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনা করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৯

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসে সামরিক আইন জারি করেন—

ক. ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ

খ. ১৯৭০ সালের ২৫ মার্চ

গ. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ

ঘ. ১৯৭০ সালের ২৬ মার্চ

২. আইন কাঠামো আদেশ জারি করেন—

ক. প্রেসিডিন্ট আইয়ুব খান

খ. জেনারেল ইয়াহিয়া খান

গ. জুলফিকার আলী ভূট্টো

ঘ. টিক্কা খান

৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে আসন পেয়েছিল—

ক. ১৬৭ টি

খ. ১৬৬ টি

গ. ১৬৮ টি

ঘ. ১৬৯ টি

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় বসেই পুনরায় দেশে _____ জারি করেন।

২. ১৯৭০ সালের _____ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ ও _____ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি _____ টি আসন লাভ করে।

**গ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. আইন কাঠামো আদেশ অনুযায়ী পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আসন সংখ্যা কত নির্ধারণ করা হয়েছিল?

২. ১৯৭০ সালের নির্বাচন বর্জনকারী একটি রাজনৈতিক দলের নাম লিখুন।

৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ কয়টি আসন লাভ করেছিল?

**ঘ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. আইন কাঠামো আদেশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল আলোচনা করুন।

৩. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

৪. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রভাব লিখুন।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১৫

**বিশদ উত্তর প্রশ্ন**

১. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি আলোচনা করুন। এ আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিরূপণ করুন।

২. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি কি ছিল? এ নির্বাচনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৩. জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতায় আরোহণের পটভূমি বর্ণনা করুন। মৌলিক গণতন্ত্রসহ ক্ষমতায় থাকার জন্য তাঁর বিভিন্ন পদক্ষেপ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪. পাকিস্তান আমলে বাংলার প্রতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরুন।

৫. ছয় দফা কর্মসূচি কি? এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৬. ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের বিবরণ দিন।

৭. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পটভূমি ও এর ফলাফল আলোচনা করুন।

ইউনিট ১৬

# মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

## ভূমিকা

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়কে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের সুযোগ না দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নানা রকম টালবাহানা শুরু করেন। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের আহুত ৩ মার্চের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। পাকিস্তানি শাসক চক্র ও রাজনৈতিক দলসমূহের এরূপ ভূমিকার প্রতিবাদে পূর্ব-পাকিস্তানে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। প্রশাসনের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে পড়ে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার লক্ষে নীতি নির্ধারণী বক্তৃতা দেন। এমতাবস্থায় ইয়াহিয়া-মুজিব-ভূট্টো আলোচনা ব্যর্থ করে দিয়ে ইয়াহিয়া খান-ভূট্টো ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়ার নির্দেশে ঐ রাতে পাকিস্তান বাহিনী নিরীহ মানুষের ওপর ট্যাঙ্ক-অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান। এই ঘোষণার পর জনগণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। তারপর দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর নিকট পাক-বাহিনী চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

### এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

- ➔ পাঠ ১ : ৭ মার্চের ভাষণ ও অসহযোগ আন্দোলন
- ➔ পাঠ ২ : ২৫ মার্চ পাক-বাহিনীর আক্রমণ, স্বাধীনতার ঘোষণা ও সশস্ত্র প্রতিরোধ
- ➔ পাঠ ৩ : অস্থায়ী সরকার গঠন, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা
- ➔ পাঠ ৪ : মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়, পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

## পাঠ-১ : ৭ মার্চের ভাষণ ও অসহযোগ আন্দোলন

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- ☞ ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

### ১.১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ হঠাৎ করে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এ ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। ঢাকাসহ সারা প্রদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

আওয়ামী লীগ ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করে। পূর্ব ঘোষণা অনুসারে ২ ও ৩ মার্চ সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। ২ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে (আ.স.ম. আবদুর রবের নেতৃত্বে ডাকসু নেতৃবৃন্দ কর্তৃক) সর্বপ্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩ মার্চ বিকেলে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ছাত্র-জনসভায় 'স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি' নামক একটি ইশতেহার প্রকাশ করা হয়। ৩-৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন ভোর ৫টা থেকে ২টা পর্যন্ত একটানা হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সভায় সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার এবং জনগণের দাবি না মানা পর্যন্ত খাজনা প্রদান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষ্য করে ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ এক ঘোষণায় ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণ করেন। এই দিনই লে. জেনারেল ইয়াকুব খানকে প্রত্যাহার করে জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।

### ১.২ ৭ মার্চের ভাষণ

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি ইয়াহিয়া খান ঘোষিত ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্ব শর্ত আরোপ করেন। শর্তগুলো হলো :

১. অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে।
২. অবিলম্বে সেনা বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
৩. সকল প্রাণহানী সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে, এবং
৪. সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এই ভাষণেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জনগণকে স্বাধীনতার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং শত্রু মোকাবেলায় সম্ভাব্য প্রস্তুতির ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তাঁর এ ঘোষণা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবুজ সংকেত হিসেবে কাজ করে। ভাষণে তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি দেন যা সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হতে থাকে।

৭ মার্চের ভাষণ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা পাগল জনগণের সর্বাত্মক অসহযোগিতার কারণে সকল সরকারি কর্মকাণ্ড প্রায় অচল হয়ে পড়ে। ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর আক্রমণ পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সদর দপ্তর হতে জারিকৃত আদেশ বলে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক শাসন চলতে থাকে। ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনার জন্য ৩৫টি বিধি জারি করেন।

### ১.৩ ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা

৭ মার্চের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার নামে প্রহসনের আয়োজন করেন। ১৫ মার্চ তিনি ঢাকায় আসেন। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন দফায় আলোচনা চলে। এক পর্যায়ে জুলফিকার আলী ভুট্টোকেও বৈঠকে ডেকে আনা হয়। ২১ মার্চ ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে তিনি ঢাকায় আসেন। ২১ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক ও ত্রি-পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন বিষয়ে মতৈক্য হলেও ৬ দফা প্রশ্নে ভুট্টোর সংশোধনী প্রস্তাব ও ক্ষমতার অংশিদারিত্ব দাবি আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করে। ফলে ক্রমশ পরিস্থিতি জটিল হতে থাকে।

### ১.৪ আলোচনা ব্যর্থ ও ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগ

আলোচনার সাফল্য সম্পর্কে জনমনে সংশয় দেখা দেয়। তাই ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা চললেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে জনগণ আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। ২২ মার্চ ঢাকার সকল সংবাদপত্র 'স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা'র ছবি সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করে। ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবস'। এই দিন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ঢাকার ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। কেবল ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও প্রেসিডেন্ট হাউজে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলিত হতে দেখা যায়। ২৪ মার্চ আলোচনার শেষ দিনেও কোন মতৈক্য হয়নি। উল্লেখ্য যে, এ আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনে শাসকগোষ্ঠীর কোন ইচ্ছা ছিল বলেও মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য এবং অস্ত্র ও রসদ নিয়ে আসাই ছিল পাকিস্তানি শাসকদের উদ্দেশ্য। প্রয়োজনীয় সৈন্য ও রসদ আসার পর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে তিনি সেনা বাহিনীকে বাংলার নিরস্ত্র জনতার উপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেন। ফলে শুরু হয় ইতিহাসের এক ভয়াবহ নির্মম গণহত্যার অভিযান।

**সার-সংক্ষেপ**

১৯৭১ সালে ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। এ ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। হরতাল, ধর্মঘট ও বিক্ষোভে জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানিদের স্বাধীনতার প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। এতে তিনি অসহযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করেন। শেষ পর্যন্ত আলোচনা সমাপ্ত না করেই তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.১

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন—

ক. ১৯৭১ সালের ১ মার্চ খ. ১৯৭০ সালের ১ মার্চ

গ. ১৯৭০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ঘ. ১৯৭১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি

২. ১৯৭১ সালের ২ মার্চ প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হয়—

ক. পল্টন ময়দানে খ. রেসকোর্স ময়দানে

গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে

৩. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন—

ক. ২৫ মার্চ খ. ২৬ মার্চ

গ. ২০ মার্চ ঘ. ২৪ মার্চ

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ইয়াহিয়া খান _____ মার্চ এক ঘোষণায় ২৫ মার্চ পাকিস্তানের _____ অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণ করেন।

২. _____ শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য _____ মার্চ ঢাকায় আসেন।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।

২. ২০ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. কে ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?

২. ইয়াহিয়া-মুজিব-ভূট্টো বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত - উত্তর প্রশ্ন**

১. ৭ মার্চ ভাষণের মূল বিষয় কি ছিল?

২. ইয়াহিয়া-মুজিব-ভূট্টো বৈঠক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

## পাঠ-২ : ২৫ মার্চ পাক-বাহিনীর আক্রমণ, স্বাধীনতার ঘোষণা ও সশস্ত্র প্রতিরোধ

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি -**

- ☞ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাক সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বাংলার নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষের উপর বর্বর আক্রমণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাক সেনাবাহিনী বাংলার নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে ইতিহাসের এক নির্মম ও বর্বর গণহত্যার অভিযান পরিচালনা করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে রাতটি 'কালো রাত' নামে পরিচিত।

**২.১ ২৫ মার্চের আক্রমণ ও গণহত্যা**

পূর্ববর্তী পাঠে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা না করেই ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দলবলসহ ঢাকা ত্যাগ করেন। তবে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করার জন্য সেনাবাহিনীকে তাদের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে যান। তাঁর নির্দেশ মতো (বেলুচিস্তানের কসাই নামে খ্যাত) গভর্নর টিক্কা খানের ঘাতক সৈন্যরা ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ঢাকায় গণহত্যার তাণ্ডবলীলায় মেতে ওঠে। রকেট, মর্টার, মেশিনগান ও কামানের মুহুর্মুহু শব্দে রাতের ঢাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ঘাতকের নির্মম আক্রমণে প্রাণ হারায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় প্রধান আসামি লে. কমান্ডার মোয়াজ্জাম হোসেনসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান অধ্যাপক। এছাড়াও ২৫ মার্চ রাতের পাক-বাহিনীর আক্রমণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল, রোকেয়া হল, এস.এম. হল এবং জগন্নাথ হলের অনেক আবাসিক ছাত্র ও কর্মচারী নিহত হন। বেরিক্যাড রচনাকারী জনতা, রেসকোর্স, মন্দির, নিরীহ পথচারী এবং নিঃস্ব বস্তিবাসীও এই নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানার ই.পি.আর ঘাঁটি এবং রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে একযোগে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। ২৫ মার্চ রাতেই পাকবাহিনী দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, সাপ্তাহিক গণবাংলা ও ডেইলি পিপলস পত্রিকা অফিস পুড়িয়ে দেয়। নৃশংস গণহত্যার সংবাদ যাতে বহিঃবিশ্বে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ২৫ জন বিদেশী সাংবাদিককে আটক এবং তাদের সংবাদ প্রেরণের উপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। পাকিস্তানের সামরিক শাসকবর্গ ২৫ মার্চ সেনা অপারেশনের নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চ লাইট'। এ অপারেশন ২৫ মার্চ শুরু হয় এবং ২৭ মার্চ পর্যন্ত গণহত্যা চলে। ক্রমান্বয়ে তা ঢাকার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে।

**২.২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার ও স্বাধীনতার ঘোষণা**

২৫ মার্চ রাত ১:৩০ মিনিটে হানাদার সেনারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর বাসভবন হতে গ্রেপ্তার করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের মীয়ানওয়ালী কারাগারে বন্দি ছিলেন। গ্রেপ্তারের পূর্বে তিনি মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এ ঘোষণা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম প্রেরণ করেন। পরের দিন বিবিসি'র প্রভাতি অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণাটি প্রচার করেন। ২৭ মার্চ কালুরঘাটে স্থাপিত অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার আর একটি ঘোষণা পাঠ করেন।

**২.৩ স্বাধীনতা ঘোষণার গুরুত্ব**

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার কথা প্রচারিত হওয়ার পর মাতৃভূমিকে মুক্ত করার আশায় প্রবল শক্তিতে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। হানাদারদের বিরুদ্ধে সর্বত্র সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলার ছাত্র-যুবক, নারী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীসহ সকল পেশাজীবী ও আপামর জনতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হানাদারদের বিরুদ্ধে জোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এভাবেই প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশকে শত্রু মুক্ত করার জন্য শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৭১ সালে প্রচারিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আবদুল হান্নান, মেজর জিয়ার ঘোষণার মূল ভিত্তি ছিল ২৬ মার্চের ঘোষণা। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার এবং স্বাধীনতার পর সংবিধানে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ঘোষণার মাধ্যমেই একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়।

**সার-সংক্ষেপ**

ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা সমাপ্তি ঘোষণা করেই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। তবে যাত্রার পূর্বে তিনি যে নির্দেশ দেন সে মোতাবেক পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পূর্ব পাকিস্তানে জঘন্যতম গণহত্যা সংগঠিত করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান। এই ঘোষণার পর শত্রুর আক্রমণ মোকাবেলা করে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, যা কালক্রমে মুক্তি সংগ্রামে রূপ নেয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.২

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. বাংলার ইতিহাসে 'কালো রাত' নামে পরিচিত—

ক. ১৯৭০ সালের ২৫ মার্চ রাত
খ. ১৯৭০ সালের ২৬ মার্চ রাত
গ. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত
ঘ. ১৯১ সালের ২৬ মার্চ রাত

২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের সময় বন্দি ছিলেন পাকিস্তানের—

ক. মীয়ানওয়ালী কারাগারে
খ. করাচি কারাগারে
গ. সিন্ধু কারাগারে
ঘ. ইসলাবাবাদ কারাগারে

৩. চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণার কথা প্রথম প্রচার করেন—

ক. মীর শওকত আলী
খ. মেজর জিয়াউর রহমান
গ. এম এ হান্নান
ঘ. মেজর রফিকুল ইসলাম

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. ঢাকায় আলোচনা সমাপ্ত না করেই ______ দলবলসহ ঢাকা ত্যাগ করেন।
২. ______ ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করেছিল।
২. এম এ হান্নান ২৬ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ প্রচার করেন।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. ২৫ মার্চ পরিচালিত সেনা অভিযানের নাম কি?
২. মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কোথায় বন্দি ছিলেন?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. ২৫ মার্চ গণহত্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু কিভাবে হয়।

## পাঠ-৩ : বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- ☞ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও ১১টি সেক্টর সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ☞ মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি আলোচনা করতে পারবেন।

### ৩.১ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল এবং ১৭ এপ্রিল দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, তাঁর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দনি আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে ১০ এপ্রিল একটি অস্থায়ী প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। এ সরকারই মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে বেসামরিক বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দান করে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ ও গণহত্যা শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তান হতে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের অধিকাংশ সদস্য প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী এসব নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীন বাংলাদেশের একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নতুন সরকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। ১২ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতারে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ৬ সদস্য বিশিষ্ট অস্থায়ী সরকার গঠনের সংবাদ প্রচার করা হয়। ১৩ এপ্রিল আগরতলায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের এক সভায় সরকার গঠন অনুমোদন করা হয়।

**অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ**

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকারের সদস্যগণ আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন। তদানিন্তন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলা (বর্তমানে মুজিবনগর) গ্রামে শতাধিক দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, কতিপয় নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য ও কয়েক হাজার সাধারণ জনতার উপস্থিতিতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের চীপ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী শপথ পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠানে তিনি একটি ঘোষণাপত্রও পাঠ করেন। এ ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কার্যকর বলে উল্লেখ করা হয়।

**অস্থায়ী সরকারের সদস্য ও তাদের দফতর**

| নং | নাম | দফতর |
|---|---|---|
| ১. | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান | রাষ্ট্রপতি |
| ২. | সৈয়দ নজরুল ইসলাম | উপ-রাষ্ট্রপতি |
| ৩. | তাজউদ্দিন আহমদ | প্রধানমন্ত্রী |
| ৪. | খন্দকার মোশতাক আহমদ | পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী |
| ৫. | এম. মনসুর আলী | অর্থমন্ত্রী |
| ৬. | এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান | স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী |

উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে আটক থাকায় উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার প্রদান করা হয়।

**বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সহযোগিতা দানের জন্য আহ্বান**

বৈদ্যনাথতলার ঐতিহাসিক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান থেকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ও যুদ্ধে সার্বিক সহযোগিতার জন্য বিশ্বের সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানান। শত্রুর মোকাবিলা করে দেশকে মুক্ত করার জন্যও সকলকে আহ্বান জানানো হয়।

### ৩.২ উপদেষ্টা কমিটি গঠন

ন্যাপ নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অপর ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মণি সিংহ এবং কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধর অস্থায়ী সরকারের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তাদের সাথে আওয়ামী লীগের ৫ জন নেতাকে নিয়ে ৯ সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি মুক্তিযুদ্ধকালে অস্থায়ী সরকারের নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

### ৩.৩ মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা

স্বাধীনতার ঘোষণা দানের পর পরই পাক-হানাদারদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। তবে প্রাথমিক পর্যায়ের এ প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল অপরিকল্পিত, অবিন্যস্ত ও বিচ্ছিন্ন। অস্থায়ী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে সংগঠন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দেশে মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজ গঠন করা হয়।

### ৩.৪ মুক্তিবাহিনী সংগঠন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার আতাউল গনি ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। সরকারের নির্দেশে তিনিসহ বাঙালি সেনা কর্মকর্তা, মুক্তিবাহিনীর সদস্যগণ মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করেন। মুক্তিবাহিনী দুটি পৃথক অংশে বিভক্ত ছিল- নিয়মিত বাহিনী ও অনিয়মিত বা গণবাহিনী।

### নিয়মিত বাহিনী

তৎকালীন ইস্ট-পাকিস্তান রাইফেলস্ (ইপিআর) এর বাঙালি সদস্যদের নিয়ে সেনা ব্যাটেলিয়ান গঠন করা হয়। ইপিআর পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে 'সেক্টর ট্রুপস্' নামে আরেকটি বাহিনী গঠন করা হয়। সরকারিভাবে এই দুই বাহিনী নিয়মিত বাহিনী হিসেবে গণ্য হতো। উল্লেখ্য যে, নিয়মিত সেনা ব্যাটেলিয়ান নিয়ে পরে তিনটি বিগ্রেড গঠিত হয়। মেজর শফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান এবং মেজর খালেদ মোশাররফের নামের আদ্যক্ষর হিসেবে এই তিনটি বিগ্রেডের নামকরণ করা হয় যথাক্রমে এস-ফোর্স, জেড-ফোর্স ও কে-ফোর্স।

### অনিয়মিত বা গণবাহিনী

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্র-যুবক, নারী, কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে গঠন করা হয় অনিয়মিত বাহিনী তথা ফ্রিডম ফাইটার্স বা গণবাহিনী। এই বাহিনী গেরিলা নামেও পরিচিত। এই বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা দেশের অভ্যন্তরে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের গোয়েন্দা শাখা পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধি ও নানা কর্মকাণ্ডের সংবাদ মুক্তিবাহিনীকে সরবরাহ করত। নদী-নালা ও বন-জঙ্গল পরিপূর্ণ পূর্ব বাংলায় গেরিলা যুদ্ধ নীতি বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল।

### ৩.৫ অন্যান্য বাহিনী

সরকারের অধীনস্ত উপরোক্ত নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধকালীন আরও কয়েকটি বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এইসব বাহিনীর মধ্যে বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্স, (বি.এল.এফ), টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী' এবং ভালুকার 'আফসার বাহিনী' উল্লেখযোগ্য। বি.এল.এফ ছিল একটি রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী। এই বাহিনী মুজিব বাহিনী নামেও পরিচিত। ছাত্র নেতা শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান প্রমুখের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতা, কর্মী ও শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে এ বাহিনী গড়ে উঠেছিল। কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান ছিলেন কাদের সিদ্দিকী। এই সব বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা কায়দায় হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে। উল্লেখ্য যে, বিএলএফ ও কাদেরিয়া বাহিনী কোনো সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এরা অস্থায়ী সরকারের আওতার বাইরে নিজস্ব পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

### ৩.৬ সমগ্র রণাঙ্গনকে ১১ টি সেক্টরে বিভক্তি

মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাপক ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসেই সমগ্র রণাঙ্গনকে ১১ টি সেক্টরে বিভক্ত করেন।

**সেক্টরগুলো ছিল:**

| সেক্টর নম্বর | এলাকা | কমান্ডারদের নাম ও সময়কাল |
|---|---|---|
| ১. | চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত | ১. মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন)<br>২. মেজর মোহাম্মদ রফিক (জুন-ডিসেম্বর) |
| ২. | নোয়াখালী, কুমিল্লার আখাউড়া হতে ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ। | ১. মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)<br>২. মেজর এ টি এম হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) |
| ৩. | আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকের কুমিল্লা জেলা, সিলেটের হবিগঞ্জ মহকুমা এবং ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমা ও ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ। | ১. মেজর কে এম শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর)<br>২. মেজর নূরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) |
| ৪. | সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি রোড পর্যন্ত। | মেজর সি আর দত্ত |
| ৫. | সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল এবং ডাউকি ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত পর্যন্ত। | মেজর মীর শওকত আলী |
| ৬. | ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র রংপুর জেলা ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা। | উইং কমান্ডার এম. বাশার |
| ৭ | ঠাকুরগাঁও মহকুমা ছাড়া দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা এবং ব্রহ্মপুত্রের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র বগুড়া জেলা। | ১. মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-আগস্ট)<br>২. মেজর এম.এ.মনজুর (অগস্ট- ডিসেম্বর) |
| ৮. | কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ ও খুলনার উত্তরাঞ্চল। | ১. মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-আগস্ট)<br>২. মেজর এম এ মনজুর (আগস্ট-ডিসেম্বর) |
| ৯. | খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা। | ১. মেজর এম এ জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বরের প্রথমার্ধ)<br>২. মেজর জয়নাল আবেদিন (যুদ্ধের শেষ কিছুদিন) |
| ১০. | অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ, সমুদ্র উপকূল অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম ও চালনা। | হেড কোর্য়াটার পরিচালিত নৌ-কমান্ডারগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার সেক্টর কমান্ডারদের নির্দেশে কাজ করতেন |
| ১১. | কিশোরগঞ্জ ছাড়া সমগ্র ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা। | ১. মেজর আবু তাহের (এপ্রিল-নভেম্বর)<br>২. এম হামিদুল্লাহ (নভেম্বর-ডিসেম্বর) |

### ৩.৭ মুক্তিবাহিনীর কর্মতৎপরতা

প্রথম দিকে (জুলাই পর্যন্ত) মুক্তিবাহিনীর অভিযান তৎপরতা কিছুটা মন্থর গতিতে চলে। আগস্ট মাস হতে তৎপরতা দ্রুততর হয়। এ সময় মুক্তিবাহিনী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ ও আক্রমণ পরিচালনা করে রংপুর ও ময়মনসিংহের বিস্তৃত এলাকা মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

### ৩.১৩ পাকিস্তান সরকার, শান্তি কমিটি, রাজাকার ও অন্যান্য বাহিনী গঠন

মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান তৎপরতা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার প্রহসন করেন। তিনি ১৯৭১ সালের ১২ আগস্ট গণধিকৃত গভর্নর টিক্কাখানের স্থলে প্রবীণ রাজনীতিবিদ ডা. আবদুল মোত্তালিব মালিককে নিয়োগ দেন। ডা. মালিকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি বেসামরিক সরকার গঠন করা হয়। জাতীয় পরিষদের ৭৯ জন এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ১৯৪ জন সদস্যের সদস্য পদ ইচ্ছামত বাতিল করে প্রহসনের উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্য পদে সদস্য বাছাই করা হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্বে বিশ্বাসী রাজনীতিবিদদের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। দেশব্যাপী এর শাখা কমিটি গঠিত হয়। মুক্তিবাহিনীকে প্রতিরোধ এবং হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতাদানের জন্য 'রাজাকার', 'আলবদর' ও 'আল শামস্' প্রভৃতি বাহিনী গঠন করা হয়। আল-বদর ও আল-শামস বাহিনী মূলত জামাত ইসলাম ও ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা-কর্মীদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। এছাড়া ধর্মভিত্তিক দল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী, পিডিপি এসব বাহিনীর সদস্য ছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ব্যক্তিবর্গ এবং পূর্ব বাংলায় বসবাসরত অবাঙালিরা এসব বাহিনীতে যোগ দিয়ে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

### সার–সংক্ষেপ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গণহত্যা, পরবর্তীতে স্বাধীনতা ঘোষণা ও সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১০ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। এ সরকারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মুক্তিযুদ্ধ সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। সমগ্র রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে সার্বিক যুদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত ও অনিয়মিত গেরিলা বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিহত করতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের সহযোগী হিসেবে রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস বাহিনী গঠন করে। অবশ্য এর দ্বারা মুক্তি পাগল দেশপ্রেমিক মুক্তিবাহিনীকে প্রতিরোধ করা যায় নি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.৩

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালে—
   ক. ১০ এপ্রিল খ. ১১ এপ্রিল
   গ. ১৩ এপ্রিল ঘ. ১৭ এপ্রিল

২. অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন—
   ক. অলি আহাদ খ. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
   গ. নূরুল আমিন ঘ. খন্দকার মোশতাক আহমদ

৩. মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন—
   ক. কর্নেল আঃ রব খ. জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী
   খ. শেখ মুজিবুর রহমান ঘ. ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে মেহেরপুরের _____ গ্রামে।
২. মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র রণাঙ্গনকে _____ টি _____ বিভক্ত করা হয়।
৩. জিয়াউর রহমানের নামের অধ্যাক্ষর অনুযায়ী _____ গঠন করা হয়েছিল।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপ্রতি ছিলেন।
২. কমরেড মোজাফফর আহমদ অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন।
৩. ইয়াহিয়া খান টিক্কা খানকে অপসারণ করে ডা. মালিককে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
২. কার নামের অদ্যাক্ষর অনুযায়ী জেড-ফোর্স গঠিত হয়েছিল?
৩. মেজর জিয়াউর রহমান কোন সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কখন ও কোথায় গঠিত হয়েছিল?
২. দপ্তরসহ অস্থায়ী সরকারের সদস্যদের নাম লিখুন।
৩. সরকার নিয়ন্ত্রিত মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনী ছাড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য বাহিনী সম্পর্কে আলোচনা করুন।

## পাঠ-৪ : মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়, পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ পড়ে আপনি-**

- ☞ মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সংগ্রাম সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দল ও পেশাজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ☞ মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের সহযোগিতা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিবরণ দিতে পারবেন।

পূর্ববর্তী পাঠে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনায় আমরা জানতে পেরেছি যে, মুক্তিবাহিনী ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পাক-হানাদারদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। নভেম্বর মাসের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ তীব্রতর হয়। এ সময় প্রচলিত কায়দায় যুদ্ধের পাশাপাশি গেরিলা আক্রমণের মধ্যদিয়ে মুক্তিবাহিনী হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। প্রচণ্ড আক্রমণে জনবিচ্ছিন্ন পাকিস্তানি বাহিনী ক্রমশ হীনবল ও হতাশ হয়ে পড়ে।

### ৪.১ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দল ও পেশাজীবীদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সার্বজনীন গণযুদ্ধ। যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশে অবস্থানরত ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক, ডাক্তার, উকিল, লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এক কোটি বাঙালি এবং আদিবাসী নাগরিক প্রতিবেশী ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা সেখানে থেকেই নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদর্শন করেন। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী প্রবাসী বাঙালি জনগণ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিদেশীদের সমর্থন আদায় এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব প্রদানকারী ভূমিকা পালন করে। মস্কোপন্থী বাম রাজনৈতিক দলসমূহ ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলো স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তবে পিকিংপন্থী কিছু বাম দল ও এর অঙ্গ সংগঠনসমূহ স্বাধীনতা সংগ্রামে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে নি। এর কারণ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি গণচীনের বিরোধিতা। কয়েকটি ডানপন্থী দল যেমন- জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগ মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতা এবং ইয়াহিয়া সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করে।

### ৪.২ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহযোগিতা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রতিবেশী ভারত, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পৃথিবীর অনেক দেশের সরকার ও জনগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের প্রায় এক কোটি নারী-পুরুষ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতের সরকার ও জনগণ বাঙালি শরণার্থীদের ভরণ-পোষণসহ সবধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছিল। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার ও জনগণও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছিল। ভারত ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি দান করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন দেশের সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা এবং ইয়াহিয়া সরকারের প্রতি তাদের অন্ধ সমর্থন দান করেছিল। তবে এসব দেশের জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছিল গভীর সহানুভূতিশীল। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা এবং জনগণকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

### ৪.৩ মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নভেম্বর মাসে মুক্তিযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে। প্রায় এক লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ঢাকা-চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহসহ দেশের অন্যান্য স্থানে হানাদার বাহিনীর উপর তীব্র আঘাত হানতে থাকে। নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ হতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর অভিযান ব্যাপক ফলপ্রসূ হয়। এসময় দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও যশোরের বিস্তীর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত হয়। ক্রমান্বয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলও মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নিতে থাকে। ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়ে।

বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত পাক-বাহিনী ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর আকস্মিকভাবে ভারতের অমৃতসর শ্রীনগরসহ অন্যান্য স্থানে আক্রমণ করলে ৪ ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভারতের ইন্দিরা গান্ধী সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার জন্য ভারতীয় মিত্রবাহিনী পাঠায়। ৬ ডিসেম্বর ভারত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ভারতীয় মিত্রবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী একত্রে যৌথ বাহিনী গঠন করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। ভারতীয় বিমান ও নৌ-বাহনীও পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে যশোর সেনানিবাস, সাতক্ষীরা, মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ যৌথবাহিনীর দখলে আসে। ১০ ডিসেম্বর বিমান হামলা বন্ধ রেখে বিদেশীদের ঢাকা ত্যাগের সুযোগ দেওয়া হয়। ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে যৌথবাহিনী ভৈরব, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল মুক্ত করে ঢাকার খুব নিকটে চলে আসে।

### ৪.৪ ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীদের হত্যা

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করে। যৌথবাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছে যায় এবং ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকায় হামলা শুরু করে। এমতাবস্থায় ১৪ ডিসেম্বরই গভর্নর মালিক ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ পদত্যাগ করেন এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস সৃষ্ট 'নিরপেক্ষ জোন' হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় নেন। এরূপ একটি সংকটময় পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও আল্-শামসদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আরেক দফা গণহত্যা চালায়। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, চিকিৎসক ও সাংবাদিকসহ বহু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এ দিনটি একটি মর্মান্তিক দিন। একারণেই ১৪ ডিসেম্বর দিনটি 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসাবে পালিত হয়।

### ৪.৫ পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ

মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর যৌথ দুর্বার আক্রমণে পাকিস্তানি বাহিনী ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আত্মসমর্পণ ব্যতীত বিকল্প কোন পথ না পেয়ে বিপর্যস্ত পাক-বাহিনী ১৫ ডিসেম্বর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে সম্মত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ দিন বিকাল ৪ টা ১৯ মিনিটে পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্রসহ ভারতীয় ইস্টার্ন কামান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। নিয়াজী পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। উল্লেখ যে, আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে নির্বাসিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার উপস্থিত ছিলেন।

### ৪.৬ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐ দিন পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি দ্বি-খণ্ডিত হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নাম ধারণ করে বিশ্ব মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রমহানী এবং লক্ষ লক্ষ লোকের আত্মদানের বিনিময়ে বাংলার জনগণ লাভ করে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড ও একটি স্বাধীন পতাকা।

**সার-সংক্ষেপ**

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সার্বজনীন গণযুদ্ধ। জামাত ইসলামী, মুসলীম লীগ, রাজাকার, আলবদর, আল-শাসস

ইত্যাদি অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী এবং বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বিভিন্ন পেশাজীবীসহ সমাজের সর্বস্তরের লোক প্রত্যক্ষভাবে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনসহ বিশ্বের কিছু দেশের সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বটে, তবে সেসব দেশের সাধারণ মানুষ এবং বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সরকার ও জনগণ মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সরকার ও জনগণের সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়তে সক্ষম হয়। ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী একত্রে যৌথ কমান্ড গঠনের ফলে পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক-বাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে 'বাংলাদেশ' নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৬.৪

**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

**সঠিক উত্তরটি লিখুন :**

১. স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দান করে—

ক. ভূটান খ. ভারত

গ. মালদ্বীপ ঘ. ইরাক

২. আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে পাক-বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে—

ক. ১২ ডিসেম্বর খ. ১৪ ডিসেম্বর

গ. ১৩ ডিসেম্বর ঘ. ১৫ ডিসেম্বর

**খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন**

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সার্বজনীন _____ ।

২. ৬ ডিসেম্বর _____ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে _____ স্বীকৃতি দেয়।

**গ. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন**

১. যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সার্বিক সহযোগিতা করেছিল।

২. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক-বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল।

**ঘ. এক কথায় উত্তর দিন**

১. পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণকারী ইস্টার্ন কামান্ডের প্রধানের নাম কি?

২. ১৬ ডিসেম্বর পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কে উপস্থিতি ছিলেন?

**ঙ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন দলের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২. পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের বিবরণ দিন।

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ১৬

**বিশদ উত্তর প্রশ্ন**

১. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন সমন্ধে আলোচনা করুন।

২. ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমান কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণার পটভূমি আলোচনা করুন। পূর্ব-পাকিস্তানের জনমনে এ ঘোষণার প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

৩. মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা-প্রবাহ আলোচনা করুন।

৪. পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।